গল্পসমগ্র

অস্কার ওয়াইল্ড

সূচিপত্র

অনুরক্ত বন্ধু 2

ক্যানটারভিলে ভূত 22

দেবকুমার 65

ধীবর আর তার আত্মা 91

নাইটিংগেল পাখি ও গোলাপ ফুল 142

পরমাশ্চর্য রকেট 152

যুবক রাজা 174

রহস্যহীনা মহিলা 195

লর্ড আর্থার সেভাইল-এর অপরাধ 206

লাখপতি মডেল 261

সুখী রাজকুমার 272

স্পেনীয় রাজকুমারীর জন্মতিথি 291

স্বার্থপর দৈত্য 315

অনুরক্ত বন্ধু

The Devoted Friend

একদিন সকালে একটা বুড়ো ভলো ইঁদুর গর্ত থেকে তার মাথাটা বার করে দিল। তার ছোটো ছোটো চোখ দুটো চকচকে, শক্ত গোঁফ জোড়া ধূসর রঙের আর ন্যাজটা হচ্ছে কালো ভারতীয় রবারের মতো। ছোটো-ছোটো হাঁসগুলো সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছিল পুকুরে দেখতে তাদের হলদে ক্যানারি পাখির মতো। তাদের মার পা দুটো সত্যিকার লাল। কেমন করে জলে। মাথার ওপরে দাঁড়াতে হয় মা তাদের সেই শিক্ষাই দিচ্ছিল। সে তার বাচ্চাদের বারবার সাবধান করে দিচ্ছিল—'মাথার ওপরে ভর দিয়ে দাঁড়াতে না শিখলে কোনো উঁচু সমাজে তোমরা কলকে পাবে না।' কিন্তু বাচ্চারা সেকথা গ্রাহ্যই করছে না। বাচ্চা বলেই বোধ হয় সভ্য সমাজে ঢুকতে পারার সুবিধে কত তা তারা জানত না।

জলের ইঁদুর চিৎকার করে উঠল-বেয়াদপ ছোকরা সব বটে! ওদের ডুবে মরাই ভালো। মা-হাঁসটা বলল–মোটেই না। প্রত্যেককেই শেখার সুযোগ দিতে হয়। তাছাড়া, মাদের কোনো বিষযেই ধৈর্য হারালে চলে না।

জলের ইঁদুর বলল–তাই নাকি! তা, বাপ-মাযের অনুভূতির সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ নেই। সংসার বলতে কি নেই আমার। আসল কথাটা হচ্ছে, আমি কোনো দিন বিয়ে করিনি ভবিষ্যতে বিয়ে করার ইচ্ছেও আমার নেই। একদিক থেকে প্রেম জিনিসটা ভালোই; তবে অনুগত বন্ধুত্ব তার চেয়েও ভালো।

কাছাকাছি একটা উইলো গাছের ডালে একটা সবুজ রঙের লিনেট পাখি বসেছিল। ওদের আলোচনা শুনে সে বলল–তাই বুঝি! কিন্তু জিজ্ঞাসা করি অনুগত বন্ধুর দায়-দায়িত্ব কী?

মা-হাঁসটা বলল–হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক ওই কথাটা আমিও জানতে চাই। এই বলে সে সাঁতার কাটতে কাটতে পুকুরের আর একপাশে গিয়ে কেমন করে মাথার ওপরে ভর দিয়ে দাঁড়াতে হয় সেইটাই তার বাচ্চাদের দেখাতে লাগল।

জলের ইঁদুর বলল–কী বোকার মতো যে প্রশ্ন কর! আমার অনুগত বন্ধু যে হবে সে আমার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করবে এটা অবশ্যই আমি চাই।

ছোটো-ছোটো পাখনা উড়িয়ে আকাশে ভাসতে-ভাসতে বাচ্চা পাখিটা জিজ্ঞাসা করল–আর প্রতিদানে কী করতে হবে তোমাকে?

জলের উঁদুর বলল–কী যে ছাই-ভস্ম সব বল আমার তা মাথায় ঢোকে না।

লিনেট বলল–একটা গল্প শোন।

আমার সম্বন্ধে! তাহলে শুনব। গল্প শুনতে আমার খুব ভালো লাগে।

লিনেট বলল–এ গল্প তোমার সম্বন্ধেও খাটবে। এই বলে সে উড়ে গিয়ে পুকুরের ধারে বসে গল্প শুরু করল। এক সময় হ্যানস নামে একটা সৎ জীব বাস করত।

বেশ সম্ভ্রান্ত গোছের?–জিজ্ঞাসা করল জলের ইঁদুর।

লিনেট বলল–না। সদ্য হৃদ্য আর পরিচ্ছন্ন হাসিখুশি ছাড়া তার মধ্যে আর কিছু সম্ভ্রান্ত । ছিল বলে আমার মনে হয় না। একা-একা সে ছোটো একটা ঘরে থাকত; আর প্রতিটি দিনই সে বাগানে কাজ করত। সারা দেশে তার বাগানের মতো সুন্দর বাগান আর কারও ছিল না। সব ঋতুতেই তার বাগানে সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটে থাকত।

অনেক বন্ধু ছিল মানুষটির; কিন্তু তার সবচেয়ে অনুরক্ত বন্ধু ছিল মিলার হিউ। সত্যি কথা বলতে কি এই ধনী হিউ তার এতই অনুরক্ত ছিল যে এমন কোনো দিন সে বাগানের পাশ দিয়ে যায়নি যেদিন যে বাগানের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে বড়ো একটা সুন্দর ফুলের গুচ্ছ অথবা পকেট ভর্তি করে প্লাম আর চেরি তুলে নিয়ে যায়নি–অবশ্য বাগানে সেগুলি থাকলে।

মিলার হিউ বলত–সত্যিকার বন্ধু তারা যারা একজনের জিনিস সবাই মিলে ভাগ করে নেয়।

এই কথা শুনে হ্যানস হাসত আর ভাবত এত উঁচু আদর্শবাদী বন্ধু আর কার রয়েছে?

মাঝে-মাঝে অনেকেই অবাক হয়ে ভাবত ওই ধনী হিউ, যার কলে একশ বস্তা ময়দা সব সময় মত হয়ে থাকে, যার রয়েছে দু'টা দুধওয়ালা গরু আর লম্বা-লম্বা সুন্দর লোমশ অজস্র ভেড়া–সেই মানুষটি হ্যানসকে প্রতিদানে কখনো কিছু দেয় না কেন। কিন্তু এসবু। ছোটোখাটো ব্যাপার নিযে হ্যানস কোনো দিন মাথা ঘামাত না। বন্ধুদের নিঃস্বার্থপর দানের সম্বন্ধে মিলার হিউ যে সমস্ত লম্বা-লম্বা বক্তৃতা দিত, হ্যানস সেই সব বক্তৃতা খুব মন দিযে শুনত আর উপভোগ করত।

বাগান থেকে হ্যানস যে বিশেষ কিছু পেত তা নয়। শরৎ, গ্রীম আর বসন্তে সে মোটামুটি খুশিই থাকত; কিন্তু শীতকালটাই ছিল তার কাছে মারাত্মক; কারণ, ওই সময়ে তার বাগানে কিছুই ফলত না; অনেকদিন এমনও হয়েছে যে সে কিছু শুকনো ফল মুখে দিয়ে ঘুমোতে গিয়েছে। তা ছাড়া, এই সময়টা সে বড়ো নিঃসঙ্গও বোধ করত, কারণ গোটা শীতকালটা। মিলার হিউও পথ দিয়ে হাঁটত না।

মিলার তার স্ত্রীকে বলত–যতদিন শীত থাকবে ততদিন হ্যানসকে না দেখতে যাওয়াই ভালো। কারণ, মানুষ যখন দুঃখে পড়ে তখন তার কাছে কারও যাওয়া উচিত নয। তাতে তাকে বিব্রত করা হয়। অন্তত, প্রকৃত বন্ধুত্ব বলতে এইটাই আমি বুঝি। আর এ বিষয়ে আমি যে ঠিক সে-সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত। সুতরাং বসন্তকাল না আসা পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করব; তারপরে আমি দেখা করব তার সঙ্গে। সে তখন আমাকে এক বাক্স প্রিমরোজ উপহার দিয়ে যথেষ্ট আনন্দ পাবে।

প্রচুর পাইন কাঠের আগুনের ধারে মেভাজি একটা আরাম কেদারায় বসে তার স্ত্রী বলল–অন্য লোকের সম্বন্ধে তুমি বেশ চিন্তাশীল দেখছি। বন্ধুত্বের সম্বন্ধে তোমার এই ধরনের। কথা শুনতে আমার বেশ ভালো লাগছে যদিও পাদরি বাবা বিরাট তিনতলা বাড়িতে থাকেন। এবং কড়ে আঙুলে সোনার আংটি পরেন তবুও আমি নিশ্চিত যে তিনিও এইরকম সুন্দর কথা বলতে পারবেন না।

মিলারের সবচেয়ে ছোটো ছেলেটা বলল–কিন্তু তাঁকে কি আমরা এখানে আনতে পারি নে? যদি তিনি সত্যিকার দারিদ্রে পড়ে থাকেন আমি তাহলে তাঁকে আমার অর্ধেকটা খাবার দিতে পারি–আর দেখাতে পারি আমার সাদা খরগোসগুলি।

মিলার বেশ উঁচু স্বরে বলল–আচ্ছা বোকা ছেলে তো! তোমাকে স্কুলে পাঠিয়ে যে কী সুরাহা হচ্ছে তা আমি বুঝতে পারছি না কিছুই শিখছ বলে তো মনে হচ্ছে না। হ্যানস যদি এখানে এসে আমাদের এই ভালো-ভালো খাবার, ভালো-ভালো লাল মুদ, আর এমন আরামের গৃহস্থালী দেখে তাহলে তার মনে হিংসার উদ্য হতে পারে, এই হিংসাটাই হচ্ছে বন্ধুত্বের পহেল্ক বড়োই বিপজ্জনক। এতে মানুষের স্বভাব-চরিত্র নষ্ট হয়ে যায়। আমি কিছুতেই হ্যানসকে তার চরিত্র নষ্ট করতে দেব না। তার সবচেয়ে প্রিয়ে বন্ধু আমি। সব সময় আমি তার ওপরে নডরে রাখব। দেখব সে যাতে লোভের পথে পা না বাড়ায়। তাছাড়া সে যদি এখানে আসে তাহলে আমার কাছ থেকে ধারে কিছু ময়দা নেওয়ার প্রস্তাব সে দিতে পারে। কিন্তু আমি তাকে ধার দিতে পারি নে। মযদা আর বন্ধুত্ব এক জিনিস নয়। দুটো জিনিসের বানাই। আলাদা। তাদের অর্থও যে আলাদা সেকথা সবাই জানে।

বিরাট একটা পাত্রে মদ ঢেলে তার স্ত্রী বলল–বা! কী সুন্দর কথা! মনে হচ্ছে, আমি গির্জায় রয়েছি।

মিলার বলল–অনেক মানুষই ভালো অভিনয় করতে পারে। কিন্তু ভালো কথার শক্তি কম মানুষেরই রয়েছে। এ থেকেই বোঝা যায় দুটোর মধ্যে ভালো কথা বলাটাই বেশি শক্ত-আর সেই সঙ্গে সূতর।

এই বলে ছেলের দিকে এমন রুষ্টভাবে সে তাকিয়ে রইল যে বেচারা লজ্জায় মাথা নীচু করল। যাই হোক, তার ব্যস এত কম যা তাকে হমা করা যেতে পারে।

জলের ইঁদুর জিজ্ঞাসা করল–তোমার গল্প শেষ?

লিনেট বলল–মাত্র শুরু।

জলের ইঁদুর বলল–তুমি তো তাহলে দেখছি সেকেলে হয়ে গিয়েচ্ছ। আজকাল প্রতিটি দক্ষ। কথকই শেষ থেকে শুরু করে, তারপরে চলে যায় প্রথমে, শেষ করে মাঝখানে। এইটিই হচ্ছে নতুন রীতি। সেদিন একজন সমালোচক একটি যুবককে সঙ্গে নিয়ে পুকুরের ধারে বেড়াতে বেড়াতে এই কথা বলছিলেন। আমি তা শুনেছি। কথাটা সত্যি বলেই মনে হচ্ছে আমার। কারণ ভদ্রলোকের চোখে নীল চশমা, মাথায় টাক আর যখনই যুবকটি কিছু বলতে চাইছিল তখনই তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তাঁর কণ্ঠ থেকে ধ্বনিত হচ্ছিল

একটিমাত্র ধ্বনি-পুঃ। কিন্তু গল্পটা শুরু কর ভাই। তোমার এই মিলারটিকে আমার বেশ ভালো লাগছে। অনেক সৎগুণ তার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি।

লিনেট বলল–বসন্ত আসার সঙ্গে সঙ্গে মিলার তার স্ত্রীর কাছে ঘোষণা করল যে খুদে হ্যালস-এর সঙ্গে দেখা করতে যাবে।

তার স্ত্রী সানন্দেই বলল–সত্যিই তোমার হৃদয় কত উদার। তুমি সব সময় অন্য লোকের কথা ভাবা যাই হোক, ফুল আনার জন্যে সেই বড়ো ঝুড়িটা নিয়ে যেতে ভুলো না যেন।

যথারীতি ব্যবস্থা গ্রহণ করে মিলার হ্যানস-এর সঙ্গে দেখা করতে গেল।

গুডমর্নিং হ্যানসা শীতকালটা কাটল কেমন?

হ্যানস বলল–প্রশ্নটা করে তোমার হৃদ্যতারই পরিচয় দিযে। না, খুব কষ্টেই গিয়েছে। কিন্তু বসন্তকাল এসে গিয়েছে। আমি এখন খুশিই। আমার ফুল সব ভালোই কাটছে।

মিলার বলল–সারা শীতকালটাই আমরা তোমার কথা ভেবেছি। তুমি যে কেমন করে কাটাচ্ছ তাই ভেবেই অবাক হচ্ছিলাম আমরা।

ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। আমি তো ভেবেছিলাম তোমরা আমাকে প্রায় ভুলেই গিয়েছ।

তোমার কথা শুনে অবাক হচ্ছি হ্যানসা বন্ধুত্ব কাউকে ভুলতে দেয় না। এর সম্বন্ধে ওইটাই হল সবচেয়ে আশ্চর্য কথা মনে হচ্ছে, জীবন-কাব্য বলতে কী বোঝায় তা তুমি জান না। ভালো। কথা! তোমার ওই প্রিমরোভগুলি সত্যিই কী সুন্দর।

হ্যানস বলল–নিশ্চয়, নিশ্চয়। আমার ভাগ্য ভালো যে অতগলো সন্দর প্রিমরোজ ফল আমার বাগানে ফুটেছে। আমি ওগুলি বাজারে নিয়ে গিয়ে বার্গোমাস্টারের মেয়েকে বিক্রি করব; আর সেই টাকায় আমার একচাকার ঠেলাগাড়িটা ফিরিয়ে নিয়ে আসব।

ফিরিয়ে আনবে? তুমি কি সেটা বিক্রি করে দিয়েছিলে?

বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছিলাম। বুঝতেই পাচ্ছ শীতকালটাই হচ্ছে আমার দুঃসময়। তখন রুটি কেনার মতো পয়সাও আমার হাতে থাকে না। প্রথমে বিক্রি করলাম রুপোর বোতাম, তারপরে কুপোর চেন, তারপরে সেই বড়ো পাইপ, তারপরে ঠেলাগাড়ি, এখন আমি সব কটাই ফিরিয়ে আনব।

মিলার বলল–হ্যানস, আমি তোমাকে আমার ঠেলাগাড়িটা দেব। গাড়িটা অবশ্য খুব একটা ভালো অবস্থায় যে নেই সেকথা অবশ্য মিথ্যে নয়। তবু সেটা আমি তোমাকে দেব। আমি জানি এ থেকে আমার হৃদযটা যে কতটা দরাজ তাই প্রমাণিত হবে; আর ওটা বিলিয়ে। দেওয়ার জন্যে অনেকে যে আমাকে মূর্খ বলবে সেদিক থেকেও আমার কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি বিশ্বের আর দশটা মানুষের মতো নই। আমি জানি উদারতাই হচ্ছে

বন্ধুত্বের মূল কথা। আর তা ছাড়া, আমার একটা নতুন ঠেলাগাড়ি রয়েছে। তুমি নিশ্চিন্ত হও। আমি ওটা তোমাকে দেব।

খুদে চেহারার হ্যানস-এর মুখটা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল; সে বলল–সত্যিই বড়ো উদার তুমি। বাড়িতে আমার কিছু কাঠের তক্তা রয়েছে। ওগুলি দিয়ে কম খরচেই আমি ওটা সারিয়ে নিতে পারব।

মিলার বলল–কী বললে! কাঠের তক্তা। আরে, আমার গোলার ছাদের জন্য ঠিক ওইগুলিই তো আমার চাই। ছাদে একটা বিরাট গর্ত হয়েছে সেই গর্তটা বোজাতে না পারলে বৃষ্টির জলে আমার সব শস্য নষ্ট হয়ে যাবে। কী সৌভাগ্য যে তুমি খবরটা দিলে! একটা সৎকাজের ইঙ্গিত আর একটা সৎকাডের সংবাদ কী করে দেয় এইটাই হল তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমি তোমাকে আমার ঠেলাগাড়ি দিয়েছি; তুমি আমাকে তোমার তক্তা দাও। অবশ্য তক্তার চেয়ে ঠেলাগাড়ির দাম অনেক বেশি। কিন্তু সত্যিকার বন্ধুত্ব কোনোদিন দর কষাকষি করে না। অনুগ্রহ করে ওগুলি আমাকে দাও; আমি এখনই কাজ শুরু করে দিই।

নিশ্চয়-নিশ্চয়-এই বলে হ্যানস দৌড়ে গিয়ে তক্তাগুলি টেনে আনল।

সেই দিকে তাকিয়ে মিলার বলল–তা তো বেশ বড়ো নয় হে। ভয় হচ্ছে আমার চাল সারানোর পরে এমন কিছু তক্তা বাঁচবে না যা দিয়ে তোমার ঠেলাগাড়ি সারানো চলবে। অবশ্য তার জন্যে আমি দায়ী নই। এখন আমি তোমাকে আমার ঠেলাগাড়িটা দিয়ে

দিলাম। তারই প্রতিদানে নিশ্চয় তুমি আমাকে কিছু ফুল দেবে। এই নাও ঝুড়ি, ওটা ভর্তি করে দিতে ভুলো না যেন।

একটু দুঃখিত হয়ে হ্যানস জিজ্ঞাসা করল–ভর্তি?

সে জানত অতবড়ো ঝুড়ি ভর্তি করতে গেলে বাগানে তার আর কোনো ফুলই থাকবে না; অথচ তার রুপোর বোতামটা ফিরিয়ে আনার জন্যে ফুল নিয়ে তখনই বাজারে যাওয়া চাই।

মিলার বলল–তোমাকে আমি ঠেলাগাড়িটা দিয়ে দিলাম। তার বদলে কয়েকটা ফুল চাওয়াটা এমন কিছু বেশি নয়। আমার হয়তো ভুল হয়েছিল। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম সত্যিকার বন্ধুত্বের মধ্যে দেনা-পাওনার ব্যাপারটা একেবারেই গৌণ।

খুদে হ্যানস বলল–প্রিয় বন্ধু নিয়ে যাও আমার বাগানের সব ফুল। আমার রুপোর বোতামের। চেয়ে তোমার উপদেশ অনেক বেশি মূল্যবান।

এই বলে সে সেই বিরাট ঝুড়ি নিয়ে ফুলে সেটা বোঝাই করে দিল।

বিদায় হ্যানস–এক কাঁধে তক্তা আর এক হাতে ঝুড়িটা নিয়ে মিলার বিদায় নিল।

পরের দিন সে যখন বাগানে কাজ করছিল এমন সময় পিঠে বিরাট একটা ময়দার বোঝা নিয়ে মিলার তার বাগানের ধারে এসে হাজির হল, বলল–প্রিয় হ্যানস, এই বোঝাটা আমার হয়ে তুমি একটু বাজারে বয়ে নিয়ে যাবে?

হ্যানস বলল–সত্যিই আমি খুব দুঃখিত। আজ আমার অনেক কাজ রয়েছে বাগানে।

মিলার বলল–সত্যিই আমাকে অবাক করলো তোমায় ঠেলাগাড়িটা দেব এই কথা শুনেও কি এটুকু কাজ না করাটা তোমার পহেক্ষ অবন্ধুর কাজ করা হবে না?

হ্যানস চিৎকার করে বলল–আর ওকথা বলো না। সমস্ত পৃথিবীর বিনিময়েও আমি অবন্ধুর মতো কাজ করব না। চল।

দিনটা সত্যিই গরম ছিল। শুধু যে ভীষণ গরম তাই নয় একেবারে ধুলোতে ভর্তি। কিছুটা গিয়েই সে এত ক্লান্ত হয়ে পড়ল যে বিশ্রামের জন্য তাকে বসে পড়তে হল। তা সত্ত্বেও সে বীরত্বের সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে একসময় বাজারে পৌঁছল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরে বেশ ভালো দামে সে ময়দা বিক্রি করে তাড়াতাড়ি বাড়ির পথ ধরল; কারণ তার ভয় হল রাত হয়ে গেলে পথে সে দস্যুদের কবলে পড়তে পারে।

ঘুমোতে যাওয়ার সময় খুদে হ্যানস নিজের মনে-মনেই বলল–আডং সারা দিনটাই খুব পরিশ্রম হয়েছে। কিন্তু মিলারের কাজ করতে আমি যে অস্বীকার করিনি সেটা ভালোই

হয়েছে, কারণ, মিলারই আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু। তাছাড়া সে আমাকে তার ঠেলাগাড়িটা দেবে বলেছে।

পরের দিন খুব ভোরেই ময়দার দাম নেওয়ার জন্য মিলার তার বাড়িতে এসে হাজির হল কিন্তু ক্লান্ত হ্যানস তখনো বিছানা থেকে ওঠেনি।

মিলার বলল–তুমি বড়োই অলস হয়ে উঠচ্ছা সত্যি বলতে কি, তোমায় আমি আমার ঠেলাগাড়িটা দেব বলেছি। বিশেষ করে সেই জন্যেই তোমার কঠোর পরিশ্রম করা উচিত। আলস্য হচ্ছে মহা পাপ। আমার বন্ধুরা কেউ অলস হোক তা আমি চাই নে। সম্পষ্ট কথা বলছি বলে কিছু মনে করো না। তোমাকে যদি বন্ধু বলে না ভাবতাম তাহলে এসব কথা বলার চিন্তাও আমি করতাম না। কিক্তি মনের কথাটা প্রকাশ করে যদি বলতেই না পারলাম তাহলে বন্ধু হয়ে আর কী লাভ আমার? ইত্যাদি ইত্যাদি।

চোখ রগড়াতে খদে হ্যানস বিছানায় উঠে বসে বলল–সত্যিই বড়ো দঃখিত: কিন্তু গতকাল আমি এতই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম যে ভাবলাম আজ একটু বেশিক্ষণ শুয়ে থেকে পাখির গান শুনব। পাখির গান শোনার পরে আমার কাজ করার শক্তি অনেক বেড়ে যায় তা কি তুমি জান?

খুদে হ্যানস-এর পিঠে চাপড় দিযে মিলার বলল–তোমার কথা শুনে খুশি হলাম। তুমি কিন্তু তাড়াতাড়ি জামাকাপড় ছেড়ে আমার মিল-এ এস। ছাতাটা সারিয়ে দিতে হবে।

ফুলগাছ দু'দিন জল পায়নি; বেচারা হ্যানস-এর তাড়াতাড়ি বাগানে যাওয়া দরকার, যে এমন সৎ বন্ধু যে মিলারকে নিরাশ করতে তার ইচ্ছে যাচ্ছিল না।

একটু লজ্জিতভাবে সে বলল–আজ আমি ব্যস্ত রয়েছি। না গেলে কি কিছু মনে করবে?

মিলার বলল–এ কী বলছ! তোমাকে আমি ঠেলাগাড়িটা দেব বলছি। তারপরে একাজটা করে দেওয়ার জন্যে তোমাকে কিছু বলারই আমার দরকার রয়েছে বলে ভাবিনি। কিন্তু যদি তুমি। যেতে অস্বীকার কর তাহলে অগত্যা নিজেই করে নেব।

হ্যানস তাড়াতাড়ি বলল–না, না। আমি এখনই যাচ্ছি।

এই বলেই সে লাফিয়ে উঠে জামাকাপড় পরতে এগিয়ে গেল।

মিলার উৎসাহিত হয়ে বলল–অপরের কাজ করে দেওযার মতো নযুলাভিরাম কাজ আর নেই।

সারাদিন কাজ করার পর সন্ধের সময় বিশ্রাম নিতে-নিতে আর কপালের ঘাম মুছতে মুছতে হানস বলল–তুমি যা বল তা শোনা পরম উপাদ্যে। কিন্তু তোমার এই সুন্দর আদর্শের কথা কোনোদিনই যে আমার মাথায় আসবে আমি ভাবতে পারিনি।

মিলার সাহস দিয়ে বলল–আসবে, আসবে, কিন্তু আরো কষ্ট করতে হবে তোমাকে। বন্ধুত্ব কাকে বলে তা শিখতে এইতো সবে শুরু করে। একদিন আসবে যখন সব বুঝতে পারবে তুমি।

পারব? সত্যি বলছ?

নিঃসন্দেহে। কিন্তু আজ তুমি বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম করা কাল সকালে আমার মেষগুলোকে চরাতে নিয়ে যেতে হবে।

বেচারা হ্যানস এর প্রতিবাদ করতে ভয় পেল। পরের দিন সকালেই মিলার তার একপাল মেষ নিয়ে হাজির হল তার বাগানের ধারে। সেই পাল নিযে হ্যানস ছুটল পাহাড়ের ওপরে। সারাদিন মেষ চরিয়ে ফিরে এল সন্ধেবেলায়; কিন্তু তখন সে এত ক্লান্ত যে চেয়ারে বসেই সে ঘুমিয়ে পড়ল। সকাল হওয়ার আগে আর তার ঘুম ভাঙেনি।

আজ বাগানে কাজ করে আমি বেশ আনন্দ পাব–এই কথা বলে সে তক্ষুনি বাগানে বেরিয়ে গেল।

কিন্তু তার বন্ধু মিলার প্রায়ই তার বাগানে এসে নানা কাজে তাকে ডেকে নিয়ে যেতে লাগল। ফলে মন দিয়ে সে বাগানে কাজ করার সময় পেল না। এই জন্যে মাঝে মাঝে সে মনে বড়ো কষ্ট পেত; কিন্তু এই ভেবে নিজেকে সে সান্ত্বনা দিতে চাইত যে মিলার

তার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু। মিলারের সব ভালো-ভালো কথাগুলি সে একটা খাতায় টুকে নিয়ে প্রতিদিন রাত্রিতে সে সেগুলি পড়ত।

একদিন সন্ধেবেলায় খুদে হ্যানস ঘরের মধ্যে বসে-বসে আরাম করে আগুন পোহাচ্ছিল এমন সময় দরজায় বেশ জোরে-ডোরে কে যেন আঘাত করল। রাত্রিটা ছিল ঝড়ো; বাইরে তখন প্রচণ্ড ঝড়ের দাপাদাপি চলেছে। সে ভাবল ওই ঝড়ই তার কপাটে ধাক্কা দিচ্ছে। কিন্তু তারপরেই আবার একটা ধাক্কা এল, তারপরে আবার, আবার। আর প্রতিটি ধাক্কাই আগের ধাক্কার চেয়ে বেশি ডোরাল।

নিশ্চয় কোনো হতভাগ্য পথিক–এই মনে করে সে দৌড়ে এসে খিল খুলে দিল। দেখল একটা লণ্ঠন আর লাঠি নিয়ে মিলার দাঁড়িয়ে রয়েছে।

চেঁচিয়ে বলল মিলার–প্রিয় হ্যানস, আমি বড়োই বিপদে পড়েছি। সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে আমার বাচ্চা ছেলেটা খুব চোট খেয়েছে। আমি ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছি। কিন্তু তিনি এত দূরে থাকেন, আর রাত্রিটা এত খারাপ যে হঠাৎ আমার মনে হল তোমাকে ডাক্তারের বাড়ি পাঠানোটাই সব দিক থেকে ভালো হবে। তুমি জান তোমাকে আমার ঠেলাগাড়িটা দান। করছি। সেই দিক থেকে এটাই সঙ্গত যে প্রতিদানে তুমি আমার এই কাজটা করে দেবে।

হ্যানস উৎসাহিত হয়ে বলল–নিশ্চয়, নিশ্চয়। তুমি যে এসেছ এতে নিজেকে আমি ভাগ্যবান বলেই মনে করছি। আমি এখনই যাচ্ছি। কিন্তু তোমার ওই লণ্ঠনটা দাও-কারণ রাত্রিটা বড়ো অন্ধকার-আলোর অভাবে আমি হয়তো খানায় পড়ে যেতে পারি।

মিলার বলল–খুবই দুঃখিত। এটা এইমাত্র কিনেছি কিনা! এটার কিছু হলে আমার অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে।

ঠিক আছে, ঠিক আছে আমি অন্ধকারেই বেরিয়ে যাচ্ছি।

এই বলেই সে ঝড়ের রাতে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়।

ওঃ! কী ভীষণ রাত! এত অন্ধকার যে তার পক্ষে পথ চেনা দায় হয়ে উঠল, এত ঝড়ের দাপাদাপি যে রাস্তায় পা ফেলাই দায়। যাই হোক, দুঃসাহসী ছিল বলেই হয়তো প্রায় ঘন্টা। তিলেক ঝড় আর অন্ধকারের সঙ্গে লড়াই করে সে ডাক্তারের বাসায় এসে হাজির হল এবং দরজায় করাঘাত করল।

শোওয়ার ঘরের জানালার ভেতর দিয়ে উঁকি দিয়ে ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন–কে?

খুদে হ্যানস, ডাক্তার।

কী চাই?

মিলারের ছোটো ছেলেটা সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে চোট খেয়েছে, সে আপনাকে এক্ষুনি যেতে বলেছে।

‘ঠিক আছে’–এই বলে ডাক্তার সাজপোশাক করে লণ্ঠন নিয়ে গাড়িতে চেপে তক্ষুনি বেরিয়ে গেলেন মিলারের বাড়ির দিকে। আর তারই পিছু পিছু বেচারা হ্যানস চলতে লাগল হেঁটে-হেঁটে।

কিন্তু ঝড়ের দাপাদাপি বাড়তে লাগল; শুরু হল মুষলধারে বৃষ্টি। কোন দিকে যাচ্ছে হ্যানস-এর পক্ষে তা বোঝা দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়াল; গাড়ির সঙ্গেও আর সে তাল দিয়ে চলতে পারল না। তারপরে একসময় সে পথ হারিয়ে ফেলে সোডা জনবিরল মাঠের চারপাশে ঘুরতে লাগল। ডায়গাটা ছিল বিপজ্জনক। খানাখোঁদল আর গভীর জলাশয়ে ভর্তি ছিল জায়গাটা। তাদেরই একটা জায়গায় বেচারা হ্যানস ডুবে মারা গেল। পরের দিন বিরাট একটা জলাশয়ে তার মৃতদেহটাকে ভাসতে দেখল মেষপালকরা। তারপরে তার দেহটাকে তার বাড়িতে বয়ে আনা হল।

খুদে হ্যানসকে ভালোবাসত সবাই; সেই জন্যে তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় সবাই যোগ দিতে এল। মিলারই হল সেই ক্রিয়ার প্রধান পাণ্ডা।

মিলার বলল–আমিই ছিলাম তার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু; তাই আমারই উচিত এই সভার সবচেয়ে ভালো স্থানটি দখল করা।

এই বলে গায়ে কালো পোশাক চড়িয়ে, কালো রুমালে মাঝে মাঝে চোখের জল মুছতে মুছতে সে শোকযাত্রার পুরোভাগে চলতে শুরু করল।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার শেষে সরাইখানায় আরামের সঙ্গে বসে মশলা দেওয়া মদ আর মিষ্টি কেক খেতে-খেতে কামার বলল–খুদে হ্যানস-এর মৃত্যু প্রত্যেকের কাছে একটা ক্ষতি।

মিলার বলল–অন্য কারো কথা জানি নে, কিন্তু তার মৃত্যু আমার কাছে নিঃসংশয়ে বিরাট একটা ক্ষতি ছাড়া আর কিছু নয়। সে আমার এত প্রিয় বন্ধ ছিল যে তাকে আমার ঠেলাগাড়ি আর একটু হলে দানই করে ফেলতাম। এখন সেটাকে নিয়ে আমি কী করব ভেবে পাচ্ছি না। সেটা বাড়িতে ফেলে রাখতে আমার অসুবিধে হচ্ছে। তার অবস্থা এতই খারাপ যে এমন অবস্থায় বিক্রি করেও বিশেষ কিছু ঘরে আসবে না। এর পরে আর কাউকে যাতে কিছু দেওয়ার বাসনা আমার না হয় সেদিক থেকে খুব সতর্ক হতে হবে। উদার হতে গেলে মানুষকে দুঃখ পেতেই হয়।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পরে জলের ইঁদুর বলল–মানে?

লিনেট বলল–মানে, এইখানেই আমার গল্প শেষ।

জলের ইঁদুর জিজ্ঞাসা করল–কিন্তু মিলারের শেষ পর্যন্ত কী হল?

লিনেট বলল–তা আমি জানি নে; আর জানারও ইচ্ছে নেই।

জলের ইঁদুর বলল–এতেই বোঝা যাচ্ছে তোমার চরিত্রে সহানুভূতি বলে কোনো পদার্থ নেই।

লিনেট বলল–এই গল্পের নীতিটা কী তা নিশ্চয় তুমি বুঝতে পারছ না।

জলের ইঁদুর প্রায় গোঙিয়ে উঠল–কী-কী বললে!

নীতি।

তুমি বলতে চাও গল্পটার একটা নীতি রয়েছে?

নিশ্চয়।

রাগে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করতে করতে ইঁদুর বলল–বটে, বটে! সেকথা শুরু করার আগে তুমি আমাকে বলনি কেন? তা যদি বলতে তাহলে তোমার এ গল্প আমি শুনতামই না। সত্যি কথা বলতে কি সেই সমালোচকের মতো আমি শুধু বলতাম-পুঃ।

এই বলে গভীর বীতশ্রদ্ধায় ল্যাজ নাড়িয়ে একটা চকিত শব্দ করে সে তার গর্তের মধ্যে ঢুকে গেল।

কয়েক মিনিট পরে সাঁতার কাটতে কাটতে ফিরে এসে হাঁসটা জিজ্ঞাসা করল জলের ইঁদুরকে–কেমন লাগল তোমার? ওর সত্যিই কি ভালো বক্তব্য রয়েছে; কিন্তু আমি হচ্ছি মা; মা-এর অনুভূতি রয়েছে আমার মধ্যে যারা চিরকুমার তাদের দিকে চোখের জল না ফেলে আমি তাকাতে পারি নে।

লিনেট বলল–মনে হচ্ছে আমি তাকে বিরক্ত করেছি। মোদ্দা কথাটা হচ্ছে আমি তাকে এমন। একটি গল্প বলেছিলাম যার মধ্যে একটা নীতি রয়েছে।

হাঁসটা বলল–তাই বুঝি! ওটাই সর্বক্ষেত্রে বিপজ্জনক। এবং তার সঙ্গে আমিও একমত।

ক্যানটারভিলে ভূত

The Canterville Ghost

অ্যামেরিকান মিনিস্টার মিঃ হিরাম বি. ওটিস ক্যানটারভিলে চেস বাড়িটি কিনে যে নির্বুদ্ধিতার কাজ করেছেন এই কথাটা ঘুরে-পরে সবাই তাঁকে বলেছিল। কারণ বাড়িটি যে ভূতুড়ে সেবিষয়ে কারও কোনো সন্দেহ ছিল না। এমন কি ন্যায়নিষ্ঠ লর্ড ক্যানটারভিলে নিজেও মিঃ ওটিস তাঁর সঙ্গে দরদস্তুর করতে এলে, তাঁরে এ-বিষয়ে সাবধান করে দিয়েছিলেন।

লর্ড ক্যানটারভিলে বললেন–আমরা নিজেরাই ওই বাড়িটা বাসের উপযুক্ত বলে মনে করিনি। একবার আমার বিধবা পিতামহী বোলটনের ডাচেস ডিনারের জন্যে পোশাক পালটাচ্ছিলেন। এমন সময় দুটি কঙ্কাল হাত এসে তাঁর কাঁধের ওপরে পড়ে। এই দেখেই ভয়ে তিনি মূর্দা যান। আরো একটা কথা আপনাকে আমার বলা দরকার, মিঃ ওটিস, আমাদের সংসারের অনেকেই ওই ভূতটাকে দেখেছে; এমন কি স্থানীয় গির্জার রেকটার এবং কেম্ব্রিজের কিংস কলেজের ফেলো রেভা, আগস্টাস ড্যামপিয়রও বাদ যাননি। ডাচেসর সেই দুর্ভাগ্যজনক দুর্ঘটনার পর থেকে আমাদের ছোকরা চাকরদের কেউ আর আমাদের সঙ্গে ওই বাড়িতে থাকতে রাজি হয়নি; আর রাত্রিতে বারান্দা আর লাইব্রেরির দিক থেকে যে সমস্ত অদ্ভুত-অদ্ভুত শব্দ আসত সেই সব শব্দ শোনার পরে লেডি ক্যানটারভাইলের রাত্রে ঘুম হত না।

মিনিস্টারটি উত্তর দিলেন–মি লর্ড, আসবাবপত্র আর ভূত দুজনকেই বাড়ির সঙ্গে দাম নিয়ে আমি কিনে নেব আমি যে-দেশ থেকে আসছি সেটা হচ্ছে আধুনিক। সেখানে টাকা দিয়ে সব কিছু কেনা যায়। আজকাল ছোকরারা পুরনো পৃথিবীটাকে লাল রঙে চিত্র-বিচিত্র করে আর সেরা অভিনেত্রী আর নতকীদের তুলে নিয়ে গিয়ে বাহবা লুটছে। আমার ধারণা ইওরোপে ভূত বলে যদি কোনো পদার্থ থেকেই থাকে তাহলে অতি শীঘ্রই আমরা তার জন্যে জনসাধারণকে আনন্দ দেওয়ার উদ্দেশ্যে হয় যাদুঘরের ব্যবস্থা করে দেব আর নয়তো রাস্তায় নিয়ে খেলা দেখাব।

লর্ড ক্যানটারভিলে একটু হেসে বললেন–আমার বিশ্বাস ভুত রয়েছে, যদিও সে আপনাদের অতি উদযোগী সংগঠকদের প্রস্তাব হয়তো নাকচ করে দিয়েছে। তিনশো বছর ধরে ও এখানে বাস করছে—১৫৪৮ সাল থেকেই একরকম বলতে পারেন এবং আমাদের সংসারে কারও মৃত্যুর আগেই সব সময়ে ও দেখা দিয়েছে।

লর্ড ক্যানটারভিলে, কারও মৃত্যুর আগে বাড়ির ডাক্তারও তো আসেন। কিন্তু স্যার, ভূত বলে। কোনো বস্তু নেই। আমার ধারণা ব্রিটিশ অভিজাত সম্প্রদায়কে খুশি করার জন্যে প্রকৃতি তার। কর্তব্যকর্মে অবহেলা করবে না।

মিঃ ওটিসের শেষ মন্তব্যটি অনুধাবন করতে না পেরে লর্ড ক্যানটারভিলে বললেন–অ্যামেরিকাতে আপনারা খুব স্বাভাবিক অবস্থায় দিন কাটান; আর বাড়িতে আপনি যদি ভূতের অস্তিত্ব স্বীকার না করেন তাহলে আমার অবশ্য বলার কিছু নেই। কেবল মনে রাখবেন এ-বিষয়ে আপনাকে আমি আগেই সাবধান করে দিয়েছি।

সপ্তাহ খানেকের ভেতরেই বাড়ি কেনার কাজ শেষ হয়ে গেল; মাসের শেষ নাগাদ। মিনিস্টার আর তাঁর সংসারের সবাই সেই বাড়িতে উঠে এলেন। মিসেস ওটিস এখন মধ্যবয়স্কা রমণী, চোখ দুটি আর চেহারা বড়োই সুন্দর। ইনি ছিলেন প্রাক-বিবাহিত জীবনে ওয়েস্ট তিপ্পান্নতম স্ট্রিটের নিউ ইয়র্কের প্রখ্যাত নর্তকী মিস লুক্রেসিয়া আর টাপান। দেশ। ছাড়ার পরে অনেক আমেরিকান মহিলাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়ে যায়–এক কথায় তাঁরা হয়ে। পড়েন চিররুগ্ন; তাঁরা মনে করেন এইটাই বুঝি ইওরোপীয় শালীনতা। কিন্তু মিসেস ওটিস সে ভুল করেননি। তাঁর স্বাস্থ্যটি বড়ো চমৎকার ছিল। জৈব প্রেরণায় তিনি ছিলেন উদ্দাম। সত্যি কথা বলতে কি অনেক দিন থেকেই তিনি ছিলেন ইংরাজ রমণী। আজকাল এক ভাষা ছাড়া আমেরিকার সঙ্গে আমাদের যে অদ্ভুত একটা মিল রয়েছে তিনি ছিলেন তারই একটি উজ্জ্বল। নিদর্শন। জাতীয়তাবাদের উৎসাহে বাপ-মা তাঁদের বড়ো ছেলের নাম দিয়েছিলেন ওয়াশিংটন। এর জন্যে অনুশোচনা তাঁরা কম করেননি। ছেলেটির চুলগুলি বড়ো। চমৎকার–দেখতে মোটামুটি ভালোই। পরপর তিনটি বছর নিউপোর্ট ক্যাসিনোতে জার্মানদের হারিয়ে আমেরিকান কূটনীতিতে সে যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেছিল। এমন কি লন্ডনেও বেশ ভালো নাচিয়ে হিসাবে সে বেশ নাম করেছিল। মিস ভাডিনিযার বয়স পনেরো-চঞ্চলা, হরিণ শিশুর মতো সুন্দর দুটি বড়ো বড়ো নীল চোখ-স্বাধীন আর বেপরোয়া। শক্তির দিক থেকেও একেবারে রণদুর্মদা। একবার টাট্টু ঘোড়ার ওপরে চেপে সে বৃদ্ধ লর্ড বিলটনের সঙ্গে দু’দুবার পার্কের চারপাশে দৌড়ে অ্যাকিলিসের প্রতিমূর্তির ঠিক সাত হারিয়ে দিয়েছিল। এই দেখে চেশায়ারের যুবক ডিউক আনন্দে এতই উত্তেজিত হয়ে ওঠে যে। সে সেখানেই তাকে বিয়ের প্রস্তাব করে। ফলে তার অভিভাবকেরা সেই রাত্রিতেই তাকে ইটনে পাঠিয়ে দেন।

ডিউক কাঁদতে কাঁদতে চলে যায় ইটলে। ভার্জিনিয়ার পরে দুটি যমজ ছেলে হয়। তারা সব সময় বনবন করে ঘুরত বলে তাদের নাম দেওয়া হয়েছিল 'দি স্টারস আর স্ট্রাইপস, বড়ো সুন্দর ছেলে দুটি একমাত্র মিঃ ওটিস ছাড়া সেই পরিবারের ওরাই ছিল একমাত্র রিপাবলিকান।

ক্যানটারভিলে চেস সবচেয়ে কাছের রেল স্টেশন অ্যাসকেট থেকে সাত মাইল দূরে। মিঃ ওটিস একটা খোলা গাড়ির জন্যে টেলিগ্রাফ করেছিলেন। সবাই বেশ সুর্তি করে হইচই করতে-করতে গাড়িতে উঠে বসলেন। জুলাই মাসের একটি সুন্দর সন্ধ্যা-পাইন বনের গন্ধে বাতাস একেবারে মাতোয়ারা। মাঝে-মাঝে বুনো পায়রার ডাক শোনা যাচ্ছিল। বীচ গাছের ভেতর দিয়ে তাঁদের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল বাচ্চা বাচ্চা কাঠবিড়ালেরা। ক্যানটারভিলে চেস-এর রাস্তায় ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে আকাশ হঠাৎ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গেল। নেমে এল বাতাসে একটা থমথমে ভাব। মাথার ওপর দিয়ে একদল দাঁড়কাক নিঃশব্দে উড়ে গেল। বাড়িতে পৌঁছানোর আগেই কয়েকটা বড়ো বড়ে

একটি বৃদ্ধা মহিলা সিঁড়ির ওপরে নেমে এসে তাঁদের অভ্যর্থনা জানালেন। পরিধানে তাঁর কালো সিল্কের একটি পরিচ্ছন্ন পোশাক, মাথায় সাদা টুপি, আর গায়ে সাদা এপ্রোন। ইনি হচ্ছেন গৃহকর্ত্রী মিসেস উমনে। লেডি ক্যানটারভিলের অনুরোধ তাঁকেই মিসেস ওটিস তাঁর পূর্ব পদে বহাল রাখতে রাজি হয়েছিলেন। তাঁর পিছু পিছু তাঁরা সবাই সুন্দর টিউডর যুগের হলঘর পেরিয়ে লাইব্রেরি ঘরে এসে ঢুকলেন। ঘরটা হচ্ছে লম্বা, নীচু কালো ওক গাছের প্যানেল দেওয়া ঘর। এখানেই চা-এর বন্দোবস্ত হয়েছিল। জামা খুলে

তাঁরা সবাই বসে চারপাশে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন। মিসেস উমনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে করতে লাগলেন তদারকি।

হঠাৎ মিসেস ওটিস লক্ষ করলেন ফায়ার প্রেসের পাশে মেঝের ওপরে হালকা ধরনের একটা লাল দাগ পড়ে রয়েছে। এর অর্থটা কী বুঝতে না পেরে তিনি মিসেস উমনেকে বললেন–ওখানে সম্ভবত কোনো রঙ পড়েছে।

মিসেস উমনে নীচু স্বরে বললেন–হ্যাঁ, মাদাম। ওখানে রক্তের ছিটে পড়েছে।

মিসেস ওটিস চিৎকার করে উঠলেন–কী বিপদ! বসার ঘরে ওরকম রক্তের দাগ আমি মোটেই বরদাস্ত করতে পারি লো এখনই ওটা মুছে ফেলতে হবে।

বৃদ্ধাটা হেসে আগের মতোই রহস্যজনক স্বরে বললেন–ওটা হচ্ছে লেডি এলিনোর দ্য ক্যানটারভিলের রক্ত। ১৫৭৫ সালে ঠিক এই জায়গাতেই স্বামী স্যার সাইমন দ্য ক্যানটারভিলে তাঁকে হত্যা করেছিলেন। স্যার সাইমন তারপরে নটি বছর বেঁচেছিলেন। তার পরেই একদিন রহস্যজনকভাবে হঠাৎ তিনি নিরুদ্দেশ হয়ে যান। তাঁর দেহটিকে আডও খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাঁরই প্রেতাত্মা এখন-ও এই বাড়িতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিদেশি পর্যটক এবং আরো অনেক এই রক্তচিহ্নটিকে খুবই প্রশংসা করেছেন; আর ওটিকে আজ পর্যন্ত মুছে ফেলা সম্ভব হয়নি।

ওয়াশিংটন ওটিস চিৎকার করে বলল–যত সব আবোল-তাবোলের কথা! পিনকারটার চ্যাম্পিয়ন স্টেন রিমোভার এবং প্যারাগন ডিটারজেন্ট লাগালেই ও-রঙ উঠে যাবে।

সেই ভয়ার্ত গৃহকর্ত্রী কিছু বলার আগেই সে হাঁটু মুড়ে বসে কালো কসমেটিক-এর মতো একটা চিটচিটে বস্তু দিয়ে মেঝেটা ঘষতে শুরু করল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সেই দাগ উঠে গেল।

বিজয়গর্বে সে চেঁচিয়ে উঠল–আমি জানতাম এতেই কাজ হবে। কিন্তু এই কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গে হঠাৎ একটা বিদ্যুৎ চমকে উঠল, সেই থমথমে ঘরের মধ্যে বিদ্যুতের ঝিলিক খেলে গেল–আর ভীষণ একটা বজ্ঘাত তাঁদের সকলের আপাদমস্তক কাঁপিয়ে দিয়ে গেল। মিসেস উমনে তো সেই শব্দে ভির্মি গেলেন।

অ্যামেরিকান মিনিস্টার শান্তভাবে বললেন–সত্যিই কি ভয়ঙ্কর আবহাওয়া! এই বলে তিনি লম্বা একটা চুরুট ধরালেন।-আমার ধারণা, এই পুরনো অঞ্চলটির লোকসংখ্যা এতই বেশি গিয়েছে যে প্রত্যেকে ভালো আবহাওয়া পাচ্ছে না। আমি সব সময়েই বলে এসেছি এই সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় হচ্ছে এদেশ থেকে জনতাকে বিদেশে পাঠিয়ে দেওয়া।

মিসেস ওটিস বললেন–প্রিয় হিরাম, যে মহিলা মূর্ছা যান তাঁকে নিয়ে আমরা কী করব?

ভাঙা জিনিসপত্রের মতো ব্যবহার কর-তাহলে আর উনি মূর্ছা যাবেন না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মিসেস উমনের জ্ঞান ফিরে এল। তিনি যে বেশ বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন সেবিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না। তিনি কঠোরভাবে মিঃ ওটিসকে এই বলে সাবধান করে দিলেন যে এই সংসারের ওপরে বিষম একটা বিপদ ঘনিয়ে আসছে।

তিনি বললেন নিজের চোখে আমি অনেক জিনিস দেখেছি, স্যার। সেই সব দেখে যে কোনো ক্রিশ্চানের শরীরেই রোমাঞ্চ জেগে উঠবে। এখানে যে সব ভয়ঙ্কর জিনিস ঘটেছে সেই সব দেখে রাত্রে আমি ঘুমোতে পারি নে।

মিঃ ওটিস এবং তাঁর স্ত্রী অবশ্য সেই সৎ মহিলাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন যে ভূতটুতকে তাঁরা ভয় করেন না। তাঁর নতুন মনিব-পত্নীর ওপরে ঈশ্বরে আশীর্বাদ বর্ষিত হোক এই প্রার্থনা করে আর সেই সঙ্গে মাইনে বাড়ানোর ব্যবস্থা করে বৃদ্ধা গৃহকর্ত্রী টলতে টলতে নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন।

সারা রাত্রি ধরেই ভীষণ ঝড় চলল; কিন্তু বিশেষ কোনো ঘটনা ঘটেনি। পরের দিন সকালে কিন্তু মেঝের ওপরে আবার সেই রক্তের দাগটা দেখা গেল। ব্রেকফাস্টের সময় সবাই নীচে নেমে এসে ব্যাপারটা লক্ষ করল। ওয়াশিংটন বলল–আমার মনে হচ্ছে এর জন্যে প্যারাগন ডিটারজেন্টের দোষ নেই। এটা আমি অনেক পরীক্ষা করেছি। এর জন্যে নিশ্চয় ওই ভূতটাই দাষী। আবার সে ঘষে-ঘষে রক্তের দাগটা মুছে ফেলল; কিন্তু পরের দিন সকালে আবার সেই একই ব্যাপার ঘটল। যদিও লাইব্রেরি ঘরে যথারীতি তালা দেওঘা দিল, তৃতীয় দিন সকালেও সেই রক্তের দাগ দেখা দিল। এই দেখে সবাই বেশ

কৌতূহলী হয়ে উঠল। মিঃ ওটিস ভাবলেন, ভূত নেই এ-বিষয়ে তাঁর ধারণা কিছুটা বাড়াবাড়ি হয়ে পড়েছিল। মিসেস ওটিস মনে করলেন প্রেতাত্মা নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন তাঁদের দলে তিনি নাম লেকাবেনা অপরাধের সঙ্গে ভড়িত রক্তচিহ্নের স্থায়িত্ব নিয়ে মেসার্স মেঘারস আর পড়মোর কোম্পানিকে দীর্ঘ একটি চিঠি লেখার পরিকল্পনা গ্রহণ করল। ওয়াশিংটন। সেই রাত্রিতেই রাত্রিতেই ভূতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সকলের সন্দেহ চিরদিনের জন্যে দূর হল।

সারাটা দিনই যেমন রোদ উঠেছিল তেমনি ছিল গরম, শীতল। সন্ধ্যায় সবাই মোটরে চড়ে বেড়াত গেযেছিল। রাত্রি ন'টার আগে কেউ ফেরেনি সেদিন। ফিরেই সামান্য আহার করেছিল সবাই। সেদিন ভূত নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি। সুতরাং ভূতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ধারণা করার প্রাথমিক কোনো শর্তও সেদিন ছিল না। মিঃ ওটিসের কাছে আমি শুনেছিলাম সেদিন তাঁদের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল বিভিন্ন ধরনের, বিশেষ করে অবস্থাপন্ন আমেরিকানরা যে সব বিষয় নিয়ে সাধারণত আলোচনা করে–যেমন, অভিনেত্রী হিসাবে সারা বার্নদোতের চেয়ে মিস ফ্যানি ড্যাভোনপোর্টের শ্রেষ্ঠতা, এমন কি অবস্থাপন্ন ইংরাডংদের বাড়িতে সবুজ শস্য, বাকযুইট কেক, দুধে সেদ্ধ ভুট্টাচূর্ণের দুষ্প্রাপ্যতা; পৃথিবীর আত্মাকে বাঁচানোর জন্যে বোস্টন বন্দরের প্রয়োজনীয়তা, রেল-ভ্রমণে গাঁটরি পরীক্ষা করার সুবিধা, লন্ডনের বিরক্তিকর উচ্চারণের তুলনায় নিউ ইয়র্কের উচ্চারণের মিষ্টতা ইত্যাদি। অতিপ্রাকৃত ঘটনার সম্বন্ধে। কোনো আলোচনাই সেদিন হয়নি, এমন কি গল্পচ্ছলে স্যার সাইমন দ্য ক্যাটারভাইলের নাম উচ্চারণও কেউ করেননি। রাত্রি এগারোটার সময় সবাই শুয়ে পড়লেন এবং সাড়ে এগারোটার মধ্যেই ঘরের আলো সব নিবে গেল। কিছুক্ষণ পরে ঘরের বাইরে বারান্দায় ওপরে একটা অদ্ভুত শব্দে মিঃ

ওটিসের ঘুম ভেঙে গেল। শব্দটা শুনে মনে হল ধাতুত ধাতুতে ঠোকাঠুকির শব্দ। আরো মনে হল শব্দটা ক্রমশ তাঁর ঘরের দিকেই এগিয়ে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি। বিছানা থেকে উঠে দেশলাই জ্বালিয়ে সময়টা দেখে নিলেন। ঘড়িতে তখন কাঁটায় কাঁটায় একটা বেড়েছে। বেশ শান্তভাবেই নিজের নাড়িটা দেখে নিলেন। না; এতটুকু বেচাল হয়নি নাড়ি। সেই অদ্ভুত শব্দটা তখনো হচ্ছিল। তিনি বেশ স্পষ্টই শুনতে পেলেন কেউ যেন পা ঠুকে ঠকে তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। চটি পরে তিনি তাঁর 'ড্রেসিং কেস' থেকে লম্বাটে একটা ফাইল। বার করে দরজাটা খুললেন। ম্লান চাঁদের আলোতে তিনি দেখলেন তাঁরই সামলে ভয়ঙ্কর চেহারার এরটি বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার চোখ দুটো জলন্ত কয়লার মতো জ্বলছে। জটার মতো লম্বা ধূসর চুলগুলো ঝাঁপিয়ে পড়েছে তার কাঁধের ওপরে। তার পরিধানে প্রাচীন কালের পোশাক, সেগুলি যেমন নোংরা, তেমনি ফেঁড়া। তার হাতের কব্জি আর পায়ের গাঁট থেকে বেশ ভারী আর মরচে-পড়া শেকল ঝুলছে।

মিঃ ওটিস বললেন–প্রিয় মহাশয়, ওই শেকলগুলিতে তেল দেওয়ার জন্য বাধ্য হয়েই আমি আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি। আর সেই জন্যেই তামানি রাইসিং সান লিউব্রিকেটর'-এর একটা ছোটো শিশি আমি এনেছি। একবার লাগালেই কাজ হবে এতে। এর গুণ কত সে সম্বন্ধে। প্রশংসাপত্র-ও এর গায়ে সাঁটা রয়েছে। শোওয়ার ঘরের বাতির কাছে এটা আমি রাখছি। প্রয়োজন হলে এই জাতীয় আরো তেল আমি আপনাকে আনন্দের সঙ্গেই সরবরাহ করব।

এই বলে যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রী মহোদয় মার্বেল টেবিলের ওপরে শিশিটি রেখে দরজা বন্ধ করে শোওয়ার জন্যে প্রস্থান করলেন।

স্বাভাবিক একটা ঘৃণা আর বিরক্তিতে ক্যানটারভাইলের ভূত এক মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। তারপরে সেই পালিশকরা মেঝের ওপরে সজোরে শিশিটাকে আছাড় দিয়ে শুকনো আর্তনাদ করতে করতে আর ভৌতিক সবুজ একটা আলো ছড়াতে ছড়াতে ভূতটি বারান্দা। দিয়ে পালিয়ে গেল। ঠিক যখন সে ওক কাঠের বিরাট সিড়িঁটার ওপরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে এমন সময় একটা দরজা হাট হয়ে খুলে গেল; দুটি খুদে সাদা পোশাক-পরা মূর্তির আবির্ভাব হল। আর সেই সঙ্গে একটা লম্বা বলিশ তার মাথার ওপর দিয়ে হুইশ-ইশশব্দে করে উড়ে গেল। নষ্ট করার মতো সময় আর না থাকায় ভূতটি ঝটিতি চতুর্থ ডাইমেনশনের সাহায্যে কাঠের তক্তার ভিতর দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপরে শান্ত ই বাড়িটি।

বাড়িটা বাঁ দিকে ছোটো একটা গোপন কক্ষে ঢুকে চাঁদের রশ্মির পিঠে হেলান দিয়ে বসে সহজভাবে সে নিঃশ্বাস নিতে লাগল। সেইখানে বসেই নিজের অবস্থাটা ভালো করে বোঝার চেষ্টা করল সে। বিগত তিনশো বছরের গৌরবোজ্জ্বল এবং নিবরচ্ছিন্ন জীবনে এইভাবে অপমানিত সে আর কোনোদিন হয়নি। বিধবা ডাচেসের কথা তার মনে পড়ল। লেস আর মুক্তা হাতে নিয়ে যখন তিনি আমার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন সেই সময় ভয় দেখিযে সে তাঁকে জ্ঞান হারাতে বাধ্য করেছিল। একটা খালি ঘরের পর্দা তুলে সে স্রেফ ভেংচি কেটে যে চারটি পরিচারিকাকে উন্মাদ করে তুলেছিল তাদের কথা মনে হল তারা মনে হল স্থানীয় গির্জার রেকটরের কথা। একদিন বেশি রাত্রি করে লাইব্রেরি থেকে তিনি যখন ফিরছিলেন। এমন সময় সে তাঁর বাতিটা নিবিয়ে দিয়েছিল। তারপর থেকে ভদ্রলোক স্যার উইলিয়ম। গাল-এর চিকিৎসাধীন ছিলেন। বলতে গেলে স্নায়ু-বৈকল্যেই

তিনি শেষ পর্যন্ত আপ্পাদান। করেন। মনে পড়ে গেল বৃদ্ধা মাদাম দ্য ট্রিমোলিক-এর কথা। ভদ্রমহিলা একদিন প্রত্যুষে উঠে দেখেন আগুনের ধারে একটি আরাম কেদারায় বসে একটি কংকাল তাঁর নিজের ডায়েরি পড়ছে। এর ফলে তিনি দু'সপ্তাহ মানসিক রোগে বিছানায় পড়ে ছিলেন। সেরে উঠে তিনি গির্জার চলে গেলেন। তারপর থেকে কুখ্যাত নাস্তিক মঁসিয়ে দ্য ভলতেযরের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করেন। সেই ভয়ঙ্কর রাত্রির কথা তার মনে পড়ে গেল যেদিন গলার ভেতরে। মুক্তার মালা ঢুকিযে অসৎচরিত্র লর্ড ক্যানটারভিলেকে দমবন্ধ অবস্থায় তার ড্রেসিং রুমে পড়ে থাকতে দেখা গেল। মৃত্যুর ঠিক আগে সে স্বীকার করেছিল যে তাসের ভেলকি দেখিয়ে চার্লস জেমস ফক্সকে সে পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড ঠকিযেছিল; আর ভূতই যে তাকে ওই মালাটা গিলতে বাধ্য করেছিল সেকথাও স্বীকার করতে দ্বিধা করেনি সে। সেই সব বিরাট বিরাট কৃতিত্বের কথা মনে পড়ে গেল তার মনে পড়ল বাটলারের কথা। ডানালার কপাটের ওপরে সবুজ একটা হাতকে ঠুকঠুক করতে দেখে বেচারা নিজেকেই নিজে গুলি করে হত্যা করল। সেই সুন্দরী লেডি স্টাটফিল্ডের কথাও সে ভুলতে পারল না। তাঁর সেই শ্বেতকণ্ঠের ওপরে পাঁচটা আঙুলের দাগ চিপে বসে যে ক্ষতের সৃষ্টি করেছিল সেই ক্ষত ঢাকার জন্যে তিনি সব সময় কালো ভেলভেটের বন্ধনী গলার ওপরে জড়িয়ে রাখতেন। তারপরে একদিন তিনি পুকুরে ডুবে আত্মহত্যা করলেন। সত্যিকার কলাবিদের আত্মম্ভরিতার উৎসাহে সে তার ভীবনের কৃতিত্বপূর্ণ অধ্যায় গুলি নিয়ে আলোচনা করল। এইসব কৃতিত্ব দেখানোর পরে কোথা থেকে হতভাগা একটা আমেরিকান এসে তাকে রাইসিং সান লিউব্রিকেটর দিতে চায়! তার। মাথা লক্ষ করে বালিশ ছুঁড়ে দেয়! অহো ভাগ্যম! অসহ্য, অসহ্য! তাছাড়া, কোনো ভুত যে। নশ্বর মানুষের কাছে এইভাবে অপমানিত হয়েছে এর

নজির ভুতদের ইতিহাসে আর। কোথাও নেই। সেই জন্যে, প্রতিহিংসা চরিতার্থতাকে করতেই হবে। আর সেই চিন্তাতেই মারা দিনটাই সে মশগুল হয়ে বসে রইল।

পরের দিন সকালে ওটিসরা ব্রেকফাস্টের টেবিলে বসে ভূতের বিষয়ে কিছু আলোচনা করলেন। তাঁর উপহার এটি গ্রহণ করেনি এটা দেখে যুক্তরাষ্ট্রের মিনিস্টার স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা বিরক্ত হলেন। তিনি বললেন-ভূতের শীরীরিক কোনো ক্ষতি করার ইচ্ছা আমার নেই, কিন্তু দীর্ঘ সময় ধরে ভূতটি এখানে বাস করছে সেই কথা ভেবে এটা বলতে আমি বাধ্য যে তাকে লক্ষ করে বালিশ ছোঁড়াটা ভদ্রতাসূচক হয়নি।

যথার্থ মন্তব্য; কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলছি যে এই কথা শুনে দুটি যমজ ভাই একেবারে হো-হো করে হেসে উঠল

মিঃ ওটিস বলে গেলেন–অন্য পক্ষে ‘রাইসিং সান লিউব্রিকেটর’ নিতে ওর যদি সত্যিই আপত্তি থাকে তাহলে ওর শেকলগুলি আমাদের খুলে নিতে হবে। কারণ ঘরের বাইরে এই ধরনের শব্দ হলে রাত্রিতে ঘুমের ব্যাঘাত হতে বাধ্য

সপ্তাহের বাকি কটা দিন অবশ্য তাঁরা নির্ঝঞ্ঝাটেই কাটিয়েছেন। ভূতটি কোনোরকম অদ্ভুত কাজ করার চেষ্টা করেনি। লাইব্রেরির মেঝেতে সেই রক্তের দাগটাই কেবল প্রতিদিন দেখা যাচ্ছিল–আর সেইটাই সকলকে বেশ উত্তেজিত করে রেখেছিল ব্যাপারটা সত্যিই বড়ো অদ্ভুত মিসেস ওটিস নিজে প্রতিদিন রাত্রিতে ওই ঘরটা চাবি দিয়ে বন্ধ করে দিতেন; সেই সঙ্গে খুব শক্ত করে বন্ধ করা হত জানালাগুলি অবাক হওয়ার

একমাত্র কারণ হচ্ছে এই যে রঙটা বহুরূপী। কোনো কোনো দিন সকালে ওটা ফিকে (প্রায় ভারতীয়) লাল, কোনো কোনো দিন সিঁদুরের মতো, কোনো কোনো দিন বা বেগনে। হঠাৎ একদিন প্রার্থনা থেকে ফিরে এসে তাঁরা দেখেন রঙটা হয়েছে উজ্জ্বল পান্নার মতো সবুজ রঙের এই দ্রুত পরিবর্তন স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা বেশ আমোদ পেতেন; আর এর আসল চরিত্রটা যে কী তাই নিয়ে বাজি ধরতে তারা দ্বিধা করতেন না। এঁদের মধ্যে একমাত্র ভার্জিনিয়াই ওঁদের। তর্ক-আলোচনা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখত। এই রক্তের দাগ দেখে বেশ কষ্ট হত তার। যে সকালে রক্তটা পান্নার মতো সবুজ হয়ে দাঁড়াল সেদিনই আর একটু হলে সে প্রায় কেঁদেই ফেলত।

রবিবার রাত্রিতে ভূতটির দ্বিতীয় আবির্ভাব হল। সবাই শুয়ে পড়ার একটু পরেই হঠাৎ হলঘরের মধ্যে কিছু একটা ভেঙে পড়ে যাওয়ার শব্দ হল। সেই ভীষণ শব্দে সবাই বেশ ভয় পেয়ে গেলেন। সবাই দৌড়ে নীচে নেমে এসে দেখলেন একটা জায়গায় কতকগুলি পুরনো বর্ম ঝোলানো ছিল, সেগুলি স্থানচ্যুত হয়ে শানবাঁধানো মেঝের ওপরে পড়ে গিয়েছে। আর উঁচু পিঠওয়ালা চেয়ারে বসে রয়েছে ক্যানটারভিলে ভূতা বসে-বসে হাঁটু দুটো সে ঘষছে; আর ভীষণ যন্ত্রণায় বিকৃত করছে তার মুখ। যমজ ভাই দুটি তাদের খেলার বন্দুক সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। ভূতের মাথা লক্ষ করে অভ্রান্তভাবে তারা দুটো ছররা ছুড়ল; আর ক্যালিফোরনিয়ান ভদ্রতা অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রী রিভলভার উঁচিয়ে ভূতটিকে মাথার। ওপরে হাত দুটো তুলতে নির্দেশ দিলেন। রাগে বিকট একটা চিৎকার করে ভূতটি লাফিয়ে উঠল; তারপরে ধোঁয়ার মতো সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। যাওয়ার সময় ওয়াশিংটন। ওটিসের বাতিটা নিবিঘে দিয়ে চারপাশ অন্ধকারে ঢেকে দিয়ে গেল। একেবারে থামল সিড়িঁর উপরে গিয়ে। সেখানে দাঁড়িয়ে সে তার বিখ্যাত

দৈত্যসুলভ হাসিটি হাসতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হল। কয়েকবারই সে দেখেছে এই হাসিটি তার বড়োই কাজে লেগেছে। শোনা যায় এই দানবীয় হাসি শুনে একরাত্রিতেই লর্ড বেকারের অমন ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া কালো চুল পেকে সাদা হয়ে গিয়েছে। আর মাস শেষ হওয়ার আগেই লেডি ক্যানটারভাইলের ফরাসি গভর্নেসরা চাকরি ছাড়ার নোটিশ দিতে বাধ্য হয়েছিল। সেই ভেবে সেই দানবীয় হাসিটি সে হাসল পুরনো বাড়ির খিলালে সেই ভয়ঙ্কর হাসিটি উন্মত্ত কলরবে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল; কিন্তু সেই প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যেতে না যেতেই সামনের একটা দরজা খুলে গেল; আর ফিকে নীল একটা ড্রেসিং গাউন পরে বেরিয়ে এলেন মিসেস ওটিস; বললেন—আমার ধারণা আপনার শরীরটা ভালো নেই। সেই জন্যে আমি এক বোতল ডাক্তার দোবেল-এর তৈরি মিকচার নিয়ে এসেছি। যদি বদহজম হয়ে থাকে তাহলে এতে আপনার যথেষ্ট উপকার হবে।

এই শুনে রাগে গরগর করতে-করতে ভূতটি তাঁর দিকে ক্যাঁট-ক্যাঁট করে তাকিয়ে রইল; তারপরে ঠিক করল একটা বড়ো কালো কুকুরের বেশ ধরবে সে। এই কাজে তার দক্ষতা সত্যিই ছিল অগাধ। কিন্তু সেই সময় তার দিকে এগিয়ে আসার পদশব্দ পেয়েই সে তার সেই ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা কার্যকরী করবে কিনা ভাবতে লাগল। সুতরাং সে ঈষৎ অগ্নিশিখায় রূপান্তরিত হয়েই সন্তুষ্ট হল; তারপরে গভীর একটা কবরখানার অতনাদ করেই সে অদৃশ্য হয়ে গেল। ঠিক সেই সময় যমজ দুটি ভাই কাছে এসে পড়ল।

নিজের ঘরে এসে সে একেবারে ভেঙে পড়ল। একটা তোলপাড় শুরু হয়ে গেল তার মনের মধ্যে। যমজ ভাই দুটির অসভ্যতা, আর মিসেস ওটিসের জঘন্য বস্তুবাদ স্বাভাবিকভাবেই তার কাছে বড়োই বিরক্তিকর মনে হল। কিন্তু যেটা তার কাছে বিষম

কষ্টদায়ক হল সেটা হচ্ছে এই যে সে বর্মটাকে পরতে পারল না। সে ভেবেছিল ভূত বর্ম পরে বসে রয়েছে এই দৃশ্য দেখে আধুনিক আমেরিকানেরও তাক লেকে যাওয়ার কথা। এর পেছনে অন্য কোনো সুবোধ্য কারণ না থাকলেও, তাদের ভাতীয় কবি লঙ ফেলোর সম্ভ্রমের জন্যেই তার চমকে যাওয়া উচিত ছিল। ক্যানটারভিলেরা যখন শহরে যেতেন তখন সারাদিনের মধ্যে একটি ক্লান্ত ঘন্টা সে নিজেও লঙ ফেলোর কবিতার বই-এর পাতা অনেকবার উলটিযেছে। কেনিলওয়ার্থ টুর্নামেন্টে সে নিজে এই বর্মটি বেশ সাফল্যের সঙ্গেই পরেছে; আর তাই দেখে অনূঢ় রানি। নিজেই তার কত প্রশংসা করেছেন। তবু আজ যখন সে সেই বর্মটি পরতে গেল তখন তার বিষম ভার বইতে না পেরে মেঝের ওপরে সে হুড়মুড় করে পড়ে গেল, পড়ে যাওয়ার ফলে তার ডান হাতের আঙুলের গাঁটগুলি হতবিহঙ্কৃত হল; হাঁটুর ওপরে বসে যন্ত্রণায় সে কুকুরের মতো চিৎকার করে উঠল।

এর পরে কয়েকটা দিন সে ভীষণ রকম অসুস্থ হয়ে উঠল। সেই রক্তাক্ত দাগটিকে যথাস্থানে। বসিয়ে দেওয়া ছাড়া নিজের ঘর থেকে সে বাইরে প্রায় বেরোল না বললেই হয়। যাই হোক, খুব সাবধানে থাকার ফলে সে সুস্থ হয়ে উঠল; সুস্থ হয়েই যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রী আর তাঁর পরিবারবর্গকে শায়েস্তা করার জন্যে সে তৃতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করতে কৃতসংকল্প হল। তার পুনরাবির্ভাবের দিল ঠিক করল শুক্রবার, ১৭ই আগস্ট। সেদিনের বেশির ভাগ সময়টাই সে তার পোশাক রাখার আলমারিটা ঘাঁটল। অনেক ঘেটেঘুটে সে একটা লাল পালক দেওয়া খোলসের তৈরি টুপি বার করল; সেই সঙ্গে বার করল মরচে-পড়া একটা ছোরা। সন্ধের দিকে ভয়ঙ্কর ঝড়ের সঙ্গে শুরু হল বৃষ্টি। এত ডোরে বাতাস বইতে লাগল যে পুরনো বাড়ির জানালা-দরজাগুলো সব খটাখট করে শব্দ করতে

লাগল। সত্যি কথা বলতে কি এই রকম একটা আবহাওয়াকেই সে পছন্দ করতে বেশি। তার পরিকল্পনাটা হচ্ছে এইরমক ওয়াশিংটন ওটিসের ঘরে সে নিঃশব্দে প্রবেশ করবে। বিছানার কাছে পায়ের দিকে দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে সে বিড বিড় করে কথা বলবে; তারপর মৃদু একটা সঙ্গীতের সুরের তালে-তালে নিজের গলার মধ্যে তিনবার জা ়েরটা বসিয়ে দেবে। ওয়াশিংটন ওটিস-ই 'পিঙ্কারটনের প্যারাগন ডিটারজেন্ট দিয়ে বারবার সেই রক্তের দাগটা মুছে দিচ্ছে। এই জন্যে তারই ওপরে তার রাগটা ছিল বেশি। সেই বেপরোয়া আর মূর্খ যুবকটিকে ভয়ে একেবারে উথানশক্তিরহিত করে দিয়ে সে ঢুকে যাবে সেই ঘরে যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রী আর তাঁর স্ত্রী ঘুমোচ্ছেন। মিসেস ওটিসের কপালের ওপরে তার চিটচিটে হাতটা রেখে কবরখানার ভয়ঙ্কর গোপন রহস্যের কথা ফিসফিস করে মিঃ ওটিসের কানের কাছে আওড়াবো ভার্জিন্যি মেয়েটার ব্যাপারে সে এখনই কিছুই ঠিক করে উঠতে পারেনি। মেয়েটি বেশ শান্তশিষ্ট। এখনো পর্যন্ত সে তাকে কোনো আপমান। করেনি। ওয়ার্ডোবের ভেতর থেকে কয়েকটা শূন্যগর্ভ আওয়াজও তার পহেক্ক যথেষ্ট হবে। তাতেও যদি তার ঘুম না ভাঙে তাহলে সে কাঁচের জানালাটা বাগিয়ে ধরে একটু আঁচড়াবে। আর ওই যমজ ভাই দুটো, তাদের সে বেশ একটু শিক্ষা দেবেই। প্রথমেই অবশ্য সে তাদের বুকের ওপরে গিয়ে বসবে। তাদের মনে হবে দুঃস্বপ্ন দেখে তাদের দম বন্ধ হয়ে আসছে। তারপরে তাদের বিছানা কাছাকাছি বলেই, সে সবুজ বরফের মতো ঠাণ্ডা কনকনে মৃতদেহের মতো তাদের দুটি বিছানার মাঝখানে দাঁড়াবে; এতেই তারা ভয়ে জমে যাবে। শেষকালে, বিছানার চাদর দুটো তুলে সাদা ব্লিচ করা হাড় আর ঘূর্ণায়মান চোখ বার করে সে ঘরময় হামাগুড়ি দেবে।'ডাম্ব দ্যানিয়েল' অথবা 'সুইসাইড স্কেলিটনের' অভিনেতার মতো দেখতে হবে তাকে। এই চরিত্রে অনেকবারই সে উন্নতধরনের পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। মার্টিন দ্য ম্যানিয়্যাক'

অথবা 'দ্য মাস্কড মিস্ট্রি'-তে যে বিখ্যাত চরিত্রটি সে অভিনয় করেছিল এই অভিনয়টি মোটামুটি তারই কাছাকাছি যাবে।

সাড়ে দশটার সময় সবাই শুতে গেল। সে শব্দ সে শুনতে পেল। যমজ ভাই দুটোর উন্মত্ত চিৎকারে কিছুক্ষণ সে একটু অস্থিরতার মধ্যে রইল। তার মনে হল, স্কুলের ছাত্রদের মতো ছেলে দুটো ঘুমানোর আগে হালকা হাসিঠাট্টায় মেতে উঠেছে। কিন্তু সওয়া এগারোটার সব শান্ত হয়ে এল। বারোটা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে বেরিয়ে পড়ল। কাঁচের জানালার পাশে পেঁচারা পাখার শব্দ করল; পুরানো ইউ গাছের ওপর থেকে চিৎকার করে উঠল দাঁড়কাকের দল;আর হারিয়ে যাওয়া আত্মার মতো আর্তনাদ করতে-করতে বাতাস ছোটাছুটি করতে লাগল। চারপাশে। কিন্তু নির্বিকারভাবে ওটিসের পরিবার ঘুমের বিভোর। তাদের কপালে যে কী লেখা রয়েছে সে কথা তারা ভাবতেও পারল না। ঝড়-জলের শব্দ ছাপিয়ে মন্ত্রীমহোদয়ের নাসিকাগর্জন তার কানে এসে ঢুকল। তার সেই নিষ্ঠুর বলিরেখায় ভরা মুখের ওপরে কদর্য একটা হাসি ফুটিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল চুপি চুপি। মেঘের ভেতরে চাঁদ লুকিয়ে পড়ল যে বিরাট 'ওরিয়েল' জানালার পাশে তার আর তার নিহত স্ত্রীর অস্ত্রগুলির নক্সা সোনার রঙে খোদাই করা ছিল সেখান দিয়ে সে পেরিয়ে এল। অমঙ্গল ছায়ার মতো সে এগোতে লাগল। মনে হল অন্ধকারও তাকে দেখে ঘৃণায় মুখ সঙ্কুচিত করছে। একবার মনে হল কার যেন ডাক শুনতে পাচ্ছে সে। মনে হতে সে থেমে গেল। না, ওটা হচ্ছে কুকুরের ডাক। ষোড়শ শতাব্দীতে প্রচলিত অদ্ভুত অদ্ভুত অভিসম্পাতের শব্দ ফিসফিস করে আওড়াতে আওড়াতে সে এগোতে লাগল। মাঝে মাঝে মধ্যরাত্রির বাতাসের বুকে সেই মরচ-পড়া ছোরটা লাগল দোলাতে। অবশেষে যে বারান্দা দিয়ে হতভাগ্য ওয়াশিংটনের ঘরে ঢোকা যায় সেই বারান্দায় হাজির

হল সে। মুহূর্তের জন্যে একটু দাঁড়াল। বাতাসে তার সাদা চুলগুলোকে ওলট-পালট করিয়ে দিয়ে সেই কদর্য মৃত লোকটার ভয়ঙ্করতা আরো বাড়িয়ে দিল। তারপরে সওযা বারোটার ঘণ্টা বাজল। সে বুঝতে পারল এবার সময় হয়েছে। মনের আনন্দে একটা চুকচুক শব্দ করে সে কোণের দিকে ঘুরে গেল। কিন্তু মুখটা ঘোরানোর সঙ্গে সঙ্গে একটা করুণ ভয়ার্ত চিৎকার করে সে। থমকে দাঁড়াল, তারপরে সাদা ফ্যাকাশে মুখটা তার লম্বা হাড়ের দুটো হাত দিয়ে ঢেলে দিল। ঠিক তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা ভয়ঙ্কর অশরীরী মূর্তি। চুপচাপ খোদাই করা মূর্তির মতো-উন্মাদের স্বপ্নের মতো ভোলা তার মাথাটা ন্যাড়া, বার্নিশ করা। তার মুখটা গোল, মোটা আর সাদা। মনে হল, একটা শাশ্বত ভ্রূকুটির ভেতর দিয়ে ভাল একটা অট্টহাসি। ফেটে-ফেটে পড়ছে। মুখটা যেন একটা আগুনে চুল্লি। অতিকায় দৈত্যের মতো চেহারার ওপরে তারই পরিধেযের মতো বিশ্রী ভয়াল একটা পোশাক ঝুলছে। তার বুকের ওপরে একটা প্রাচীরপত্র সাঁটা। তার ওপরে প্রাচীন অহঙ্করে কী যেন অদ্ভুত একটা লেখা। মনে হল ওর ওপরে লেখা রয়েছে কারও লজ্জার কাহিনি, কোনো উদ্দাম পাপের কাহিনি, কোনো পাপের ইতিহাস, তার ডান হাতে উঁচু করে ধরা রয়েছে চকচকে ইস্পাতের একটা কুকরি।

এর আগে কোনো ভূত না দেখার ফলে সে স্বাভাবিকভাবেই ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। তারপরে সেই ভয়ঙ্কর ভৌতিক প্রাণীটির দিকে তাড়াতাড়ি আর একবার তাকিয়ে নিয়েই সে তার ঘরের মধ্যে পালিয়ে গেল পালানোর সময় তার লম্বা চাদরটা ফেলে গেল বারান্দার ওপরে; আর মরচে-পড়া ছোরাটা পড়ে গেল মন্ত্রীমশাযের তোর ভেতরে। পরের দিন কালে। বাটলার সেটা কুড়িযে পায়। একবার নিজের নির্জন ঘরে হাজির হয়েই সে ঘরের বিছানার ওপরে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল; তারপরে কাপড়ের ভেতরে ঢুকিয়ে ফেলল

নিজের মুখ। যাই হোক, কিছুক্ষণ পরে সেই সাহসী ক্যানটারভিলে ভূতটি তার স্বাভাবিক অবস্থাটা ফিরিয়ে নিয়ে এল। তারপরে ঠিক করল সকাল হলেই সে নেমে গিয়ে দ্বিতীয় ভূতটির সঙ্গে কথা বলবে। সেই পরিকল্পনা অনুসারে ঠিক ভোর হয়-হয় এই রকম সময় সে সেই জাযগায় ফিরে গেল। ভাবল, একজন ভূতের চেয়ে দুগুন ভূতের শক্তি অনেক বেশি দুজনে মিলে তারা ওই যমড ভাই দুটিকে অনায়াসেই কায়দা করতে পারবে। যথাস্থানে হাজির হয়ে একটা ভয়ঙ্কর দৃশ্য তার চোখে পড়ল। ছায়া-মূর্তিটির নিশ্চয় কিছু একটা হয়েছে, কারণ তার সেই শূন্য। চকোটরে সেই লাল জ্যোতি আর নেই, সেই চকচকে কুকরিটা পড়ে গিয়েছে তার হাত থেকে; আর অসহায় ভাবে দেওয়ালের গায়ে সে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে কোনোরকমে। দৌড়ে গিয়ে হাত দুটো দিয়ে সে তাকে ধরল; সভয়ে দেখল ধরার সঙ্গে সঙ্গে তার মাথাটা ঘাড় থেকে বিচ্যুত হয়ে মেঝের ওপরে গড়িয়ে পড়ল; দেহটার কোমর গেল ভেঙে। সে দেখল। দু-সুতোর তৈরি একটা সাদা বিছানার চাদরকে সে জড়িয়ে ধরেছে। এই অদ্ভুত পরিবর্তনের অর্থটা হৃদয়ঙ্গম করতে না পেরে সে তাড়াতাড়ি সেই বিজ্ঞাপনটাকে মুঠোর মধ্যে ধরে। প্রভাতের আলোয় পড়তে লাগল। বাপরে, বাপ! বিশ্বের এই একটিমাত্র ভুত ছাড়া আর সব ভূতই মেকী! অতএব সাবধান। ঠকবেন না। ক্যানটারভিলে ভুত তো রেগে কাঁই আর সব ভুত মেকী। বিদ্যুতের মতো সব ব্যাপারটা তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। তার সঙ্গে ফাজলামি করা হয়েছে, তাকে ধাপ্পা দেওয়া হয়েছে, প্রতারণা করা হয়েছে তার সঙ্গে। বৃদ্ধ ক্যানটারভাইলের চোখে তার স্বাভাবিক দৃষ্টি ফিরে এল। ফোকলা মাড়ি দুটো চিপে ধরল সে। শীর্ণ হাত দুটো আকাশের দিকে উঁচিয়ে প্রাচীনতম যুগের রীতি অনুসারে চমৎকার বাকবিন্যাসের ভিত্তিতে সে প্রতিজ্ঞা করল—মোরগ যখন আনন্দের সঙ্গে দু'বার ডাকবে

তখনই রক্তাক্ত কাজ সংগঠিত হবে; নিঃশব্দ পদসঞ্চারে তখনই বেরিয়ে যাবে। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্যে।

এই ভয়ঙ্কর শপথ গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে লাল টালির ছাদ দেওয়া দূরের কোনো বাড়ি থেকে মোরগ ডেকে উঠল। একটা তিক্ত দীর্ঘ চাপা হাসি হেসে সে অপেক্ষা করতে লাগল। আধঘণ্টা ধরে সে অপেক্ষা করল; কিন্তু কোনো অজ্ঞাত কারণে, মোরগটা আর ডাকল না। অবশেষে সাড়ে সাতটার সময় বাড়ির চাকরানিরা এসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে আর সেখানে অপেক্ষা করতে পারল না। ব্যর্থ আশা আর ব্যর্থ উদ্দেশ্যের কথা ভাবতে ভাবতে কোনোরকমে সে। তার ঘের ফিরে এল। সেখানে গিয়ে প্রাচীন বীরত্বের ওপরে লেখা কয়েকটা বই ঘেটে সে দেখল। এই বইগুলি তার খুব প্রিয় ছিল। প্রতিটি ক্ষেত্রেই যখন সে ওই জাতীয় কোনো প্রতিজ্ঞা করেছে তখনই মোরগ নিয়ম করে দু'বার ডেকেছে। সে রেগে গজগজ করতে করতে বলল–দুষ্টু মোরগটা জাহান্নামে যাক। আমার সেদিন থাকলে আমার সেই শক্ত বর্শাটা নিয়ে ব্যাটাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে এমন চিৎকার করাতাম যে মনে হত ব্যাটা মরণ আর্তনাদ করছে।

পরের দিন ভূতটি বেশ দুর্বল আর ক্লান্ত হয়ে পড়ল। বিগত চারটি সপ্তাহে ভয়ঙ্কর উত্তেজনার ফল ফলতে শুরু করল। একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে গেল তার স্নায়ুগুলি। সামান্য একটু শব্দেই সে চমকে উঠতে লাগল। পাঁচটি দিন সে ঘরের মধ্যে বসে রইল; তারপরে ঠিক করল লাইব্রেরি। ঘরের মেঝেতে আর সে সেই রক্তচিহ্নটি বসিয়ে আসবে না। ওটিস-এর পরিবারবর্গ ওটা যদি পছন্দ না করে স্পষ্টতই ও-জিনিসটি না দেখার অধিকার তাদের রয়েছে। মনে হয় ওরা নীচু বাস্তব স্তরের মানুষ। ইন্দ্রিয়ড ঘটনার যে

একটা সাংকেতিক মূল্য রয়েছে তা হৃদয়ঙ্গম করতে ওরা অক্ষম সপ্তাহে একবার আবির্ভাব হওয়া আর মাসের প্রতি প্রথম আর তৃতীয় শুক্রবার। ডানালার পাশে গিয়ে মুখ ভেঙানোই তার প্রধান কাজ। সে বুঝতে পারল না এই কর্তব্যে সে অবহেলা করবে কেমন করে? কথাটা সত্যি যে তার জীবনটা বড়ো নোংরা ছিল; কিন্তু আবার অন্য দিক থেকে কিছু অতি প্রাকৃতের সঙ্গে জড়িত তাদের সম্বন্ধে তার বিবেকটা ছিল বড়ো সজাগ। সেই জন্যে পরের তিনটি শনিবার যথারীতি সে বারান্দায় বেরিয়েছিল, কিন্তু কেউ তাকে দেখতে অথবা তার পায়ের শব্দ শুনতে যা পায় সে বিষয়ে সে খুব সতর্ক ছিল। এই উদ্দেশ্যে সে বুট খুলে ফেলল, ঘুণ-ধরা কাঠের তক্তার উপরে খুব আস্তে আস্তে হাঁটল, বেশ বড়ো কালো একটা ভেলভেটের আলখাল্লায় নিজেকে রাখল ঢেকে, আর শেকলগুলোকে মসৃণ। করার জন্যে, যদিও এটা করতে তার খুবই কষ্ট হয়েছিল, তবুও সে 'রাইসিং সান লিউব্রিকেটর' ব্যবহার করল। একাজ করতে প্রথমে সে অপমানবোধ করেছিলকিন্তু এই তেলের উপকারিতা বোঝার মতো জ্ঞান তার হয়েছিল। এতসব করার পরেও বারবার তাকে অপদস্ত হতে হল। প্রায় বারান্দার ওপরে দড়ি বেঁধে রাখত তারা। তার ফলে অন্ধকারে তাকে লাফিয়ে চলতে হত। একবার যমজ ভাই দুটি এমন এক কৌশল করেছিল যার ফলে তাকে ভীষণভাবে পড়ে যেতে হয়েছিল। এই শেষ অপমানটি তার এত বেশি লেগেছিল যে সে ঠিক করল–আব না, এবার তার লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে আনার জন্যে তাকে একবার শেষ চেষ্টা করতে হবে। সে ঠিক করে ফেলুল পরের রাত্রিতে 'রেকলেস রুপার্ট' অথবা 'দ্য হেডলেস। আর্ল'-এর যে বিখ্যাত ভূমিকায় সে অভিনয় করেছিল সেই বেশে ইটন-এ পড়া ওই দুটি উদ্ধত যুবককে একটা চরম শাস্তি সে দেবে।

সত্তর বছরেরও বেশি সে এই ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। সত্যি কথা বলতে কি সুন্দরী লেডি বারবারা মোদিসকে সে যেদিন ভয়ে মুহ্যমান করে দিয়েছিল সেদিনই সে এই ভূমিকায় শেষ অভিনয় করেছিল। সেই ভয়েই সে বর্তমান লর্ড ক্যানটারভিলে-এর পিতামহের সঙ্গে বিয়ে। ভেঙে দিয়ে সুন্দর যুবক জ্যাক ক্যাসলটনের সঙ্গে গ্রেটনা গ্রীন-এ পালিয়ে গিয়েছিল; বলেছিল, সন্ধে আর ভোরে যে বাড়ির বারান্দায় ভুত ঘুরে বেড়ায় দ্বন্দ্বযুদ্ধে বেচারা ড্যককে লর্ড ক্যানটারভিলে গুলি করে হত্যা করেছিলেন। তারই ফলে এক বছরের ভেতরেই ভগ্নহৃদয়ে। লেডি বারবারা টানব্রিজ ওয়েলস-এ মারা গিয়েছিল। তবে সাজগোজটা শেষ বড়োই কঠিন। সেই সাজ সাজতে তার পুরো তিনটি ঘন্টা লাগল। অবশেষে সাজগোজ শেষ হলে নিজের চেহারা দেখে সে বেশ খুশিই হল। একটা বেজে পনেরো মিনিটের সময় সে তার কুঠরি থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে যে বারান্দার ওপরে এসে দাঁড়াল। নীল পর্দা ঝোলানো থাকায় যে ঘরে যমজ ভাই দুটি থাকতো তাকে ‘ব্লু বেড চেম্বার’ বলা হত। ভালোভাবে ঢোকার জন্যে সে ধাক্কা দিয়ে কপাটটা খুল দিলা খুলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা ভারী জলের কুঁজো তার ওপরে পড়ে গেল; জল পড়ে তার চামড়া পর্যন্ত গেল ভিজে; ইঞ্চি দুয়েকের জন্যে তার বাঁ কাঁধটা। কোনোরকমে বেঁচে গেল। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই বিছানার ওপর থেকে চাপা গলার হাসি ভেসে এল। সমস্ত ব্যাপারটা তার স্নায়ুগুলিকে এমনভাবে বিকল করে দিল যে সে অত্যন্ত। দ্রুতবেগে তার ঘরে ফিরে এল। পরের দিন প্রচণ্ড ঠান্ডা লেগে সে শুয়ে রইল। তার একমাত্র সান্ত্বনা হল মাথাটাকে সে সঙ্গে করে নিয়ে যায়নি; গেলে কী সাংঘাতিক বিপদ ঘটত তা। ঈশ্বরই জানেন।

সেই অভদ্র আমেরিকানদের ভয় দেখানোর বাসনা অতঃপর সে পরিত্যাগ করল। শব্দহীন শ্লিপার পায়ে দিয়ে বারান্দায় গুঁড়ি দিয়ে ঘুরে বেড়িয়েই সে খুশি হল; এই বেড়ানোর সময় ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে গলায় সে একটা লাল মাফলার জড়াত: পাশে যমজ ভাইরা তাকে আক্রমণ করে এই ভয়ে হাতে সে রাখত সেকেল একটা বন্দুক। শেষ ধাক্কা খেল সে ১৯শে সেপ্টেম্বর। কোনোরকম অপমানিত হওয়ার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই এই মনে করে নীচের বিরাট ঘরে ঢোকার জন্যে সেদিন সে গিয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রী আর তাঁর স্ত্রীর যে দুটি ফটোগ্রাফ। ছিল–কিছুদিন আগেও ওখানে টাঙানো থাকত ক্যানটারভিলে বংশের ছবি, সেইদিকে তাকিয়ে সে ঠাট্টা করছিল তাঁদের। তার পরনে ছিল কবরখানার ধাঁচের পরিচ্ছন্ন অথচ লম্বা পোশাক, চোয়ালটা বাধা ছিল বেগনে রঙের কাপড়ের টুকরো দিয়ে হাতে ছিল কবর খননকারীর কোদাল। সত্যি কথা বলতে কি জোনাস দ্য গ্রেগুলেস', অথবা 'চার্টসে বার্ন-এর করপস স্যাচার'-এর ভূমিকায় যে পোশাক সে পরেছিল এটা সেই রকম। তার এই অভিনয় ক্যানটারভিলেদের মনে রাখার কথা; কারণ এই থেকে প্রতিবেশী লর্ড রুফোর্ড-এর সঙ্গে তাদের সত্যিকারের বিবাদ শুরু হয়। রাত্রি প্রায় দুটো বেড়ে মিনিট পনেরো হয়েছে। যতদূর সে ডানত তখন কারও ঘুরে বেড়ানোর কথা নয়। রক্তের কোনো দাগ পড়েছে কিনা দেখার জন্যে সে যখন লাইব্রেরি ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল ঠিক সেই সময় অন্ধকার থেকে অকস্মাৎ তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে উন্মত্তের মতো মাথার ওপরে হাত তুলে তার কানের কাছে চিৎকার করে বলল—বু-বু!!

অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেল সে এবং সেই অবস্থায় ভয় পাওয়াটাই তার কাছে অত্যন্ত স্বাভাবিক। ভয় পেয়ে সে সিঁড়ির দিকে দৌড়ে গেল, কিন্তু দেখল মিঃ ওটিস তাঁর বিরাট গার্ডেন সিরিঞ্জ' নিয়ে তার জন্যে অপেক্ষা করছেন। এইভাবে দু'পাশে শত্রুর দ্বারা

অবরুদ্ধ হয়ে, আর পালানোর কোনো প্রশস্ত পথ না পাওয়ার ফলে সে বিরাট লোহার স্টোভের ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল। তার ভাগ্য ভালো যে স্টোভটা লেবানো ছিল। চিমনির ভেতর দিয়ে কালিঝুলি মেখে এক কিম্ভতকিমাকার অবস্থায় শেষ পর্যন্ত নিজের ঘরে গিয়ে পৌঁছল সে।

এরপরে আর কোনোদিন সে রাত্রিতে বেড়াতে বেরতো না। যমজ ভাই দুটি অনেকবার তার। জন্যে অপেক্ষা করে বসে থাকত আর গোটা বারান্দাটায় সুপুরি ছড়িয়ে রাখত। এতে তাদের বাবা, মা আর চাকর-বাকর সবাই বিরক্ত হত। কিন্তু তাদের কাজ তার জন্যে ব্যাহত হয়নি। বেশ সপষ্টই বোঝা যায় ওদের ব্যবহারে সে এতই মর্মাহত হয়েছিল যে সে কিছুতেই বাইরে বেরতে পারেনি। ফলে মিঃ ওটিস তাঁর অপরূপ সাংস্কৃতিক আসর বসানোর আয়োজন করলেন। ছেলেরা সব নানাজাতীয় খেলায় মেতে উঠল, ভার্জিনিয়া তার টার্টু ঘোড়ার চেপে ঘুরতে লাগল রাস্তায় রাস্তায়, আর চেশায়াবের যুবক ডিউক তার ছুটির শেষ সপ্তাহটা কাটাতে এল ক্যানটারভিলে চেস-এ সবাই ভাবল ভুতটি বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছে এবং মিঃ ওটিস লর্ড ক্যানটারভিলেকে এ-বিষয়ে দীর্ঘ একটি পত্র লিখলেন। উত্তরে লর্ড তাঁর স্ত্রীকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানালেন।

সেদিক থেকে ওটিস প্রতারিত হয়েছিলেন। কারণ অকেজো হলেও, ভূত বাড়ি ছাড়েনি। বরং একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে যখনই সে শুনল চেশায়ারের যুবক ডিউক ওখানে অতিথি হিসাবে আসছে তখনই সে আর একবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠল। এরই বাবার কাকা লর্ড ফ্রানসিস স্টিলটল ক্যানটারভাইলের ভূতের সঙ্গে পাশা খেলবে বলে কর্নেল বারবারির সঙ্গে একবার একশো গিনি বাজি ধরেছিলেন। পরের দিন সকালে

তাস খেলার ঘরে মেঝের ওপরে তিনি অসহায় অবস্থায় পুষ্কাঘাতে পড়েছিলেন। তারপরে যদিও তিনি অনেক বছর বেঁচেছিলেন তবু আর কোনোদিন তিনি 'ডবল সিকসেস' ছাড়া আর কিছু বলতে পারেননি। যদিও এই ঘটনাটা তখনকার দিনে অনেকেই জানত তবু দুটি অভিজাত বংশের সম্ভ জন্যে ঘটনাটাকে চাপা দেওয়ার উদ্দেশ্যে সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। স্টিলটনদের ওপরে তার যে প্রভাব এখনো রয়েছে সেটা প্রমাণ করার জন্যেই সে স্বাভাবিক ভাবেই ব্যাকুল হয়ে উঠল। সেই জন্য সে ঠিক করল ভার্জিনিয়ার প্রেমিকের কাছে সে 'ভাম্পায়ার মউক'। অথবা 'রডলেস বেনিডিকটাইন'-এর বেশ ধরে দেখা দেবে। এই অভিনয়টি লেডি স্টারটাপ ১৭৬৪ সালের নববর্ষের রাত্রিতে দেখেছিলেন দেখেই ভয়ে চিৎকার করতে করতে তাঁর ফিট হল;আর তাতেই তিন দিনের দিন তিনি মারা গেলেন। মারা যাওয়ার সময় নিকট আত্মীয় ক্যানটারভিলেদের তাঁর সমস্ত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে তিনি তাঁর সব সম্পত্তি তাঁর। লন্ডনের ওষুধ বিক্রেতাকে দিয়ে গেল। কিন্তু শেষকালে যমজ ভাইদের ভয়ে সেই পরিকল্পনা তাকে ছাড়তে হল।

এরই কয়েক দিন পরে একদিন ভার্জিনিয়া আর তার কোঁকড়ানো চুলওয়ালা প্রেমিক দুজনে ব্রকলে মাঠের দিকে ঘোড়ায় চড়ে ঘুরতে গেল। একটা বুনো ঝোঁপ পেরোতে গিয়ে ভার্জিনিযা তার পোশাক এমন বিশ্রীভাবে ছিড়ল যে বাড়ি ফিরে সে ঠিক করল যাতে কেউ তাকে ওই অবস্থায় দেখতে না পায় সেই জন্যে সে পেছনের সিড়ি দিয়ে ঢুকবে। এই ভেবে সে ট্যাপেস্ট্রি চেম্বারের পাশ দিয়ে ছুটতে শুরু করল। চেম্বারের দরজাটা সামান্য একটু খোলা ছিল। তার মনে হল ভেতরে কেউ রয়েছে। তার মায়ের পরিচারিকা মাঝে-মাঝে ওইখানে বসে তার কাজকর্ম করত। সে ভাবল তাকেই সে তার পোশাকটা

সেলাই করে দিতে বলবে। এই ভেবে। ঘরের ভেতরে উঁকি দিল। উঁকি দিয়েই একেবারে অবাক হয়ে গেল। স্বয়ং ক্যানটারভিলে ভূত বসে রয়েছে সেখানে। জানালার ধারে বসে বসে ইয়োলো গাছের শুকনো সোনালি ফুলগুলির দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সোনালি ফুলগুলি বাতাসে উড়ছে; ঝড়ের আবেগে লাল পাতাগুল। উন্মত্ত আবেগে দীর্ঘ পথের ওপরে বেড়াচ্ছে নেচে। একটা হাতের ওপরে মাথাটা রেখে সে বসে রয়েছে। দেখলেই মনে হবে তার সারা সত্তার ওপরে মারাত্মক রকমের একটা অবসাদ নেমে এসেছে। একেবারে নিঃসঙ্গ পরিত্যাক্ত মনে হল তাকে। এ-অবসাদ তার আর নয়। ভূতটিকে ওই অবস্থায় দেখে প্রথমেই তার মনে হয়েছিল ছুটে পালিয়ে গিয়ে নিজেক ঘরে ঢুকে পড়া; কিন্তু তারপরেই কেমন যেন দয়া হল তারা তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার বাসনায় ভার্জিনিয়া উদ্বুদ্ধ হয়ে হালকা পায়ে তার দিকে এগিয়ে গেল। ভূতটি দুঃখ আর হতাশায় এতই মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল যে কথা না বলা পর্যন্ত ভার্জিনিয়ার উপস্থিতি সে টেরই পায়নি।

ভার্জিনিয়া বলল–আপনার জন্যে আমি দুঃখিত, কিন্তু আমার ভাইরা কালই ইটন-এ পড়তে চলে যাচ্ছে। এরপর থেকে আপনি যদি ভালোভাবে চলাফেরা করেন তাহলে আপনাকে আর। কেউ বিরক্ত করবে না।

সেই সুন্দরী মেয়েটি যে তার সঙ্গে কথা বলবে এটা ভাবতে না পেরে অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে ভূত বলল–আবোল-তাবোল বলে তো লাভ নেই–ভালোভাবে চলাফেরা করার কথা–সে অসম্বব–যা হয় না তাই, উদ্ভট ব্যাপার। আমাকে শেকলের শব্দ করতে কথা–সে অসম্ভব–যা হয় না তাই, উদ্ভট ব্যাপার। আমাকে শেকলের শব্দ করতে হবে,

ঝাঁঝরির ভেতর দিয়ে গোঙাতে হবে–রাত্রিতে বারান্দায় বারান্দায় ঘুরে বেড়াতে হবে। অবশ্য ভালোভাবে। চলাফেরা বলাতে এই যদি তুমি বোঝতে চাও সেটা হল অন্য কথা। আমার অস্তিত্বের কারণ একমাত্র ওইগুলিই।

উঁহু! অস্তিত্ব বজায় রাখার ওটা করণই হতে পারে না। তাছাড়া, আপনি যে খুব দুষ্ট প্রকৃতির ছিলেন তা আপনি নিজেও জানেন। যেদিন আমরা এখানে প্রথম এলাম সেইদিনই মিসেস উমনে আমাদের বলেছেন যে আপনি আপনার স্ত্রীকে খুন করেছিলেন।

ভূত বিরক্ত হয়ে বলল–সেকথা আমিও স্বীকার করি। কিন্তু সেটা আমার ঘরোযা ব্যাপার। সেবিষয়ে আর কারও কিছু বলার এক্তিয়ার নেই।

নীতির কথা শুরু হলে ভার্জিনিয়া মাঝে-মাঝে একটু গম্ভীর হয়ে পড়ে। এই কথা শুনে সে বলল–কাউকে হত্যা করাটা অন্যায়।

বস্তুনিরপেক্ষ নীতির সস্তা বাড়াবাড়িটাকে আমি ঘৃণা করি। আমার স্ত্রী ছিল একেবারে অকর্মা। সে কোনোদিন আমার জামার কলারে মাড় দিল না; আর রান্নার ব্যাপারে সে ছিল একেবারে অপদার্থ তোমাকে বলব কী, একবার হোগলে' বলে আমি একটা খরগোস শিকার করেছিলাম। কী অদ্ভুত মাংস তার! তুমি জান সেটা কী বিশ্রী রান্না করল সে। একেবারে অখাদ্য। সে সব কথা থাকগে। সে সব চুকেবুকে গেছে। কিন্তু তাদের বোনকে খুন করলেও তার ভাইদের উচিত হয়নি আমাকে অনাহারে মেরে ফেলা।

অনাহারে মেরে ফেলা! হায় মিষ্টার ভূত, অর্থাৎ, স্যার সাইমন, আপনার কি খিদে পেয়েছে? আমার ব্যাগে স্যানডউইচ রয়েছে। খাবেন?

না, ধন্যবাদ। আজকাল আমি আর কিছু খাই নে। তুমি যে বললে এতেই আমি খুশি। তোমাদের ওই বর্বর, অসৎ, ভয়ঙ্কর আর যাচ্ছেতাই রুচির পরিবারবর্গের তুলনায় তুমি অনেক ভালো।

ভার্জিনিয়া মেঝের উপর পা ঠুকে বলল–চুপ। আপনি নিজেই বর্বর, ভয়ঙ্কর আর যাচ্ছেতাই আর অসৎ হওয়ার কথা যদি বলেন তা হলে বলতে হয় আপনিই আমার রঙের বাক্স থেকে রঙ চুরি করে লাইব্রেরি ঘরে ওই রক্তের দাগ এঁকেছিলেন। আমরা তো হেস মরে যাই। প্রথমে আপনি নিলেন সিঁদুরসুদ্ধ সব লাল রঙা ফলে, সূর্যাস্তের ছবি আঁকা আমার বন্ধ হয়ে গেল। তারপরে আপনি চুরি করলেন আমার এমারেল্ড-গ্রীন আর ক্রোম ইয়োলো। শেষকালে পড়ে রইল কেবল ইনডিগো আর চাইনিস হোয়াইট। এখন আমি চাঁদনি রাতের ছবি ছাড়া আর কিছুই আঁকতে পারি নে। এই দৃশ্য কেবল যে মনটাকে ভারাক্রান্ত করে তোলে তাই নয়, আঁকাও বড়ো কষ্টকর। যদিও আমি খুবই বিরক্ত হয়েছিলেম তবু এবিষয়ে আপনাকে আমি কিছু বলিনি। তাছাড়া, সমস্ত ব্যাপারটাই বড়ো হাস্যকর করাণ, রক্তের রঙ এমারেল্ড-গ্রীন হবে একথা কেউ কোনো দিন শুনেছে?

ভূতটি শান্ত আর বিনয়ের সঙ্গেই বলল–তা বটে। কিন্তু আমার করারই বা কী ছিল? আজকাল সত্যিকার রঙ পাওয়া মুস্কিল। তাছাড়া, তোমার ভাই যখন ‘প্যারগান। ডিটারজেনট’-এর সাহায্য নিলে তখন তোমার রঙ চুরি করতেই বা আমার দোষটা

কোথায়? আর রঙের কথা যদি বল ওটা হচ্ছে রুচির কথা। ক্যানটারভিলেদের ধমনীতে নীল রক্ত বইছে–ইংলন্ডে সবচেয়ে গাঢ় নীলও বলতে পার; কিন্তু আমি ডালি তোমরা যারা আমেরিকান তাদের ওসব বালাই নেই।

আপনি কিছুই জানেন না। আপনার উচিত আমেরিকা গিয়ে নিজের মানসিক বৃত্তির উন্নতি করা। আমেরিকায় বিনা খরচে যদি যেতে চান তাহলে আমার বাবা আপনাকে খুশি হয়েই সাহায্য করতে পারেন। যদিও ওখানে সব রকম 'সিপরিটের' ওপরেই বেশ মোটা সুল্ক রয়েছে তবু কাস্টমস-এর হাত থেকে রেহাই পেতে খুব একটা অসুবিধে হবে না। কারণ, ওই বিভাগের অফিসাররা সবাই ডেমোক্র্যাট। একবার নিউ ইয়র্কে হাজির হলেই আপনি নিশ্চয় উন্নতি করবেন। আমি জানি সেখানে এমন অনেক লোক রয়েছে যারা পিতামহ সংগ্রহ করার জন্যে এক লক্ষ ডলার দিতে রাজি হবে; আর ঘরোয়া ভূত পেলে তো কথাই নেই।

-না। আমেরিকা আমার ভালো লাগবে না।

ভার্জিনিয়া ব্যঙ্গের সুরে বলল–মনে হচ্ছে আপনার কোনো ধ্বংসও নেই, কোনো কৌতূহলও নেই।

ধ্বংসও নেই! কৌতূহলও নেই! তোমাদের আছে নৌবিভাগ আর আচার!

আমি চললাম। বাবাকে দিয়ে বলি যমজ ভাইদের জন্যে যেন তিনি আরো এক সপ্তাহের ছুটির দরখাস্ত করেন।

ভূত চিৎকার করে উঠল-না, না। আমি নিঃসঙ্গ, বড়ো দুঃখ আমার। কী যে করি বুঝতে পারছি নে। আমি ঘুমোতে চাই; কিন্তু ঘুমোতে পারছি নে।

কী কথা যে বলেন! ঘুমোতে হলে স্রেফ বিছানায় শুয়ে বাতিটা নিবিয়ে দিন। মাঝে-মাঝে জেগে থাকাটা বড়ো কষ্টকর মনে হয়, বিশেষ করে গিড়ায। কিন্তু ঘুমোতে কোনো অসুবিধে নেই। এমন কি শিশুরাও ঘুমোতে জানে। তাদের যে বেশি বুদ্ধি রয়েছে সেকথা আপনিও স্বীকার করবেন না।

ভূত খুব দুঃখের সঙ্গে বলল–তিনশো বছর আমি ঘুমোইনি।

কথাটা শুনে ভার্জিনিয়ার সুন্দর চোখ দুটি অবার বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল।

ভূত বলে গেল–তিনশো বছর আমি ঘুমোইনি। আমি বড়ো ক্লান্ত।

ভার্জিনিয়া বলল–হতভাগ্য, হতভাগ্য ভূত! তোমার কি ঘুমানোর কোনো জায়গা নেই?

নীচু স্বপ্নালু স্বরে ভূত বলল–দূরে...দূরে পাইলবন ছাড়িয়ে ছোটো একটা বাগান রয়েছে। সেখানে লম্বা ঘাস ঘন হয়ে উন্মেছে। সাদা হেমলক ফুলের সমারোহ ভেগেছে সেখানে।

সারা রাত ধরে নাইটিংগেল পাখি সেখানে গান করে। সেখানে ঘুমন্ত আত্মার মাথার ওপর ইউ গাছগুলি তাদের বিরাট হাতগুলি দেয় ছড়িয়ে।

জলে ভার্জিনিয়ার চোখ দুটি ভিজে গেল; হাত দিয়ে মুখ ঢাকল সো আস্তে আস্তে সে। বলল–মৃত্যুর উদ্যানের কথা বলছ?

হ্যাঁ, মৃত্যু। মৃত্যু সত্যিই বড়ো মধুর। নরম তামাটে মাটির তলায় শুয়ে থাকা; মাথার ওপরে। ঘাসগুলি বীজন করবে কোন পেতে শুনবে স্তব্ধতার বাণী। ভূত-ভবিষ্যৎ বলে কিছু থাকবে না আর। সময়ের জ্ঞান যাবে হারিয়ে; জীবনকে ক্ষমা করা, নিজের মধ্যে শান্তিকে অনুভব করা। কী মধুর! তুমি আমাকে সাহায্য করতে পার? মৃত্যুর দ্বার আমার জন্যে তুমি খুলে দিতে পার। কারণ প্রেম তোমার সঙ্গী। আর মৃত্যুর চেয়ে প্রেমের ক্ষমতা অনেক বেশি।

কেমন যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে গেল ভার্জিনিয়া। মনে হল সে একটা ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখছে।

তারপরে আবার কথা বলল ভূত। বাতাসের দীর্ঘশ্বাসের মতো শোনাল তার স্বর: লাইব্রেরির জানালার ওপর পুরনো যে একটি ভবিষ্যৎবাণী লেখা রয়েছে তা কি তুমি পড়েছ?

মেয়েটি ওপর দিকে চোখ তুলে বলল–খুব পড়েছি। ভালো ভাবেই পড়েছি। অদ্ভুত কালো কালো অক্ষরে লেখা পড়া খুবই কষ্টকর। মাত্র দুটো লাইন লেখা রয়েছে। সোজা কথায়

বললে দাঁড়ায়-কোনো সোনালি মেয়েকে দেখে পাপীর মুখ থেকে যেদিন প্রার্থনার বাণী উচ্চারিত হবে, যেদিন বন্ধ্যা বাদাম গাছে ফুলের সমারোহ জাগবে, যেদিন কোনো শিশু তার চোখের জল ফেলবে সেই দিনই সারা বাড়িটা স্তব্ধ হয়ে যাবে। শান্তি নেমে আসবে ক্যানটারভাইলে। কিন্তু এর অর্থ যে কী তা আমি জানি নে।

সে দুঃখের সঙ্গে বলল–অর্থ হচ্ছে আমার পাপের জন্যে তোমাকে কাঁদতে হবে। কারণ, আমার চোখে কোনো জল নেই, আমার আত্মার জন্যে আমার সঙ্গে তোমাকে প্রার্থনা করতে হবে। কারণ, আমার কোনো বিশ্বাস নেই তারপর আমার সঙ্গে যদি তুমি মিষ্টি আর সদস। ব্যবহার করে থাক তাহলে মৃত্যুর দেবদূত আমাকে দয়া করবেন। অন্ধকারে তুমি ভয়াল ছায়াদের ঘুরে বেড়াতে দেখবে, অমঙ্গলের স্বর তোমার কানে কানে ফিস ফিস করে অনেক কিছু বলবে; কিন্তু তারা তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, কারণ নরকের শক্তি শিশুর পবিত্রতা নষ্ট করতে পারে না।

ভার্জিনিয়া কোনো উত্তর দিল না। তার দিকে তাকিয়ে গভীর নৈরাশ্যে ভূতটি তার নিজের হাত দুটো মোচড়াতে লাগল। হঠাৎ ভার্জিনিয়া বিবর্ণ মুখে উঠে দাঁড়াল। তার চেখের ভেতর থেকে একটা অদ্ভুত আলোর জ্যোতি বেরোতে লাগল। সে শক্ত হয়ে বলল–আমি ভয় পাই লে; তোমার ওপারে দয়া দেখাতে দেবদূতকে আমি বলব।

একটা ক্ষীণ আনন্দের ধ্বনি তুলে সে উঠে দাঁড়াল, তারপরে তার হাতটা ধরে পুরনো যুগের ভঙ্গিমায় চুমু খেল। তার আঙুলগুলি বরফের মতো ঠান্ডা; ঠোঁট দুটো আগুনের মতো গরম। ভার্জিনিয়া কাঁপল না সে তাকে হাত ধরে অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘর দিয়ে নিয়ে

গেল। বিবর্ণ দেওয়াল চিত্রের উপরে খুদে খুদে শিকারিদের চিত্র আঁকা রয়েছে। তারা তাদের শিঙা ফুকে তাকে সরে যাওয়ার ইঙ্গিত করল। ‘খুদে ভার্জিনিয়া চলে যাও, চলে যাও।’ কিন্তু ভূত তার হাত শক্ত করে ধরে রইল। সে বন্ধ করে রইল তার চোখ দুটো। ভীষণ ভীষণ জানোয়াররা লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তার দিকে। সাবধান, ছোটো ভার্জিনিয়া, সাবধান। আর হয়তো আমরা তোমাকে দেখতে পাব না।’ কিন্তু ভূতটি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল এবং ভার্জিনিয়া তাদের। কথায় কান দিল না। ঘরের শেষে গিয়ে সে থেমে কী যেন বলল। ভার্জিনিযা তা বুঝতে পারল না। চোখ খুলে সে দেখল ঘরের দেওয়ালটা কুয়াশার মতো মিলিয়ে যাচ্ছে। তার সামনেই বিরাট একটা গর্ত। কনকনে ঠান্ডা বাতাস বইছে। যেন তার পোশাক ধরে টানছে। ভূতটি বলল–তাড়াতাড়ি। তা না হলে বড়ো দেরি হয়ে যাবে।

মিনিট দশেক পরে চা খাওয়ার ঘন্টা পড়ল। ভার্জিনিয়া না আসায় মিসেস ওটিস তাকে ডেকে আনার জন্যে চাকর পাঠালেন। কিছুক্ষণ পরে চাকরটি ঘুরে এসে জানাল তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ডিনার টেবিলের জন্যে ভার্জিনিয়া প্রতিদিন বাগানে ফুল তুলতে যেত। সেইজন্যে মিসেস ওটিস প্রথমে বিশেষ ভয় পাননি। কিন্তু ছ’টা বাজার পরেও যখন ভাডিনিযা এল না তখনই তিনি বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। উদ্বিগ্ন হয়েই ছেলেদের পাঠিয়ে দিলেন তার খোঁড়ে; আর মিঃ ওটিস-এর সঙ্গে নিজে প্রতিটি ঘর তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগলেন। সাড়ে ছ’টা নাগাদ ছেলেরা ফিরে এসে ডানাল তাকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। তাঁরা সকলেই উত্তেজিত হয়ে উঠলেন এবং সেই বিশেষ ক্ষেত্রে কী করা উচিত সে সম্বনে কেউ কিছু ঠিক করতে পারলেন না। ঠিক এই সময় হঠাৎ মিঃ ওটিসের মনে পড়ল যে দিন কয়েক। আগে একদল জিপসিকে তাঁর পার্কে

তাঁবু ফেলতে অনুমতি দিয়েছিলেন। সেইজন্যেই বড়ো ছেলে আর দুটি চাকরকে নিয়ে তিনি 'ব্ল্যাকফেল হলো'র দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। জানতেন জিপসিরা ওখানেই তখন রয়েছে। বাচ্চা ডিউক তো মরিয়া হয়ে বলল সেও সঙ্গে যাবে। কিন্তু মারামারি বাধতে পারে এই ভয়ে মিঃ ওটিস রাজি হলেন না। সেইখানে উপস্থিত হয়ে তিনি দেখলেন জিপসিরা চলে গিয়েছে–আর চলে গিয়েছে হঠাৎ ওয়াশিংটন আর দুটি চাকরকে চারপাশ খুঁড়তে বলে তিনি তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এসে দেশের সর্বত্র পুলিশকে টেলিগ্রাম করে দিলেন এই বলে যে জিপসিরা একটা বাচ্চা মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে। তারপরে তিনি ঘোড়া থামাতে বলে স্ত্রী আর তিনটি ছেলেদের ডিনারে বসতে বললেন। তারপরে একটা চাকরকে সঙ্গে নিয়ে তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে ছিলেন অ্যাসকট রোড-এর দিকে। মাত্র দু'মাইলও তিনি যাননি এমন সময় তাঁর মনে হল কে যেন ঘোড়ায় চেপে তাঁর। পেছনে-পেছনে আসছে। ঘুরে চেয়ে দেখলেন টাটুতে চেপে ডিউক দৌড়ে আসচ্ছে। হাঁপাতে হাঁপাতে এসে ছেলেটি বলল–আমি অত্যন্ত দুঃখিত, মিঃ ওটিস; কিন্তু ভার্জিনিয়াকে না খুঁজে পাওয়া পর্যন্ত আমি খেতে পারলাম না। আমার ওপরে দমা করে রাগ করবেন না। গত বছর আমাদের বিয়েথে আপনি যদি রাজি হতেন তাহলে এসব ঝামেলা বাধত না। আপনি আমাকে ফিরিয়ে দেবেন না তো? আমি যেতে পারি নে। আমি যাব না।

মন্ত্রী সেই সুন্দর সব-সময় বিপদাপন্ন যুবকটির দিকে চেয়ে না হেসে পারলেন না। ভার্জিনিয়ার ওপরে তার এই আকর্ষণ দেখে মুগ্ধও হলেন একটু। সেই জন্যে ঘোড়া থেকে একটু ঝুঁকে পড়ে বললেন–ঠিক আছে সিসিলা ফিরে যেতে না চাইলে নিশ্চয় তুমি আমার সঙ্গে আসবে। কিন্তু অ্যাসকট-এ গিয়ে তোমার জন্যে একটা টুপি কিনে দেব চল।

এই বলেই দুজনে ঘোড়ায় চড়ে রেল স্টেশনের দিকে ছুটলেন। সেখানে স্টেশন মাস্টারকে ডিজ্ঞাসা করলেন ভার্জিনিয়ার চেহারার কাউকে স্টেশনে দেখা গিয়েছে কি না। কিন্তু সেখানে তার কোনো সংবাদ পাওয়া গেল না। স্টেশন মাস্টার অবশ্য চারপাশে তার পাঠিয়ে দিয়ে জানালেন যে চারপাশে তাকে খুঁজে বার করার জন্যে তীক্ষ্ণ প্রহরী রাখা হবে। এই শুনে ডিউকের জন্যে একটা টুপি কিলে মিঃ ওটিস বেকসলের দিকে ছুটলেন। জায়গাটা ওখান। থেকে মাইল চারেক দূরে একটা গ্রাম। তিনি শুনেছিলেন ডাযগাটার পাশেই বিরাট একটা মাঠ থাকায় জিপসিরা সাধারণত ওইখানে ডেরা পাততে ভালোবাসে। সেখানে গিয়ে তাঁরা গ্রাম্য চৌকিদারকে ডেকে তুললেন; কিন্তু ভার্জিনিয়ার কোনো সংবাদ সে দিতে পারল না। কোথাও কোনো সংবাদ না পেয়ে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে তাঁরা বাড়িতে ফিরে এলেন। লণ্ঠন নিয়ে গেটের কাছে ওয়াশিংটন আর দুটি যমজ ভাই তাঁদের জন্যে অপেক্ষা করছিল। ভার্জিনিয়ার কোথাও কোনো সংবাদ নেই। আবার অন্বেষণ শুরু হল; কিন্তু সব চেষ্টাই ব্যর্থ হল তাঁদের। সপষ্টই বোঝা গেল অন্তত সেই রাত্রির মতো ভার্জিনিয়াকে তাঁরা হারিয়ে ফেলেছেন। খুব দুঃখের সঙ্গে ঘোড়া দুটিকে সহিমের হাতে তুলে দিয়ে মিঃ ওটিস ছেলেদের নিয়ে পায়ে হেঁটে ঘরের ভেতরে ঢুকলেন। ঘরে এসে সবাই দেখলেন চাকররা সব ভয়ে জড়সড় হয়ে বসে রয়েছে। মিসেস ওটিস একটা সোফার ওপরে শুয়ে রয়েছেন। উদ্বেগে তিনি অস্থির হয়ে উঠেছেন। ওকটি পরিচারিকা তাঁর কপালে ও-ডি-কোলন-কোলন দিচ্ছে। মিঃ ওটিস মুখে কিছু দেওয়ার জন্যে তাঁকে বারবার অনুরোধ করে আর সকলের জন্যে ডিনার তৈরি করতে নির্দেশদিলেন। খুবই দুঃখের সঙ্গেই আহারপর্ব সমাধা হল তাঁদের। খাওয়ার সময় কেউ কোনো কথা বলল না। খাওয়ার শেষ হওয়ার পরে সকলের অনুরোধ উপেক্ষা করেই সবাইকে তিনি ঘুমাতে যাওয়ার হুকুম দিলেন। যে হেতু তাঁদের দিক থেকে করণীয় কিছু

নেই সেই হেতু তিনি ঠিক করলেন একজন ডিটেকটিভকে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্যে। পরের দিন সকালেই তিনি স্কটল্যানড ইয়ার্ডে টেলিফোন করবেন। ডাইনিং রুম থেকে বেরিয়ে আসার সময়ে গম্বুজের ঘড়িতে বারোটা। বাজার শব্দ হল; আর বারোটার শেষ ঘন্টাটি পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে হাঠৎ যেন কিছু একটা ভেঙে পড়ে যাওয়ার শব্দ এল; সেই সঙ্গে শোনা গেল অকস্মাৎ তীব্র একটা আর্তনাদ। ভয়ঙ্কর বজ্রপাতে কেঁপে উঠল বাড়ি, অপার্থিব সঙ্গীতের একটা সুর ছড়িয়ে পড়ল বাতাসে, বিকট শব্দে সিড়িঁর মাথার ওপরে একটা কাঠের তক্তা ভেঙে পড়ল; আর তারই ভেতর থেকে বেরিয়ে এল বিবর্ণ মুখে ভার্জিনিয়া। তার হাতে একটা ছোটো বাক্স। মুহূর্তের মধ্যে সবাই তার দিকে ছুটে গেলেন। মিসে ওটিস দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেন তাকে, ডিউক তাকে চুম্বনে চুম্বনে অস্থির করে তুলল; আর সকলকে ঘিরে যমজ ভাই দুটি উন্মাদের মতো নাচতে শুরু করল।

সকলের সঙ্গে ভার্জিনিয়া এতক্ষণ রসিকতা করছিল এই মনে করে মিঃ ওটিস রাগ করে বললেন–হা ঈশ্বর! এতইড্রণ তুমি কোথায় ছিলে? আমরা তোমার খোঁজে সারা দেশটা ঘুরে বেডালমা তোমার মা তো ভয়ে আধমরা হয়ে গিয়েছেন। আর কোলোদনি এইরকম বাস্তব ঠাট্টা তুমি করবে না বলে দিচ্ছি।

নাচতে-নাচতে যমজ ভাই দুটি বলল–অবশ্য এক ভূতের ওপরে ছাড়া।

ভার্জিনিয়া শান্তভাবে বলল–বাবা, আমি ভূতটির কাছেই এতক্ষণ ছিলাম। সে মারা গিয়েছে। তোমরা তাকে দেখবে চলা সে সত্যিই বড়ো পাপ করে ছিল। তার জন্যে সে অনুতপ্ত হয়েছে। মারা যাওয়ার আগে সে আমাকে এই সব মণিমুক্তো দিয়ে গিয়েছে।

তার সেই গম্ভীর থমথমে ভাব দেখে সবাই তার দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। ঘুরে দাঁড়িয়ে সে তাঁদের ভাঙা দেওয়ালের ভেতর দিয়ে সরু একটা গোপন বারান্দায় নিয়ে এল। বাতি জ্বালিয়ে ওয়াশিংটন তাঁদের পিছু পিছু চলতে লাগল। অবশেষে তাঁরা একটি ওক কাঠের বিরাট দরজার সামনে উপস্থিত হলেন। সেই দরজার গায়ে মরচে-পড়া পেরেক গাঁথা রয়েছে। ভার্জিনিয়া তার গায়ে হাত দিতেই সেটা হাট হয়ে খুলে গেল। তাঁরা একটা চোরা কুঠরির মধ্যে হাজির হলেন। এর ছাদ নীচু। একটা মাত্র ভারি দেওয়া ছোটো ঘনালা সেই ঘরে রয়েছে দেওয়ালের সঙ্গে গাঁথা রয়েছে বিরাট একটা লোহার বালা। তার সঙ্গে শেকল দিয়ে বাঁধা একটা শীর্ণ কঙ্কাল। মেঝের ওপরে লম্বা হয়ে শুয়ে রয়েছে কঙ্কালটি। তার কাছ থেকে একটু দূরে নাগালের বাইরে একটা পুরনো খাবারের পাত্র আর কলসি বসানো। দেখে মনে হল কঙ্কালটি তার শীর্ণ হাত দিয়ে সেই দুটি পাত্রকে ধরার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছে। ওই কলসিতে সম্ভবত একদিন জল ছিল। সেই জলের সবুজ দাগ এখনো তার ভেতরে লেগে ছিল। ভার্জিনিয়া সেই কঙ্কালের সামনে হাঁটু মুড়ে বসে হাত দুটি জড়ো করে নিঃশব্দে প্রার্থনা করল। বাকি সবাই সেই করুণ ঘটনাটির দিকে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলেন। এই ঘটনাটি তখনো পর্যন্ত অনাবিষ্কৃতই ছিল।

ওই কুঠরিটা বাড়ির কোন অংশে তা জানার জন্যে যমজ ভাই দুটি এতক্ষণ জানালা দিয়ে। বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল। তাদের মধ্যে একজন হঠাৎ চিৎকার করে উঠল– দেখ, দেখ ওই শুকনো বাদাম গাছে ফুল ফুটেছে। এখান থেকে আমি তা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি।

দাঁড়িয়ে উঠল ভার্জিনিযা। তার মুখের ওপরে ছড়িয়ে পড়ল একটি স্বর্গীয় দ্যুতি। সে বলল–ঈশ্বর ওঁকে ক্ষমা করেছেন।

ডিউক চেঁচিয়ে বলল–তুমি একজন দেবকুমারী ভার্জিনিয়া।

এই বলে ভার্জিনিয়াকে জড়িয়ে ধরে সে তাকে চুমু খেল।

এই অদ্ভুত ঘটনার চারদিন পরে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন হল। শবযাত্রা শুরু হল ক্যানটারভিলে চেস থেকে রাত্রি প্রায় এগারোটার সময়। আটটি কালো ঘোড়া শবাধারটিকে টেনে নিয়ে গেলা ঘোড়ার মাথায় ছিল উটপাখির পালকের নিশান। সীসের কফিনের ওপরে ঢাকা ছিল লাল কাপড়ের একটা আবরণ; তার ওপরে আঁকা ছিল ক্যানটারভিলে কোর্ট-অফ-আর্মস। শবাধারবাহী গাড়ির আশেপাশে মশাল জ্বালিয়ে চলছিল। চাকর-বাকরদের দল। সমস্ত শোভাযাত্রাটিই বেশ জাঁকজমকপূর্ণ ছিল। প্রধান শোককর্তা। ছিলেন লর্ড ক্যানটারভিলে। ওযেলস থেকে বিশেষ করে এই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ। করতেই তিনি এসেছিলেন। ভার্জিনিয়ার সঙ্গে তিনি বলেছিলেন প্রথম গাড়িটিতে। তারপরে ছিলেন সস্ত্রীক যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রী, তারপরে ওয়াশিংটন তিনটি ছেলে তারপরে। সকলের শেষে ছিলেন মিসেস উমনে। তাঁর জীবনের পঞ্চাশটি বছর ভূতটি তাঁকে বিব্রত করেছিল বলেই তিনি যে তার শেষকৃত্যটা দেখবেন এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে। গির্জার এক কোণে বৃদ্ধ একটি ইউ গাছের তলায় গভীর গর্ত খোঁড়া হল। রেভা, আগস্টাস ডামপির বেশ গম্ভীর। পরিবেশের মধ্যে প্রার্থনার পদগুলি পড়লেন। অনুষ্ঠান

শেষ হলে ক্যানটারভিলে বংশের প্রথা অনুযায়ী চাকররা তাদের মশালগুলি নিবিয়ে দিল। কফিনটাকে মাটির তলায় নামানোর সময় ভার্জিনিয়া এগিয়ে গিয়ে সাদা আর ফিকে রঙের বাদামের ফুল দিয়ে তৈরি করা বড়ো একটা ক্রুশ তার ওপরে রাখলে মেঘ কেটে গিয়ে আকাশে চাঁদ উঠল আর সেই ছোটো গির্জার কবরখানাতে ছড়িয়ে দিল রুপোর আলো। দূর থেকে গান করতে লাগল একটি নাইটিংগেল পাখি।

পরের দিন সকালে লর্ড ক্যানটারভিলে শহরে ফিরে যাওয়ার আগে ভূতটি ভার্জিনিয়াকে যে মুক্তোর বাক্সটি দিয়েছে সে সম্বন্ধে মিঃ ওটিস তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে বসলেন। মুক্তোর। গ্যগুলি ষোড়শ শতাব্দীর; মূল্য আর শিল্পকলার দিক থেকে সেগুলি অনবদ্য। তাই সেগুলি গ্রহণ করতে মিঃ ওটিসের বিবেকে লাগছিল। তিনি বললেন–মি লর্ড, এদেশে দানপত্রের সঙ্গে ডামি আর ছোটোখাটো অলঙ্কার দেওয়ার প্রথা রয়েছে। আর এটা আমার কাছে খুবই পরিষ্কার যে ওই সব অলঙ্কারগুলিই নীতিগতভাবে উত্তরাধিকারসূত্রে আপনারই বংশের প্রাপ্য। সেই জন্যে বিশেষ একটি অজ্ঞাত পরিস্থিতিতে আবিষ্কৃত ওই রত্নগুলি সঙ্গে নিয়ে লন্ডনে যেতে আপনাকে আমি অনুরোধ করছি। আমার মেয়ের কথা যদি বলেন তাহলে বলব ও হচ্ছে বাচ্চা। তাছাড়া, ওই রকম অলঙ্কার নিয়ে, অলস বিলাসিতায় জীবন কাটাতেও সে অভ্যস্ত বা উৎসুক নয়। মিসেস ওটিসের আর্টের বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রয়েছে। কারণ বাল্য বযসে কয়েকটি শীত তিনি বেস্টলে কাটিয়েছিলেন। তিনি আমাকে বলেছেন যে ওই । অলঙ্কারগুলি বিক্রি করলে অনেক দাম পাওয়া যাবে। এই সব কারণে লর্ড ক্যানটারভিলে, আপনি বেশ বুঝতে পারছেন ওইগুলি আমার পরিবারে কেন রাখতে আমি রাজি হচ্ছি নে। আর সত্যি কথা বলতে কি এই সব মূল্যবান জমকালো অলঙ্কার ব্রিটিশ অভিজাত সম্প্রদায়ের কাছে

যতই গৌরবজনক বলে মনে হোক না কেন আমাদের মতো যারা। রিপাবলিকানের সাধারণ আর অমর নীতিতে মানুষ হয়ে উঠেছে তাদের কাছে ওদের কোনো দাম নেই। অবশ্য একথাটা আমি উল্লেখ করতে চাই যে আপনার হতভাগ্য আর বিপতগামী। পূর্বপুরুষের স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে ওই বাক্সটি নিজের কাছে রাখতে পারলে ভার্জিনিয়া খুশি হবে বাক্সটা অতি পুরাতন আর সেই সঙ্গে সংস্কারের বাইরে চলে গিয়েছে বলেই আমার ধারণা। আমার অনুরোধ রাখাটা আপনার কাছে কষ্টকর হবে না। আমার কথা যদি বলেন তাহলে একথা বলতে আমি বাধ্য যে আমার কোনো সন্তানের মধ্যযুগীয় কোনো জিনিসের ওপরে যে। আকর্ষণ রয়েছে তা জানতে পেরে আমি সত্যিই বিস্মিত হয়েছি। এর একমাত্র কারণ সম্ভবত এই যে মিসেস ওটিস এথেন্স থেকে ফেরার পথে লন্ডনের একটি শহরতলিতে দিন কতক যখন অবস্থান করছিলেন সেই সময়েই ওর জন্ম হয়েছিল।

এই সম্মানিত মন্ত্রীর কথাগুলি বেশ গম্ভীরভাবেই মুচকি-মুচকি হাসতে-হাসতে লর্ড ক্যানটারভিলে শুনছিলেন। মন্ত্রী মহোদয়ের কথা শেষ হওয়ার পরে তিনি বেশ হৃদ্যতার সঙ্গে তাঁর করমর্দন করে বললেন–প্রিয় স্যার, আপনার সুন্দরী কন্যা আমার হতভাগ্য পূর্বপুরুষ স্যার সাইমনের যথেষ্ট উপকার করেছে। সেদিক থেকে তার এই সাহসের জন্যে আমি এবং আমার বংশের সকলেই তার কাছে কৃতজ্ঞ। ওই অলঙ্কারগুলি ন্যায়ত তারই প্রাপ্য। তাছাড়া, হৃদযহীলের মতো ওই অলঙ্কারগুলি আমি যদি তার কাছ থেকে নিয়ে চলে যাই তাহলে আমায় বিশ্বাস সেই দুষ্ট বৃদ্ধটি এক পক্ষের মধ্যেই তার কবরখানা থেকে উঠে আমার। একেবারে প্রাণান্ত করে ছেড়ে দেবো উত্তরাধিকারের কথা যদি বলেন তাহলে বলতে পারি যে উইল-এ যা লেখা নেই তা কখনো উত্তরাধিকারীর

প্রাপ্য নয়। ওই বত্নগুলির অস্তিত্ব আমরা কেউ জানতাম না। সেদিক থেকে বিচার করলে ওই রত্নগুলির ওপরে আমার যদি কোনো অধিকার থাকে, তাহলে আপনার হেড বাবুটিরও সেই একই অধিকার রয়েছে। তাছাড়া, মিঃ ওটিস আপনি হয়তো ভুলে যাচ্ছেন যে সভূত বাড়িটাকেই আপনি কিনেছিলেন; সুতরাং ভূতের যদি কোনো সম্পত্তি থেকে থাকে সে-সম্পত্তিও আপনারই। কারণ স্যার সাইমন রাত্রিতে বারান্দার ওপরে ঘুরে বেড়ালেও, আইনের দিক থেকে তিনি মৃত, এবং দাম দিয়েই আপনি তাঁর সম্পত্তি কেনে নিয়েছিলেন।

লর্ড ক্যানটারভাইলের এবম্বিধ প্রত্যাখ্যানে মিঃ ওটিস খুবই মর্মাহত হলেন, তাঁর মতটা পুনর্বিবেচনা করার জন্যে অনুরোধও আর একবার তাঁকে করলেন, কিন্তু সৎ-বুদ্ধিসম্পন্ন লর্ড তাঁর মতে অবিচল হয়ে রইলেন। ভূতের সম্পত্তি রেখে দেওয়া ছাড়া মিঃ ওটিসের আর কোনো উপায় রইল না।

১৮৯০ সালের বসন্তকালে যখন চেশায়ারের যুবতী ডাচেসের বিবাহ উপলক্ষে তাকে রানির প্রথম ড্রয়িংরুমে নিয়ে যাওয়া হল তখন সবাই তার অলঙ্কারগুলি দেখে একেবারে ধন্য-ধন্য করে উঠল। ভার্জিনিয়া আর যুবক ডিউকের বিয়েতে সবাই আনন্দিত হল; কারণ এমন রাজযোটক মিল নাকি সহজে কারও চোখে পড়ে না। খুশি হলেন না কেবল ডাম্বলটনের মারশনেস। ভদ্রমহিলার সাতটি অবিবাহিতা কন্যা ছিল। তাদের একটিকে ডিউকের ঘাড়ে চাপানোর জন্যে তিন তিন বার বেশ মোটা খরচ করে ডিনার পার্টি দিয়েছিলেন আর সবচেয়ে আশ্চর্যের ঘটনা হচ্ছে সেই পার্টিতে মিঃ ওটিসকেও তিনি নিমন্ত্রণ করেছিলেন। মিঃ ওটিস ডিউককে খুবই পছন্দ করতেন; কিন্তু নীতিগতভাবে

তার ওই খেতাবটি তাঁর কাছে ছিল বড়োই অবান্তর। কিন্তু আপত্তি শেষ পর্যন্ত তাঁর ধোপে টেকেনি। আমার মনে হয় বর আর বধূ হাত ধরাধরি করে যখন সেন্ট জর্জ গির্জার বেদির কাছে ঘুরছিল তখন ইংলন্ডের মধ্যে মিঃ ওটিসের মতো গর্বিত মানুষ আর কেউ ছিল না।

বিবাহ বাসর উদযাপন করে ডিউক আর ডাচেস ক্যানটারভিলে চেস-এ যেদিন ফিরে এল তার পরের দিন বিকেলের দিকে তারা হাঁটতে হাঁটতে পাইনবনে ঘেরা নির্জন সমাধির কাছে হাজির হল। স্যার সাইমনের সমাধি ফলকটি খুঁজে বার করতে তাদের কষ্ট হয়েছিল যথেষ্ট। ডাচেস সঙ্গে নিয়ে এসেছিল কয়েকটি সুন্দর গোলাপ। সেইগুলি সে সমাধির ওপরে ছড়িয়ে দিল। কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে তারা ধ্বংসপ্রায় সমাধিগুলির চারপাশে ঘুরে বেড়াতে লাগল। সেইখানে একটি ভাঙা স্তম্ভের ধারে ডাচেস বসে পড়ল, সিগারেট খেতে-খেতে ডিউক তার পায়ের কাছে বসে তার সুন্দর চোখ দুটির দিকে রইল তাকিয়ে। ডিউক হঠাৎ তার সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে ডাচেসের হাতটা ধরে বলল–ভার্জিনিয়া, কোনো স্ত্রীর তার স্বামীর কাছ থেকে কিছু লুকিয়ে রাখা উচিত নয়।

প্রিয় সিসিল, আমি তো কিছু লুকিয়ে রাখিনি।

ডিউক হেসে বলল–রেখেছ। ভূতের সঙ্গে ঘরের মধ্যে থাকার সময় তোমার কী কথা হয়েছিল সেকথা তো বলনি।

ভার্জিনিয়া গম্ভীরভাবে বলল–সেকথা আমি কাউকে বলিনি।

আমি তা জানি; কিন্তু আমাকে বলতে পার।

দয়া করে আমাকে তা বলতে বলো না, সিসিল। আমি তা বলতে পারব না। হতভাগ্য স্যার সাইমন! তাঁর কাছে আমি সত্যিই বড়ো ঋণী। হেসো না, সত্যিই বলছি ঋণী। তাঁর কাছ থেকেই আমি বুঝতে পেরেছি জীবন কী জিনিস, মৃত্যু বলতে কী বোঝায়; আর প্রেম ওদের চেয়ে কেন মহত্তর।

ডিউক উঠে তার স্ত্রীকে চুমু খেল।

তোমার ওই হৃদয়টা যতক্ষণ আমার থাকবে ততক্ষণ ওই কথাটা তুমি গোপন করেই রেখ।

আমার হৃদয় চিরকাল তোমারই থাকবে, সিসিল।

আমাদের সন্তানদের সেই কথাটা একদিন তুমি বলবে–বলবে না?

লজ্জায় ভার্জিনিয়ার মুখটা লাল হয়ে উঠল।

দেবকুমার

The Star-Child

একদিন দুজন দরিদ্র কাঠুরিয়া বিরাট একটা পাইন বনের ভিতর দিয়ে হাঁটছিল। শীতকাল। ঠান্ডা কনকনে রাত। মাটির ওপরে গাছের পাতায় বেশ পুরু পুরু বরফ জমেছে। তাদের পথের দু'পাশে ঘন বরফের চাঁই মটমট করে পল্লবগুলিকে ভেঙে দিচ্ছে। হাঁটতে-হাঁটতে যখন তারা পাহাড়ি ঝর্নার কাছে এল তখন ঝর্নাটা নির্জীব হয়ে বাতাসে ঝুলছে; কারণ, বরফ-রাজ তাকে চুমু খেয়েছে। এত ঠান্ডা যে কী করবে তা তারা ভেবে পেল না।

দুটো পায়ের ভেতরে ন্যাজটা ঢুকিয়ে দিয়ে বনের মধ্যে খোঁড়াতে-খোঁড়াতে নেকড়ে বাঘ ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে বলল–উঃ! আবহাওয়া বটে একখানা! সরকার এ-সম্বন্ধে কোনো ব্যবস্থা করে না কেন?

সবুজ রঙের লিনেট পাখিরা গানের সুরে বলে-হুইট! হুইট! হুইট! পুরনো পৃথিবীটা মরে গিয়েছে। সাদা চাদরে তার মৃতদেহটাকে ওরা দিয়েছে ঢেকে।

টার্টল ডাভেরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল–পৃথিবীর আজ বিয়ে হবে; তাই সে সাদা পোশাক পরেছে। তাদের লাল টুকটুকে পাগুলি তুষারে ক্ষতবিক্ষত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তারা মনে করেছিল এই অবস্থায় তাদের কিছু রোমান্টিক হওয়া উচিত।

দাঁত খিচোল নেকড়ে বাঘ–মূর্খ কোথাকার! আমি বলছি এই উৎপাতের জন্যে আমাদের সরকারই দায়ী। আমার কথা যদি তোরা বিশ্বাস না করিস তাহলে আমি তোদের খেয়ে ফেলব। নেকড়ের বাস্তব বুদ্ধিটা অত্যন্ত প্রখর ছিল; কোনো একটা যুৎসই যুক্তি খাড়া করতে সে পিছপা হত না।

কাঠঠোকরা পাখি দার্শনিক হয়েই জন্মেছে। সে বলল আমার কথা যদি ধর তাহলে আমি ওসব অ্যাটমিক থিয়োরিতে বিশ্বাসী নই। আসল কথাটা হল কোনো জিনিস যদি কোনো একরকম হয় তাহলে সেটা সেই রকমই হবে এবং বর্তমানে সত্যিই বড়ো ঠান্ডা পড়েছে।

সত্যিই প্রচণ্ড ঠান্ডা। লম্বা ফার গাছের কোটরে বসে বাচ্চা কাঠবিড়ালিরা নিজেদের গরম রাখার জন্যে পরস্পরের নাক ঘষে দিচ্ছিল। খরগোসেরা নিজেদের গর্তের মধ্যে গুঁড়ি দিয়ে শুয়ে রইল; বাইরে তাকাতে ভরসা পেল না। সেই শীতের রাত্রিতে একমাত্র যাদের বেশ আনন্দ হল তারা হচ্ছে শিংওয়ালা ওই পেঁচারা। তারা তাদের বড়ো-বড়ো হলদে চোখ পাকাতে-পাকাতে বনের একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত আনন্দে ডাকাডাকি শুরু করল–টুইট! টু-টুইট! কী চমৎকার আবহাওয়া!

আমাদের সেই দুটি কাঠুরে চলছে তো চলছেই। মাঝে মাঝে আঙুল ঝেড়ে তারা বরফ সরাচ্ছে, আর বিরাটাকার লোহার জুতো ঠুকে বরফের চাঁই ভাঙছে। একবার তারা বরফের খাদে পড়ে গেল; যখন ওপরে উঠল তখন তারা একেবারে সাদা হয়ে গিয়েছে একবার তারা জমাট-বাঁধা জলায় পড়ে গেল। জ্বালানি কাঠগুলি ছিটকে পড়ল তাদের

কাঁধ থেকে। আবার সেগুলি কুড়িয়ে বেশ ভালো করে কাঁধে বাঁধতে হল তাদের। একবার তারা পথ হারিয়ে ভীষণ ভয় পেয়ে গেল; কারণ তারা জানত বরফের মধ্যে যারা ঘুমিয়ে পড়ে তাদের ওপরে বরফ বড়ো নির্দয় ব্যবহার করে। কিন্তু পথিকদের দেবতা সেন্ট মার্টিনের ওপরে বিশ্বাস রেখে ঠিক রাস্তায় ফিরে এল তারা। অবশেষে তারা বনের সীমান্তে এসে হাজির হল। দূরে দেখতে পেল তাদের গ্রামে বাতি জ্বলছে। অরণ্যের বিভীষিকা থেকে মুক্তি পেয়ে তারা এতই খুশি হয়ে উঠল যে তারা জোরে-জোরে হাসতে লাগল। তাদের কাছে মনে হলে পৃথিবীটা রূপালি ফুলের মতো; আর চাঁদটি হচ্ছে যেন সোনাল ফুল।

কিন্তু হাসি বন্ধ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে নিজেদের দারিদ্র্যের কথা স্মরণ করে তারা বেশ মুষড়ে পড়ল। একজন বলল–আমরা আনন্দ করলাম কেন? জীবনটা তো হচ্ছে ধনীদের জন্যে, আমাদের মতো গরিবদের জন্যে নয়। এর চেয়ে বরং ওই বনের মধ্যে ঠান্ডায় মরে যাওয়াই আমাদের পক্ষে ভালো ছিল অথবা কোনো বন্য জন্তু যদি আমাদের খেয়ে ফেলত তাহলেও আমরা কোনো দুঃখ করতাম না।

তার সঙ্গীটি বলল–ঠিকই বলেছ। কাউকে-কাউকে অনেক জিনিস ঈশ্বর দেন; আবার কাউকে কাউকে ঈশ্বর কিছুই দেন না। অন্যায়টাই পৃথিবীতে রমরমিয়ে বেড়াচ্ছে। দুঃখ ছাড়া সমান ভাগে ভাগ করে নেওয়ার-ও কিছু নেই এ জগতে।

তারা দুজনেই যখন এইভাবে বিলাপ করছিল ঠিক সেই সময় ব্যাপারটা ঘটল। আকাশ থেকে একটা উজ্জ্বল আর সুন্দর নক্ষত্র পৃথিবীর বুকে নেমে এল। তারা অবাক হয়ে

দেখল তাদের কাছ থেকে অনতিদূরে একঝাঁক উইলো গাছের পেছলে সেই দ্যুতিময় নক্ষত্রটা পড়ে গেল।

তারা চিৎকার করে উঠল–ওখানে একটা সোনার তাল পড়েছে। আমাদের মধ্যে যে দেখতে পাবে ওটা হবে তারই।

এই বলেই তারা ছুটতে শুরু করল। সোনার লোভ তাদের এত!

তাদের মধ্যে একজন দৌড়ে তার সঙ্গীকে টপকে উইলো গাছগুলির ওপাশে হাজির হল; সত্যিই তো সাদা বরফের ওপরে একটা সোনার জিনিস পড়ে রয়েছে। এই দেখেই সে জিনিসটার দিকে দৌড়ে গিয়ে তার ওপরে হাত রাখল। সেটা সোনালি আলখাল্লায় মোড়া; সেই আলখাল্লার ওপরে তারকা চিহ্ন রয়েছে অনেগুলি। জিনিসটা সেই আলখাল্লা দিয়ে বেশ ভালো করে জড়ানো এই দেখেই সে তার সঙ্গীকে চিৎকার করে ডাকল। সঙ্গীটি এলে তারা দুজনে পাটের পর পাট খুলতে লাগল। তারা ঠিক করেছিল ভেতরে যদি কিছু সোনা-দানা থাকে তাই তারা ভাগ করে নেবে। কিন্তু হায়রে কপাল! সেই ভাঁজ খুলে তারা না পেল কোনো সোনা, না পেল কোনো রুপো; এমন কি মূল্যবান কোলো ধাতুও দেখতে পেল না তারা। যা দেখল তা হছে একটা ছোট্ট শিশু। শিশুটা ঘুমোচ্ছে।

এই দেখে একজন আর একজনকে বলল–কী তিক্তভাবেই না আমাদের আশার পরিসমাপ্তি হল! কিছুই লাভ হল না আমাদের। কারণ, মানুষের কাছে শিশুর দাম কী?

একে এখানেই ফেলে রেখে যাই চল। আমরা গরিব লোক। আমাদের ছেলেও কম নেই, তাদের খাবার থেকে কিছুটা কেটে একে খাওয়াতে আমরা পারব না।

কিন্তু তার সঙ্গীটি বলল–উহু। শিশুটিকে এইভাবে মৃত্যুর মুখে ফেলে যাওয়াটা খারাপ হবে। যদিও তোমার মতোই আমিও গরিব, ছেলেমেয়েদের খাইয়ে যদিও আমার কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না, তবুও একে আমি বাড়িতে নিয়ে যাই। আমার স্ত্রী একে দেখবে।

এই বলে পরম যত্নে শিশুটি সে কোলে তুলে নিল, ঠান্ডার হাত থেকে তার নরম দেহটাকে বাঁচানোর জন্যে সেই আলখাল্লাটা দিয়ে বেশ ভালো করে তাকে জড়াল, তারপরে তার বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। তার এই মূর্খতা আর নরম হৃদয় দেখে তার সঙ্গীটি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল তার দিকে।

তার স্ত্রী দরজা খুলে দিল। স্বামী নিরাপদে ফিরে এসেছে দেখে দু'হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরে সে চুমু খেল, তার কাঁধ থেকে খুলে নিল জ্বালানি কাঠ, জুতো থেকে সরিয়ে দিল বরফের কুচি, তারপরে ভেতরে আসতে বলল তাকে।

কিন্তু সে তার স্ত্রীকে বলল–বন থেকে আমি একটা জিনিস কুড়িয়ে এনেছি। আমার ইচ্ছে তুমি এর যত্ন নেবে।

তার স্ত্রী আনন্দে বলে উঠল-কী এনেছ–দেখি, দেখি! ঘরে আমাদের অনেক কিছু জিনিসের অভাব রয়েছে।

এই কথা শুনে সে আলখাল্লাটা সরিয়ে ঘুমন্ত শিশুটিকে দেখাল।

স্ত্রী তো রেগে গরগর করে উঠল-এ কী করেছ তুমি! শিশু! আমাদের নিজেদের ছেলেমেয়েই কি কম যে আর একজনকে তাদের খাবারের ভাগ দিতে হবে! তাছাড়া, কে জানে ও আমাদের দুর্ভাগ্য ডেকে আনবে কি না। আর ওকে মানুষই বা আমরা করব কী করে?

সে বলল–কোনো দুর্ভাগ্য আনবে না; কারণ ও একটি দেবকুমার।

এই বলে সে সেই অদ্ভুত কাহিনিটি তার কাছে বর্ণনা করল।

কিন্তু স্ত্রীকে খুশি করা গেল না। সে ব্যঙ্গ করে বলতে লাগল আমাদের ছেলেমেয়েদেরই খাবার নেই, আবার পরের ছেলে এনেছে! এ-বিশ্বে আমাদের জন্যে ভাবনা করে কে? কে আমাদের খাবার দেয়?

সে বলল–চড়াই পাখিদের কথাও ঈশ্বর ভাবেন, তাদেরও খেতে দেন তিনি।

কিন্তু শীতকালে খেতে না পেয়ে সেই চড়াইরাও কি মারা যায় না? আর এখন কি সেই শীতকাল নয়?

লোকটি কোনো উত্তর দিল না; চৌকাঠ থেকে ভেতরেও ঢুকল না। বাইরে থেকে ঠান্ডা কনকনে বাতাস এসে তার স্ত্রীকে কাঁপিয়ে দিতে লাগল। কাঁপতে কাঁপতে তার স্ত্রী বলল–তুমি কি দরজাটা বন্ধ করবে না? বাইরে থেকে ঠান্ডা হাওয়া আসছে। আমি জমে গেলাম যে।

সে জিজ্ঞাসা করল–যে বাড়িতে কঠিনহৃদয় মানুষ বাস করে সেখানে সব সময় কি ঠান্ডা কনকনে বাতাসে বয় না?

কোনো উত্তর না দিয়ে তার স্ত্রী আগুনের ধারে এগিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে সে ঘুরে দাঁড়িয়ে তার দিকে চাইল। তার চোখ দুটি তখন জলে ভরে উঠেছে। এই দেখে সে চট করে ভেতরে ঢুকে এসে শিশুটিকে তার কোলে দিয়ে দিল। সে শিশুটিকে চুমু খেয়ে তার সবচেয়ে বাচ্চা ছেলেটির পাশে শুইয়ে দিল। পরের দিন সকালে কাঠুরে সোনার তৈরি সেই অদ্ভুত পোশাকটিকে তাদের বড়ো সিন্দুকটার ভেতরে রেখে দিল। শিশুটির গলায় হলদে রঙের যে হারটা ছিল তার স্ত্রী সেটাও খুলে নিয়ে সেই সিন্দুকটার মধ্যে ঢুকিয়ে রাখল।

এইভাবে কাঠুরের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সেই দেবকুমারটি বাড়তে লাগল, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার সৌন্দর্যও বাড়তে লাগল। গাঁয়ের সবাই তার সেই সুন্দর চেহারার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকত। কিন্তু সেই সৌন্দর্যই তার কাল হল। কারণ সে খুব গর্বিত, নিষ্ঠুর আর সেই সঙ্গে স্বার্থপর হয়ে উঠল। কাঠুরের আর অন্যান্যদের ছেলেমেয়েদের সে ঘৃণা করতে লাগল। তার নিজের জন্ম হয়েছে নক্ষত্রলোক থেকে আর তারা সবাই

অশিক্ষিত বংশের এই কথা বলে তাদের ওপর সে প্রভুত্ব বিস্তার করল–তাদের দেখতে লাগল চাকর-বাকরের মতো। যারা দরিদ্র, অন্ধ অথবা বিকলাঙ্গ তাদের ওপরে তার কোনো মমতা ছিল না। তাদের দেখলেই সে ঢিল মেরে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিত। ফলে, এক ডাকাত ছাড়া আর কেউ তাদের গ্রামে আসতে সাহস করত না। নিজের সৌন্দর্যে সে এতই মুগ্ধ হয়ে পড়েছিল যে পাদরির পাতকুয়ার ধারে গিয়ে জলের ভেতরে সারাদিনই প্রায় সে নিজের মুখ দেখত, আর তারিফ করত নিজের সুন্দর মুখমণ্ডলকে।

কাঠুরে আর তার স্ত্রী এই জন্যে তাকে প্রায়ই তিরস্কার করে বলত–দুঃস্থদের সঙ্গে তুমি যেরকম ব্যবহার কর, আমরা তো তোমার সঙ্গে সেরকম ব্যবহার করি নে। যারা করুণার পাত্র তাদের সঙ্গে তুমি অমন নিষ্ঠুর ব্যবহার কর কেন?

পাদরি তাকে প্রায়ই ডেকে এনে বলতেল-মাছিও তোমার ভাই, তাদের তুমি কোনো ক্ষতি করো না। বনের পাখিদেরও স্বাধীনতা রয়েছে। স্ফূর্তির জন্যে তুমি তাদের জাল পেতে ধরো না। কানা, খোঁড়া, ছুঁচো–সবাইকেই ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন। এই বিশ্বে তাদেরও একটা জায়গা রয়েছে। ঈশ্বরের পৃথিবীতে এই অনাচার করার তোমার অধিকার কী রয়েছে? এমন কি মাঠের গবাদি পশুরাও ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন করে।

কিন্তু কোনো উপদেশই তার কানে ঢুকল না। নিজেকে সে এতটুকুও শোধরাল না। সে আগের মতোই সকলের ওপরে প্রভুত্ব করতে লাগল। সে যখন ছুঁচোর চোখে কাঠি ঢুকিয়ে দিত, অথবা কুষ্ঠরোগীকে ঢিল ছুঁড়ে মারত, তখন তারাও হাসত। এইভাবে গ্রামের ছেলেরাও তার মতো নির্দয় হয়ে উঠল।

একদিন গ্রামের পথ দিয়ে একটি ভিক্ষুক-রমণী যাচ্ছিল। তার পোশাক ছিঁড়ে গিয়েছিল, রাস্তা দিয়ে হাঁটার ফলে পা দিয়ে তার রক্ত পড়ছিল। তার অবস্থাটা সত্যিই বড়ো খারাপ দেখাচ্ছিল। ক্লান্ত হয়ে একটি বাদাম গাছের তলায় বসে সে বিশ্রাম করছিল।

তাকে দেখে সেই দেবকুমার তার সঙ্গীদের বলল–ওই সুন্দর গাছের তলায় একটা নোংরা কদর্য চেহারার ভিখিরি বসে রয়েছে দেখ। এস, ওকে আমরা তাড়িয়ে দিই।

এই বলে দলবল নিয়ে সে সেই মেয়েটির দিকে পাথর ছুঁড়তে শুরু করল; বিদ্রূপ করতে লাগল তাকে। মেয়েটি সরে গেল না; একটা ভয়ার্ত বিমূঢ় দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল। কাঠুরে পাশেই কাঠ চিরছিল। এই দেখে সে দৌড়ে এসে তাকে বকতে লাগল-কী নিষ্ঠুর তুমি? দয়ামায়ার বাষ্পও তোমার মধ্যে নেই। এই মেয়েটি তো তোমার কোনো ক্ষতি করেনি।

এই শুনে দেবকুমার রেগে মাটিতে পা ঠুকে বলল–আমার কাজের কৈফিয়ৎ চাওয়ার কী অধিকার তোমার রয়েছে শুনি? আমি তোমার ছেলে নই যে তোমার হুকুম মানব।

কাঠুরে বলল–সেকথা সত্যি। কিন্তু তোমাকে যখন বনের মধ্যে পড়ে থাকতে দেখেছিলাম তখন তোমাকে আমিই দয়া করেছিলাম।

সেই মেয়েটি এই কথা শুনেই চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে মূর্ছিত হয়ে পড়ল। কাঠুরে তাকে নিজের ঘরে বয়ে নিয়ে গিয়ে সেবাযত্ন করল। মূর্ছা ভাঙার পরে সে উঠে বসল; তখন মাংস, দুধ আর খাবার দিয়ে কাঠুরে আর তার স্ত্রী তার সেবা-যত্ন করল।

কিন্তু সে কিছুই খেল না; কাঠুরেকে জিজ্ঞাসা করল–তুমি বলছিলে না যে শিশুটিকে তুমি বনের মধ্যে কুড়িয়ে পেয়েছ? আর সেটা কি আজ থেকে বছর দশেক আগে নয়?

কাঠুরেটি উত্তর দিল-হ্যাঁ। বনের মধ্যেই ওকে আমি কুড়িয়ে পেরেছিলাম। আর সেও প্রায় দশ বছর আগেই।

মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে বলল–ওর দেহে কী কী চিহ্ন ছিল? ওর গলায় কি হলদে রঙের একটা হার ছিল না? ওর গায়ে কি সোনা দিয়ে মোড়া আর তারকা চিহ্ন দিয়ে খচিত একটা আলখাল্লা ছিল না?

হ্যাঁ, হ্যাঁ। ঠিক-ঠিক। যা বললে ঠিক তাই।

এই বলে সে সিন্দুক থেকে বার করে এনে সেগুলি তাকে দেখাল।

সেইগুলি দেখে মেয়েটি আনন্দে কাঁদতে লাগল। বলল, ওই আমার সেই শিশু। ওকেই আমি বনের মধ্যে হারিয়ে ফেলেছিলাম। তোমাকে অনুরোধ করছি ওকে এখনই ডেকে পাঠাও। ওরই জন্যে আজ আমি সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াচ্ছি।

সুতরাং কাঠুরে আর তার স্ত্রী সেই দেবকুমারকে ডেকে নিয়ে এসে বলল–ঘরে যাও। সেখানে তোমার মা বসে রয়েছেন দেখতে পাবে।

এই কথা শুনে আনন্দে নাচতে-নাচতে দেবকুমার ঘরে দৌড়ে এসে তাকে দেখল; তারপরে ঘৃণার সঙ্গে হাসতে-হাসতে বলল–কই, কোথায় আমার মা? কারণ, এখানে তো সেই নোংরা ভিখিরি মেয়েটা ছাড়া আর কাউকে দেখতে পাচ্ছি না।

ভিখিরি মেয়েটি বলল–আমিই তোমার মা।

দেবকুমার রেগে চিৎকার করে উঠল-তুমি উন্মাদ। তাই একথা বলছ। তোমার মতো নোংরা ভিখিরির ছেলে আমি নই। বেরিয়ে যাও। তোমার মুখ আমি দেখতে চাই নে।

না-না। তুমি আমার ছেলে। তোমাকে নিয়ে আমি বনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলাম। ডাকাতরা তোমাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ওইখানে ফেলে রেখে গিয়েছিল। কিন্তু তোমাকে দেখেই আমি চিনতে পেরেছি। তোমার গায়ে যে সব চিহ্ন ছিল সেগুলিও আমি চিনেছি। অনুরোধ করছি, তুমি আমার সঙ্গে এস। চল পুত্র; তোমার স্নেহের ভিখারি আমি।

কিন্তু দেবকুমারকে নড়ানো গেল না। তার মায়ের কান্নাও তার মনে কোনো করুণার উদ্রেক করতে পারল না। ভিখারিণী যন্ত্রণায় কেবল কাঁদতে লাগল।

শেষকালে সে কথা বলল; বেশ রুক্ষ আর তিক্ত তার স্বর–যদি সত্যিই তুমি আমার মা হও তাহলে তোমার উচিত ছিল আমার কাছ থেকে দূরে সরে থাকা। এভাবে আমার জীবনে কলঙ্কের ছাপ দিতে আসা উচিত ছিল না তোমার। ভেবেছিলাম আমি কোনো দেবদূত–তোমার কাছে এখন যা শুনছি–কোনো ভিখারিণীর ছেলে আমি। সুতরাং তুমি এখান থেকে দূর হয়ে যাও। তোমার মুখ আমি দেখতে চাই নে।

ভিখারিণী কেঁদে বলল–হায় পুত্র, চলে যাওয়ার আগে তুমি কি আমাকে একটা চুমুও খাবে না?

সে বলল–না, তুমি দেখতে বড়ো কুচ্ছিত। তোমাকে চুমু খাওয়ার চেয়ে আমি বরং সাপকে চুমু খাব, চুমু খাব পথের ধুলোকে।

সুতরাং ভিখারীণী কাঁদতে কাঁদতে বনের দিকে চলে গেল। সে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে দেখে দেবকুমার খুব খুশি হয়ে তার সঙ্গীদের কাছে খেলতে ছুটে গেল।

কিন্তু তারা তাকে বিদ্রূপ করে বলল–তুমি কটকটে ব্যাঙের মতো বিশ্রী দেখতে; সাপের মতো ঘৃণ্য। এখানে থেকে দূর হয়ে যাও। আমরা তোমার সঙ্গে খেলব না।

এই কথা শুনে দেবকুমার ভ্রু কুঁচকে নিজের মনে বলল–এরা বলে কী? আমি পাতকুয়ার কাছে গিয়ে জলের দিকে তাকাব; পাতকূয়ার জলই বলে দেবে আমি কত সুন্দর।

এই পাতকুয়ার কাছে গিয়ে সে জলের দিকে তাকাল। হায়, হায়! তার মুখ হয়েছে কটকটে ব্যাঙের মুখের মতো; তার গায়ে গড়িয়েছে সাপের গায়ের মতো আঁশ। এই দেখেই ঘাসের ওপরে লম্বা হয়ে শুয়ে কাঁদতে-কাঁদতে সে বলল–নিশ্চয়ই এটা আমার পাপের ফল। অস্বীকার করে আমি আমার মাকে তাড়িয়ে দিয়েছি! আমি দাম্ভিত; মায়ের ওপরে আমি নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছি। যতদিন না আমি মাকে খুঁজে পাই ততদিন সারা বিশ্ব আমি ঘুরে বেড়াব, বিশ্রাম নেব না এতটুকু।

কাঠুরের বাচ্চা মেয়েটি তার কাছে এসে কাঁধে হাত দিয়ে বলল–তুমি কেঁদ না, আমাদের কাছে তুমি থাক; আমি তোমাকে ঠাট্টা করব না।

ছেলেটি ঘাড় নেড়ে বলল–না। মায়ের ওপরে আমি দুর্ব্যবহার করেছি। তাই তাঁকে খোঁজার জন্যে আমি সারা বিশ্ব ঘুরে বেড়াব। কোথাও থামব না।

এই কথা বলেই তার মাকে ডাকতে ডাকতে সে বনের দিকে দৌড়ে গেল। কিন্তু কেউ তার ডাকে সাড়া দিল না। সারা দিন ধরেই সে চেঁচাতে লাগল। তারপরে রাত্রি নেমে এলে সে শুকনো পাতা বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। কিন্তু পশু-পাখিরাও তার কাছ থেকে পালিয়ে গেল। কারণ তার নিষ্ঠুরতার কথা তারাও জানত। তার সঙ্গী হয়ে রইল কেবল কটকটে ব্যাঙ আর সাপের দল।

সকাল হল। গাছ থেকে কিছু তেতো ফল তুলে সে চিবোল তারপরে ভীষণ কাঁদতে কাঁদতে সে আবার বিরাট বনের ভেতর দিয়ে ছুটতে শুরু করল।

একটা ছুঁচোকে সে জিজ্ঞাসা করল–তুমি তো মাটির নীচে যেতে পার। আমার মা সেখানে আছে কি না বলতে পার?

ছুঁচো বলল–তুমি আমার চোখ দুটোকে অন্ধ করে দিয়েছ। আমি জানব কেমন করে?

লিনেট পাখিকে সে জিজ্ঞাসা করল–তুমি লম্বা গাছের ওপর দিয়ে উড়ে গোটা পৃথিবীকে দেখতে পাও। আমার মাকে তুমি দেখেছ?

লিনেট বলল–আমার ডানা দুটো কেটে তুমি আনন্দ করেছ। আমি উড়বো কেমন করে?

ফার গাছের কোটরে নিঃসঙ্গভাবে যে বাচ্চা কাঠবিড়ালি থাকত তাকে সে জিজ্ঞাসা করল–আমার মা কোথায়?

কাঠবিড়ালি উত্তর দিল-আমার মাকে তুমি মেরে ফেলেছ। তোমার মাকেও কি মারতে চাও?

এই কথা শুনে লজ্জায় মাথা নীচু করে দেবকুমার কাঁদতে লাগল; ঈশ্বরের সৃষ্ট প্রাণীদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করল; তারপরে সেই ভিখারিণীকে খুঁজে বার করার জন্যে বনের

মধ্যে দিয়ে চলতে লাগল। তৃতীয় দিনের বনের শেষ প্রান্তে সে এসে পৌঁছল; তারপরে নেমে গেল সমতলভূমিতে। গাঁয়ের ভেতর দিয়ে চলার সময় ছেলেমেয়েরা তাকে বিদ্রূপ করতে লাগল–তার দিকে ঢিল ছুঁড়তে লাগল। কেউ তাকে মাঠে-ঘাটে রাত্রে শুতে দিল না। এমন কুৎসিত তার চেহারা হয়েছিল যে কেউ তার ওপরে একটু করুণাও দেখাল না। তিনটি বছর এইভাবে সে তার ভিখারিণী মায়ের সন্ধানে ঘুরে বেড়াল। কোথাও তাকে খুঁজে পেল না। মাঝে-মাঝে তার মনে হত তার মা সামনে এগিয়ে চলেছে। এই দেখে সে তার পিছু পিছু দৌড়ে যেত; কিন্তু পথের ওপরে শক্ত পাথর লেগে তার পা যেত ছিড়ে। কিন্তু সে তাকে ধরতে পারত না। পাশাপাশি যারা থাকত তারা অবশ্য স্বীকার করত যে ওই রকম একটি ভিখারিণীকে তারা দেখেছে কিন্তু কোথায় সেই ভিখারিণী? দুঃখে ভেঙে পড়ত সে।

একদিন একটি নদীর ধারে এক শহরের ফটকের কাছে এসে সে দাঁড়াল। শহরের চারপাশটা শক্ত দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। ক্লান্ত আর পায়ে ঘা হওয়া সত্ত্বেও সে শহরের ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করল। কিন্তু পাহারাদার সৈন্যরা তাদের তরোয়াল উঁচিয়ে রুক্ষ স্বরে জিজ্ঞাসা করল–শহরে তোমার কী দরকার?

সে বলল–আমার মাকে খুঁজছি। সে সম্ভবত এইখানে আছে। দয়া করে আমাকে ঢুকতে দিন।

কিন্তু তারা তাকে বিদ্রূপ করল। একজন তার কালো দাড়ি নেড়ে বলল–সত্যি কথা বলতে কি যা তোমার চেহারা না–কটকটে ব্যাঙ আর সাপও তোমাকে দেখে ভিরমি যাবে। ভাগো-ভাগো। তোমার মা এখানে নেই।

আর একজন জিজ্ঞাসা করল–তোমার মা কে?

সে বলল–আমারই মতো একজন ভিক্ষুক। আমি তার সঙ্গে বড়োই দুর্ব্যবহার করেছি। দয়া করে আমাকে ভেতরে যেতে দাও। তার কাছ থেকে ক্ষমা চাইতে হবে আমাকে।

তারা তো তাকে যেতে দিলই না, অধিকন্তু তাদের বর্শা দিয়ে তাকে খোঁচা দিল।

সে কাঁদতে কাঁদতে চলে যাচ্ছিল এমন সময় বর্ম-পরা একটি বীরপুরুষ তাদের সামনে এসে হাজির হল। তার বর্মের ওপরে সোনার ফুল বসানো, আর শিরস্ত্রাণের ওপরে আঁকা শায়িত সিংহের একটি ছবি। সে এসে তাদের জিজ্ঞাসা করল–কে ভেতরে যেতে চাইছিল?

তারা বলল–ও একটা ভিখিরি। ওকে আমরা তাড়িয়ে দিয়েছি।

সে হেসে বলল–উহু। ওকে আমরা এক ভাঁড় মিষ্টি মদের দামে ক্রীতদাস হিসেবে বেচে দেব।

একটা কুৎসিত বীভৎস চেহারার লোক সেই সময় ওই পথ দিয়ে যাচ্ছিল। এই কথা শুনে ঘুরে দাঁড়িয়ে সে বলল—ওই দামে আমি ছেলেটাকে কিনব। এই বলে মদের দাম দিয়ে তাকে সে কিনে হাত ধরে শহরের ভেতরে ঢুকে গেল। শহরের অনেক রাস্তা পেরিয়ে তারা একটা ছোটো দরজার কাছে এসে থামল। একটা দেওয়ালের গায়ে দরজাটা বসানো ছিল। দেওয়ালটাকে ঢাকা দিয়ে রেখেছিল একটা ডালিম গাছ। বুড়ো লোকটা দরজা খুলল। তারপরে দুজনে ব্রাশের তৈরি পাঁচটা সিড়িঁ পেরিয়ে একটা বাগানে এসে হাজির হল। আফিং গাছে আর পোড়া মাটির সবুজ জার-এ বোঝাই ছিল বাগানটা। সেই বুড়োটা তার পাগড়ির ভেতর থেকে একটা সিল্কের রুমাল বার করে তার চোখ দুটো বেঁধে দিল; তারপরে, তার চোখ দুটো বেঁধে তাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে চলল। রুমালটা সরিয়ে নেওয়ার পরে সে দেখল একটা গুহার মতো ভাযায় সে এসে পড়েছে। সেখানে শিঙের একটা লন্ঠন জ্বলছে।

তখন বুড়ো লোকটা একটি পাত্রে ছাতাপড়া একটুকরো রুটি তার সামনে ধরে বলল—খাও; আর একটা কাপে কালো একটু জল দিয়ে বলল—পান কর। খাওয়া শেষ হওয়ার পরে বুড়ো লোকটা তাকে লোহার চেন দিয়ে বাঁধল; তারপরে দরজায় তালা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

ওই বুড়োটা ছিল লিবিয়ার একটু চতুরতম যাদুকর। যার কাছ থেকে সে যাদুবিদ্যা শিখেছিল সেই লোকটা থাকত নীল নদের ধারে একটা কবরখানার ভেতরে। পরের দিন সকালে সেই যাদুকর এল, মুখ বাঁকিয়ে বলল—এই শহরের ফটকের কাছাকাছি একটা বন রয়েছে সেই বনে তিল তাল সোনা রয়েছে। একটা সাদা, একটা হলদে, আর একটা

লাল। আজ তুমি সেই সাদা সোনার তালটা নিয়ে আসবে। আনতে না পারলে, তোমাকে একশোবার চাবুক মারা হবে। তাড়াতাড়ি যাও। সন্ধের সময় এইখানে তোমার জন্যে আমি অপেক্ষা করব।

এই বলে তার চোখে সেই সিল্কের রুমালটা বেঁধে ঘর পেরিয়ে বাগানের ভেতর দিয়ে দরজার বাইরে নিয়ে এসে চোখ খুলে দিয়ে বলল–যাও।

সেই দেবকুমার শহরের ফটকের কাছে এল, তারপরে যাদুকর যে-বনটার কথা তাকে বলেছিল সেই বনের মধ্যে গিয়ে ঢুকল।

বাইরে থেকে দেখতে বনটি বড়ো সুন্দর ছিল। কত পাখি গান করছিল সেখালে, কত সুগন্ধী ফুলের সমারোহ জেগেছিল চারপাশে। কিন্তু এত সৌন্দর্যও কোনো কাজে এল না তার। কারণ যে-পথ দিয়েই সে হাঁটতে লাগল সেই পথেই রাশি রাশি কাঁটা গাছ তাকে ক্ষতবিক্ষত করতে লাগল। তাছাড়া সেই সোনার তালটারও কোনো হদিস পেল না সে। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত ঘুরে-ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। সন্ধেবেলা ভীষণ কাঁদতে কাঁদতে সে বাড়ির দিকে ফিরল। সেদিন তার কপালে কী আছে তা সে জানত।

যখন সে বনের ধারে এসে পৌঁছেছে এমন সময় পেছনে ঝোপের ভেতর থেকে কে যেন যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল। নিজের দুঃখ ভুলে গিয়ে সে দৌড়ে গেল সেইদিকে, দেখল একটা খরগোস ব্যাধের জালে আটকা পড়ে চিৎকার করছে।

www.bengaliebook.com

তার দয়া হল খরগোসটার উপরে। সে তাকে জাল থেকে মুক্ত করে বলল–আমি একজন ক্রীতদাস ছাড়া আর কিছু নই। তবু তোমাকে আমি মুক্ত করে দিলাম।

তখন খরগোস বলল–সেকথা নিশ্চয় সত্যি। প্রতিদানে তোমাকে আমি কী দেব?

দেবকুমার বলল–আমি একটা সাদা সোনার তাল খুঁজছি। কিন্তু কোথাও পাচ্ছি নে। ওটা নিয়ে না গেলে আমার মনিব আমাকে খুব মারবে।

খরগোস বলল–আমার সঙ্গে এস। আমি তোমাকে সেখানে নিয়ে যাচ্ছি। সেটা কোথায় আর কী উদ্দেশ্যে রয়েছে তা আমি জানি।

সুতরাং দেবকুমার খরগোসের সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গেল। সত্যিই তো! বিরাট একটা ওক গাছের কোটরে সাদা সোনার একটা ছোটো তাল রয়েছে। সেইটাকে সে খুঁজতে এসেছিল। আনন্দে আত্মহারা সেই সোনার তালটাকে নিয়ে সে খরগোশকে বলল–তোমার যে উপকার আমি করেছি তার অনেক অনেক বেশি উপকার তুমি আমার করলে। যে দয়া তোমাকে আমি দেখিয়েছি, তুমি তার শতগুণ বেশি দয়া আমাকে দেখালে।

খরগোস বলল–উঁহু! তুমি আমার সঙ্গে যে রকম ব্যবহার করেছ আমিও তোমার সঙ্গে ঠিক সেই রকম ব্যবহার করেছি।–এই বলে সে দৌড়ে পালিয়ে গেল। দেবকুমারও এগিয়ে গেল শহরের দিকে।

শহরের ফটকের কাছে একটা কুষ্ঠরোগী বসেছিল। ধূসর রঙের একটুকরো কাপড়ের ফালি দিয়ে তার মাথাটা ঢাকা ছিল। সেই কাপড়ের ফুটো দিয়ে তার চোখ দুটো জ্বলছিল জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো। তাকে আসতে দেখে সেই লোকটা কাঠের পাত্রের ওপরে শব্দ করে বলল–আমাকে কিছু অর্থ দাও। না খেয়ে আমি মারা যাচ্ছি। ওরা আমাকে শহরের বাইরে বার করে দিয়েছে। এমন কেউ নেই যে আমাকে একটু দয়া করে।

দেবকুমার বলল–হায়, হায়! আমার কাছে একটুকরো সোনা রয়েছে বটে, কিন্তু সেটা যদি আমার মনিবের কাছে নিয়ে না যাই তাহলে সে আমাকে খুব মারবে; কারণ, আমি তার ক্রীতদাস।

কিন্তু কুষ্ঠরোগীরটা তাকে সেটা দেওয়ার জন্যে বড়োই অনুরোধ করতে লাগল। শেষকালে সে তার সেই সোনার টুকরোটা না দিয়ে পারল না।

যাদুকর তাকে দেখে জিজ্ঞাসা করল–তুমি সেই সাদা সোনার তালটা নিয়ে এসেছ?

দেবকুমার বলল–না।

এই শুনে ঘাদুকর তাকে বেদম প্রহার করতে লাগল। তারপরে একটা শূন্য খাবার থালা আর শূন্য কাপ তার সামনে রেখে বলল–খাও।

পরের দিন সকালে সেই যাদুকর এসে বলল–আজ যদি তুমি সেই হলদে সোনার টুকরোটা না আনতে পার তাহলে তোমাকে আমি চিরকাল আমার চাকর করে রাখব; আর চাবুক খাবে তিনশটি।

দেবকুমার আবার সেই বনে ফিরে গেল; সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত হলদে সোনার খোঁজে বৃথাই সে খুঁজে বেড়াল। সূর্যাস্তের সময় একটা পাথরের ওপরে বসে সে যখন কাঁদছে এমন সময় সেই বাচ্চা খরগোসটা তার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল–কাঁদছ কেন? কী হয়েছে তোমার?

সে বলল–আমি খুঁজছি হলদে সোলার তাল। এইখানেই কোথাও সেটা লুকালো রয়েছে। সেটা নিয়ে না গেলে আমার মনিব আমাকে খুব মারবে। আমি তার কেনা চাকর কি না।

খরগোস বলল–আমার সঙ্গে এস। এই বলে দৌড়তে-দৌড়তে সে একটা জলাশয়ের ধারে এসে পৌঁছল। সেই জলাশয়ের তলায় হলদে সোনার তালটা ছিল।

দেবকুমার বলল–তোমাকে আমি কী বলে ধন্যবাদ দেব বুঝতে পারছি নে। এই দ্বিতীয়বার তুমি আমাকে বাঁচালে।

খরগোস বলল–ও কথা বলো না। তুমিই তো আমাকে প্রথম দয়া করেছিলো-এই বলে সে ছুটে পালিয়ে গেল।

ফটকের কাছে আবার সেই কুষ্ঠরোগীটার সঙ্গে দেখা। তাকে দেখেই সে দৌড়ে তার কাছে এগিয়ে এসে কাতর স্বরে ভিক্ষে চাইল। তার অনুরোধ এড়াতে না পেরে দেবকুমার তাকে সেই হলদে সোনার টুকরোটা দিয়ে শূন্য হাতে বাড়ি ফিরে এল।

শূন্য হাতে ফিরে এসেছে দেখে যাদুকর তাকে বিষম প্রহার করল, তারপরে শেকল দিয়ে তাকে বেশ ভালো করে বেঁধে সেই গর্তের মধ্যে ফেলে রেখে চলে গেল।

পরের দিন যাদুকর আবার এল; বলল–আজ যদি তুমি সেই লাল সোনার তালটা নিয়ে আস তাহলে তোমাকে আমি মুক্তি দেব; যদি না আন, তাহলে তোমাকে নির্ঘাৎ খুন করে ফেলব।

আবার সে সেই বনের মধ্যে গেল। আবার সারাদিন বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াল। আবার সন্ধের সময় একটা পাথরের ওপরে বসে কাঁদতে লাগল। তারপরে এল সেই বাচ্চা খরগোস। সব শুনে সে বলল–তোমার পেছনে যে গুহা রয়েছে তারই মধ্যে তো সেটা রয়েছে।

লাল সোনার তালটা নিয়ে সে বলল–বারবার তিনবার আমাকে তুমি বাঁচালে।

খরগোস বলল–উহু! তুমি আমাকে প্রথমে বাঁচিয়েছিলে যে!–এই বলেই সে ছুটে পালিয়ে গেল।

আবার সেই কুষ্ঠরোগী তার রাস্তার ওপরে গিয়ে দাঁড়াল, বলল–আমাকে ওটা দাও না হলে আমি খিদেয় মারা যাব।

দেবকুমার বলল–তোমার প্রয়োজন আমার চেয়ে বেশি। সুতরাং তুমিই এটা নাও।

সোনাটুকু সে দিয়ে দিল বটে, কিন্তু তার মনটা বড়ো খারাপ হয়ে গেল। তার কপালে যে কী রয়েছে তা সে জানত।

কিন্তু কী আশ্চর্য! শহরের ফটকের পাশ দিয়ে সে যখন এগিয়ে যেতে লাগল তখন সেপাই-সান্ত্রীর দল মাথা নীচু করে তাকে সম্মান জানাল, চেঁচিয়ে বলল–আমাদের প্রভু কী সুন্দর দেখতে! শহরবাসীরা তার পিছু-পিছু হাঁটতে-হাঁটতে বলতে লাগল–সত্যিই এত সুন্দর মানুষ পৃথিবীতে আর নেই।

দেবকুমার কাঁদতে কাঁদতে ভাবল-নিশ্চয় ওরা আমার ঠাট্টা করছে। তাকে দেখার জন্যে এত লোকের ভিড় হল যে সে পথ হারিয়ে রাজপ্রাসাদের সামনে এসে হাজির হল। রাজপ্রাসাদের রক্ষীরা দরজা খুলে দিল। পুরোহিত আর উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা দৌড়ে এলেন তার দেখা করার জন্যে, বললেন–আপনিই আমাদের প্রভু। আপনার জন্যেই আমরা অপেক্ষা করে রয়েছি। আপনিই আমাদের রাজার কুমার।

দেবকুমার বলল–আমি কোনো রাজার কুমার নই। আমি হচ্ছি ভিখারিণীর ছেলে। আমি দেখতে কুৎসিত। আপনারা আমাকে সুন্দর বলছেন কেন?

এই শুনে সেই লোকটা যার বর্মের ওপরে সোনার ফুল আঁকা ছিল, আর শিরস্ত্রাণের উপরে ছিল শায়িত সিংহের ছবি--তার ঢালটাকে দেবকুমারের মুখের সামনে তুলে ধরে বলল–প্রভু যে সুন্দর নন সেকথা কেমন করে তিনি বললেন?

দেবকুমার সেই ঢালের মধ্যে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখে অবাক হয়ে গেল; সত্যিই তো! তার সৌন্দর্য ফিরে এসেছে, ফিরে এসেছে তার লাবণ্য আর সুষমা।

রাজপুরুষেরা বলল–পুরাকালের ভবিষ্যৎবাণী হচ্ছে আজকের দিনে আমাদের রাজা ফিরে আসবেন। তিনিই আমাদের দেশ শাসন করবেন। অতএব আপনি এই রাজদণ্ড আর মুকুট গ্রহণ করুন। ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে শাসন করুন আমাদের দেশ।

কিন্তু সে তাদের বলল–না, না। আমি এসবের যোগ্য নই। যে মা আমাকে গর্ভে ধারণ করেছেন আমি তাঁকে অস্বীকার করেছি। যতদিন না তাঁকে আমি খুঁজে পাচ্ছি, যতদিন না তিনি আমাকে ক্ষমা করছেন ততদিন পর্যন্ত আমার বিশ্রাম নেই। সুতরাং আমাকে যেতে দিন। ওই রাজদণ্ড আর মুকুট দিলেও আমি এখানে থাকতে পারব না।

এই কথা বলে সে রাস্তার দিকে ঘুরে দাঁড়াল। এই রাস্তাটাই সোজা শহর-ফটকের দিকে এগিয়ে গিয়েছে। কিন্তু কী আশ্চর্য! সেই রাস্তা দিয়ে সেই ভিখারিণীটি তার দিকে এগিয়ে এলেন; আর তাঁরই পাশে সেই কুষ্ঠরোগী।

আনন্দে আত্মহারা হয়ে চিৎকার করতে-করতে সে দৌড়ে গেল তাঁর কাছে; মায়ের ক্ষতকে চুম্বন করে চোখের জলে ভিজিয়ে দিল তাঁর পা দুটি। ধুলোর মধ্যে মাথাটা রেখে বলল–মা, দম্ভে একদিন তোমাকে আমি অগ্রাহ্য করেছিলাম। সে-দম্ভ আজ আমার নেই। এখন আমাকে তুমি ক্ষমা কর।

সেই ভিখারিণী কোনো উত্তর দিল না।

সে তখন সেই কুষ্ঠরোগীর সাদা পা দুটো দু' হাতে জড়িয়ে ধরে বলল–তিনবার তোমাকে আমি দয়া করেছি। আমার সঙ্গে কথা বলতে তুমি নির্দেশ দাও মাকে।

কিন্তু কুষ্ঠরোগীটি একটিও কথাও বলল না।

আবার সে কাঁদতে লাগল–মা, এ দুঃখ আমি আর সহ্য করতে পারছি না। আমাকে ক্ষমা কর। আবার আমি বনে ফিরে যাই।

এবার সেই ভিখারিণীটি তার মাথার ওপর হাত রেখে বললেন—ওঠ।

সেই কুষ্ঠরোগীটিও তার মাথার ওপরে হাত রেখে বললেন—ওঠ।

সে উঠল। কিন্তু কী আশ্চর্য! তাঁরাই হচ্ছেন রাজা এবং রানি। রানি বললেন–ইনিই তোমার পিতা। এঁকেই তুমি সাহায্য করেছিলে।

রাজা বললেন–ইনিই তোমার মা। এঁরই পা দুটি তুমি চোখের জলে ভিজিয়ে দিয়েছিলে।

তাঁরা তাকে কাছে টেনে নিয়ে চুমু খেলেন। রাজপ্রাসাদের ভেতরে নিয়ে গিয়ে রাজপোশাক পরালেন। হাতে দিলেন রাজদণ্ড; মাথায় দিলেন রাজমুকুট। ন্যায়পরায়ণতা আর সততার সঙ্গে রাজত্ব করতে লাগল সে। সেই দুষ্ট যাদুকরকে নির্বাসিত করল। সেই কাঠুরে, তার স্ত্রী আর তাদের ছেলেমেয়েদের উপঢৌকন পাঠাল প্রচুর। পশু-পাখি-মানুষ কারও ওপরে যাতে কেউ নির্দয় ব্যবহার করতে না পারে সেদিকে সজাগ রইল। দেশের মধ্যে সুখ-শান্তি আর ঐশ্বর্য উথলে পড়ল।

কিন্তু জীবনে সে এত কষ্ট পেয়েছিল যে বেশি দিন সে বাঁচল না। তিন বছর পরেই সে মারা গেল। তারপর যে রাজা হল সে বেশ নির্দয়ভাবেই রাজ্য শাসন করতে লাগল।

ধীবর আর তার আত্মা

The Fisherman and his soul

প্রতিদিন সন্ধ্যায় যুবক ধীবরটি সমুদ্রে বেরিয়ে গিয়ে ভাল, ফেলত। উপকূলভাগ থেকে বাতাস বইলে তার জালে কোনো মাছই পড়ত না পড়লেও, তা সামান্য। কারণ সে-বাতাস ঠাণ্ডা, ঝড়ো। ঢেউগুলো ফুলে ফেঁপে সেই বাতাসের সঙ্গে মল্লযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ত। কিন্তু সমুদ্র থেকে উপকূলের দিকে যখন বাতাস বইত তখনই মাছের দল ঝাঁক বেঁধে দূর-দূরান্ত থেকে এসে তার ভালের মধ্যে ঢুকত। সেই সব মাছ বাজারে নিয়ে গিয়ে সে বিক্রি করত।

প্রতিদিন সন্ধ্যার সময়েই একভাবে সে সমুদ্রে ভাসত; একদিন জালটা এত ভারী হয়ে উঠল যে সে কিছুতেই সেটাকে টেনে নৌকোর ওপরে তুলতে পারল না। নিজের মনে হেসে সে বলল–নিশ্চয় ডালে অনেক মাছ পড়েছে। অথবা, কোনো সামুদ্রিক দৈত্য ধরা পড়েছে যাকে দেখে মানুষ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকবে, বা, এমন কোনো বীভৎস ভয়ঙ্কর প্রাণী ধরা পড়েছে যাকে আমাদের মহিমময়ী মহারানি পেলে খুশি হবেন। এই বলে সে প্রাণপণ শক্তিতে জালে টান দিলা ধীরে ধীরে জলের ফতনাগুলে ভেসে উঠল; তারও বেশ কিছু পরে ভালটা নৌকোর ধারে উঠে এল।

কিন্তু জালে না রয়েছে মাছ, আর না রয়েছে কোনো সামুদ্রিক দৈত্য। রয়েছে ঘুমন্ত খুদে একটি জল-অপ্সরী। তার চুলগুলি ভেডয় সোনার পশমের মতো–এক একটি চুল যেন

কাঁচের গ্লাসে রাখা সোনার সুতো। তার দেহটা হাতির দাঁতের মতো সাদা; তার ন্যাজটা রুপো আর মুক্তো। দিয়ে তৈরি। সমুদ্রের সবুজ আগাছাগুলি তার দেহটিকে বেষ্টন করে রয়েছে। তার কান দুটি সামুদ্রিক ঝিনুকের মতো; প্রবালের মতো রাঙা তার দুটি ঠোঁটা শীতল ঢেউগুলি তার নিরুত্তাপ কুচযুগলের ওপরে গড়িয়ে পড়ছে, তার চোখের পাতায় নুন পড়ে চিকচিক করছে। অপ্সরীটি এত সুন্দরী যে যুবক জেলেটি তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। হাত দুটো বাড়িয়ে ভালটাকে সে তার কাছে টেলে নিল; তারপরে ঝুঁকে পড়ে দু'হাতে জাপটে ধরল। তাকে। তাকে সপর্শ করতেই সি-গালের মতো সে চমকে উঠে চিৎকার করে জেগে উঠল। তারপরে ফিকে লাল পদ্মরাগ মণির মতো চোখ দিয়ে ভ্যার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তার। দিকে। পালিয়ে যাওয়ার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করল সে; কিন্তু ছেলেটি কিছুতেই তাকে ছেড়ে দিল না। জোর করে জাপটে ধরে রাখল।

ছেলেটির আলিঙ্গণ থেকে মুক্তি পাওয়ার কোনো আশা নেই বুঝতে পেরে অপ্তরীটি কাঁদতে কাঁদতে বলল–দোহাই তোমার আমাকে ছেড়ে দাও; কারণ নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ রাজার আমিই একমাত্র সন্তান।

কিন্তু ছেলেটি বলল–একটিমাত্র শর্তে তোমাকে আমি ছেড়ে দিতে পারি। সেটি হচ্ছে এই যে

যখনই আমি তোমাকে ডাকব তখনই তোমাকে আমার কাছে এসে গান গাইতে হবে। সেই গান শুনে ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ এসে হাজির হবে। তাহলেই আমার ডাল মাছে বোঝাই হয়ে। যাবে।

অপ্সরীটি কাঁদতে কাঁদতে বলল–আমি যদি তোমার কথামতো কাজ করব বলে প্রতিজ্ঞা করি তাহলেই কি তুমি আমাকে ছেড়ে দেবে?

নিশ্চয় ছেড়ে দেব।

জল-অপ্সরীটি প্রতিজ্ঞা করতেই সে তার বাহুবন্ধন শিথিল করল। একটা অদ্ভুত ভয়ে কাঁপতে। কাঁপতে অঙ্গরীটি জলের মধ্যে ডুবে গেল।

প্রতিদিন সন্ধ্যায় যুবকটি সমুদ্রের বুকে গিয়ে অপ্সরীকে ডাকত, আর অপ্ধরীটি ভাল থেকে উঠে এসে তাকে গান শোনাত। সেই গান শুনে শুশুকের দল তার চারপাশে ভেসে বেড়াত। আর বন্য সি-গালের দল তার মাথার ওপরে চক্রাকারে বেড়াত উড়ে। কারণ তার গানগুলি বড়ো সুন্দর। এক গুহা থেকে আর এক গুহায় যারা মেষ চরিয়ে বেড়ায় সেই সব উপকুলবর্তী যাযাবরদের গান সে গাইত; লম্বা সবুজ দাড়িওয়ালা লোমশব ট্রিটনদের গান সে গাইত, সবুজ পাথর দিয়ে তৈরি রাজপ্রাসাদ, যার ছাদ হচ্ছে লাল পাথরের-তার গান সে গাইত। সে গান গাইত সমুদ্রের বাগানের–যেখানে সারাদিন প্রবালের ঢেউ খেলা করে, রুপালি পাখির মতো মাছেরা দৌড়ে বেড়ায় এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত–যার পাহাড়ের গায়ে এক ধরনের। সাদা ফুল ফুটে থাকে-হলদে বালির আলে যেখানে ফুটে থাকে পিঙ্ক ফুল। যে সব তিমিরা উওর সমুদ্র থেকে ভেসে আসে তাদের গান গাইত–যাদের গান না শোনার জন্যে নাবিকরা নিজেদের কানের বিবর মোম দিয়ে বন্ধ করে রাখত–কারণ তাদের গান একবার কালে ঢুকলেই সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের

প্রাণ বিসর্জন দিতে হত–সেই সব সাইরেনদের গান সে গাইত। তাছাড়া গাইত বিরাট বিরাট জাহাজের গাল, মারম্যানদের গান, যারা সাদা ফেলার বিছানায় শুয়ে থাকে আর নাবিকদের অভ্যর্থনা করার জন্যে নিজেদের হাত বাড়িয়ে দেয়-সেই সব জল-অপ্সরীদের গান সে গাইতা এই গান শুনে মাছের ঝাঁক দৌড়ে আসত সেইখানে। আর জেলের ছেলেটি জাল বোঝাই করে মাছ ধরত। মাছ ধরা শেষ হলে অপ্সরী আবার সমুদ্রে ডুবে যেত।

কিন্তু তবু যুবকটি তার দেহ সম্পর্শ করতে পারে এতটা কাছে কোনোদিনই সে আসত না। যুবকটি অনুনয়-বিনয় করলেও না। ধরার চেষ্টা করলেই সীল মাছের মতো সে জলের তলায় ডুবে যেত, আর সেদিন উঠত না। কিন্তু সে তাকে নিত্য গান শোনাত। সে-গানে যুবকটি মুগ্ধ হয়ে যেত। অনেকদিন মাছ ধরতেও সে ভুলে যেত।

একদিন সন্ধ্যার সময় যুবকটি তাকে বলল–অপ্সরী, জল-অপ্সরী; তোমাকে আমি ভালোবাসি আমাকে বিয়ে কর তুমি।

কিন্তু জল-অপ্সরী মাথা নেড়ে বলল–তা হয় না। তোমার আত্মা হচ্ছে মানুষের। যদি তুমি তোমার ওই আত্মাটিকে সরিয়ে দিতে পার তাহলেই আমি তোমাকে ভালোবাসতে পারি।

এই শুনে যুবকটি নিজের মনে-মনেই বলল–আত্মাটা আমার কী কাজে লাগছে! আমি ওকে দেখতেও পাই নে, ছুতেও পারি নে। সুতরাং আমি ওকে পরিত্যাগ করব। তাহলেই আমার জীবন আনন্দে ভরে উঠবে।

এই রকম চিন্তা করার সঙ্গে-সঙ্গে আনন্দে তার বুকটা ভরে উঠল; সে হাতটা বাড়িয়ে। বলল–আত্মাকে আমি পরিত্যাগ করব। তুমি হবে আমার বৌ, আমি তোমার বর। তারপরে সমুদ্রের অতলে আমরা দুজনে বাসা বাঁধবো। তুমি যা বলবে তাই আমি করব তাহলে আর আমাদের ছাড়াছাড়ি হবে না।

খুশি হয়ে জল-অপ্সরী নিজের হাতের মধ্যে মুখটা ঢেকে ফেলল।

যুবকটি চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করল–কিন্তু আত্মাটাকে আমি বিদায় দেব কেমন করে? বলে দাও–আমি তাই করব।

অপ্সরীটি বলল–তা আমি জানি নে। সমুদ্রে যারা বাস করে তাদের কোনো আত্মা নেই।

এই বলে তার দিকে একবার সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে সে জলের মধ্যে ডুবে গেল।

পরের দিন খুব সকালে–সূর্য তখনো পাহাড় উঁচিয়ে খুব বেশিদূর একটা ওঠেনি, ধীবর যুবকটি পাদরির বাড়িতে হাভির হয়ে দরজায় ধাক্কা দিল।

গির্জার নতুন কর্মচারীটি বেড়ার ফাঁক থেকে তাকিয়ে দেখল, তারপরে নিশ্চিন্ত হয়ে সে দরজা খুলে দিয়ে বলল—এস। যুবক ধীবরটি ভেতরে ঢুকে গেল; সুগন্ধ নলখাগড়া পাতা ছিল। মেঝেতে। পাদরি তখন প্রভুর গ্রন্থ পাঠ করছিলেন। সেইখানে হাঁটু মুড়ে বসে

পাদরিকে। সম্বোধন করে ধীবরটি বলল–পিতা, আমি একটি জলচর প্রাণীর সঙ্গে প্রেমে পড়েছি। কিন্তু তার সঙ্গে মিলনের পথে বাধা সৃষ্টি করছে আমার এই আত্মা। বলুন দেখি, কেমন করে আমি আমার এই আত্মাটাকে বিদায় করে দিতে পারি। কারণ, সত্যি কথা বলতে কি একে আমার প্রয়োজনটাই বা কী? এর দামই বা আমার কাছে কতটুকু? আমি একে দেখতেও পাই নে, একে স্পর্শও করতে পারি নে। আমি একে চিনিও না।

এই কথা শুনে পাদরিটি বুক চাপড়িয়ে বললেন–হায়, হায়! তুমি কি উন্মাদ হয়েছ, না, কোলো। বিষাক্ত ওষুধ খেয়েছ? আত্মাই হচ্ছে মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। যাতে আমরা খুব ভালো আর। সভাবে ব্যবহার করতে পারি সেই উদ্দেশ্যেই ঈশ্বর এটি আমাদের দিয়েছেন। বিশ্বের সমস্ত সোনা-দানা একসঙ্গে জড়ো করলেও এর সমমূল্যের হয় না। সেই জন্যে বলছি, ওকথা তুমি আর মনেও স্থান দিয়ো না। একথা ভাবাও পাপ; সে-পাপের কোনো ক্ষমা নেই। আর জলচর প্রাণীদের কথা যদি বল তাহলে বলতে হয় তারা সবাই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। যারা তাদের সঙ্গে মেলামেশা করে তারাও অধঃপাতে গিয়েছে। তারা হচ্ছে মাটির পশু; ন্যায়-অন্যায়ের জ্ঞান তাদের নেই। ঈশ্বর তাদের জন্যে মৃত্যু বরণ করেননি।

পাদরির এবম্বিধ বাক্য শুনে যুবক ধীবরটির চোখ দুটি জলে ভরে উঠল; তারপরে সে দাঁড়িয়ে উঠে বলল–পিতা, বনদেবতারা খুশি মনে বনে বাস করে; গন্ধর্বরা সোনার বীণা নিয়ে পাথরের ওপরে বাসে থাকে। তাদের দিনগুলি ফুলের মতো মিষ্টি। তোমাকে অনুরোধ করছি আমাকে তুমি তাদের মতো করে দাও। যে আত্মা আমার ভালোবাসার পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে তাকে পুষে রেখে আমার লাভ কী?

ভুরু দুটো কুঁচকে পাদরি চিৎকার করে বললেন–দেহজ ভালোবাসা নোংরা আর ঈশ্বর যে সব পেগান দেবতাদের তাঁর বিশ্বে ঘুরে বেড়াত দেন তারাও কদর্য। অরণ্যবাসী গন্ধর্বরা নিপাত যাক; নিপাত যাক জল-অপ্সরীর দল। রাত্রিতে আমি তাদের গান শুনেছি। তারা আমাকে ভুলিয়ে ঘরের বাইরে টেনে নিয়ে যেতে চায়। আমার জানালায় ঠকঠক করে শব্দ করে তারা হাসে। তাদের সেই বিপজ্জনক আনন্দের কাহিনি তারা আমার কানে কানে বলে যায়। তারা আমাকে প্রলুব্ধ করে। আমি যখন প্রার্থনা করি তখন তারা আমাকে ভেংচি কাটে। আমি তোমাকে বলছি স্বর্গ না নরক-কোথাও তাদের কোনো স্থান হবে না; কোথাও তারা ঈশ্বরের স্তব করবে না।

যুবক ধীরের কেঁদে বলল–পিতা, তুমি কী বলছ তা তুমি জান না। আমার জালে এবার আমি একটি রাজকন্যাকে বন্দী করেছি। সকাল বেলার নক্ষত্রের চেয়েও সে সুন্দরী, চাঁদের চেয়েও সাদা তার দেহের রঙ। তারই জন্যে আত্মাকে আমি বিসর্জন দেব; তারই জন্যে স্বর্গকে আমি পরিত্যাগ করব। সুতরাং আমি যা চাচ্ছি তাই আমাকে দাও; আমি শান্তিতে ফিরে যাই।

পাদরি চিৎকার করে বললেন–দূর হও, দূর হও। তোমার প্রণয়িণীকে ঈশ্বর পরিত্যাগ করেছেন। তোমাকেও ঈশ্বর পরিত্যাগ করবেন।

গভীর দুঃখে মাথাটি নিচু করে যুবকটি বাজারের দিকে এগিয়ে গেল।

ব্যবসাদারেরা তাকে আসতে দেখে নিজেদের মধ্যে কী সব আলোচনা করল; তারপরে তার নাম ধরে ডেকে জিজ্ঞাসা করলকী বিক্রি করবে হে?

সে বলল বিক্রি করব আমার আত্মা। এটাকে নিয়ে আমি বড়ো ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তোমরা। এটা আমার কাছ থেকে কেড়ে নাও। কারণ, আমি একে দেখতেও পাই নে, সপর্শও করতে পারি লে; এটা কী তাও আমি জানি নে। এটা আমার কোন কাজে লাগবে?

ব্যবসাদারেরা তাকে ব্যঙ্গ করে বলল–তোমার আত্মা মানুষের কোন কম্নে লাগবে? এক টুকরো রুপোর দামও ওর নেই। তোমার দেহটাকে বিক্রি করে দাও। আমরা তোমাকে ক্রীতদাস করব। কিন্তু আর কথাটি বলো না। ওর কোনো দাম নেই আমাদের কাছে।

যুবক মনে-মনে বলল–কী অদ্ভুত জিনিস! পাদরি বললেন আত্মার দাম বিশ্বের সমস্ত সোনা একসঙ্গে করলে যা হয় তাই। ব্যবসাদাররা বলছে ওর দান কানাকড়িও নয়।

এই বলে সে বাজার ছাড়িয়ে সমুদ্রতীরে গিয়ে দাঁড়াল; তারপরে কী করবে ভাবতে লাগল।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তার একটি বন্ধুর কথা মনে পড়ে গেল। বন্ধুটি তাকে এক-ডাইনির কথা বলেছিল। উপকূলের ওপরে একটা গুহায় সে বাস করত। আত্মাকে বিসর্জন দেওয়ার জন্যে সে এতই অস্থির হয়ে উঠেছিল যে সেই কথাটা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে

সেইদিকে ছুটল। তার পেছনে-পেছনে ধুলোর ঝড় বইতে লাগল। হাত কুটকুটানি থেকে যুবতী ডাইনিটি বুঝতে পারল সে আসছে। বুঝে, সে একটু হেসে তার লাল চুলগুলিকে এলিয়ে দিলা এইভাবে এলো চুলে সে তার গুহার মুখে এসে দাঁড়ালা তার হাতে ছিল একগোছা ফুটন্ত হেমলক।

ধীবর যুবকটি যখন হাঁপাতে হাঁপাতে খাড়াই সিঁড়ি বেয়ে তার সামনে এসে নতজানু হয়ে বসল তখন ডাইনিটি চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করল–কী চাও তুমি-কী চাও? ঝড়ের সময়ে। ডালে মাছ ধরতে চাও? আমার শরের ছোটো একটা বাঁশি রয়েছে। সেটা বাড়ালেই মুলেটরা ভাসতে-ভাসতে সব উপকুলের ধারে এসে হাজির হয়। কিন্তু তার জন্যে হে সুন্দর যুবক, তোমাকে কিছু দিতে হবে। তোমার কী চাই–তোমার কী চাই? প্রচণ্ড বাত্যায় জাহাজকে ভেঙে চুরমার করে দিতে চাও যাতে সমস্ত মণিমুক্তা উপকূলে ভেসে আসবে? তাও তুমি পাবে। কিন্তু তার জন্যে কিছু দিতে হবে তোমাকে। আমার কাছে একটা ফুল রয়েছে সেটা এই উপত্যকারই এমন একটা অংশে জন্মায় যেটা আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। তার বুকে একটা তারার চিহ্ন রয়েছে। এর রস হচ্ছে দুধের মতো সাদা। তারই একটা ফোঁটা যদি তুমি রানির দাম্ভিক ঠোঁটের ওপরে একবার বুলিযে দিতে পার তাহলে সে তোমার পিছু পিছু সারা বিশ্ব ঘুরে বেড়াবে। কিন্তু তার জন্যে কিছু দিতে হবে তোমাকে। কিছু দিতে হবে। একটা। ব্যাঙকে পিষে আমি কাদা করে দিতে পারি। সেইটাকে গোলাতে পারি একটা মরা লোকের হাত দিয়ে। ঘুমন্ত শত্রুর ওপরে সেটা যদি ছিটিয়ে দাও তাহলে সঙ্গে সঙ্গে সাপ হয়ে যাবে। তার মা-ই তখন তাকে মেরে ফেলবে। একটা চাকা দিয়ে চাঁদকে আমি স্বর্গ থেকে টেনে আনতে পারি। একটা স্ফটিক

পাত্রের মধ্যে দেখাতে পারি মৃত্যুকে। কী চাও বল। তোমাকে আমি তাই দেব। কিন্তু প্রতিদানে কিছু দিতে হবে তোমাকে।

যুবক ধীবর বলল–আমি চাই সামান্য; কিন্তু পাদরি রেগে আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন, আমাকে বিদ্রূপ করেছে ব্যবসাদাররা। যদিও মানুষে তোমাকে ডাইনি বলে, তবু সেই জন্যেই আমি তোমার কাছে এসোচ্ছি৷ তুমি প্রতিদানে যা চাও তাই আমি দেব।

তার সামনে এগিয়ে এসে ডাইনিটি জিজ্ঞাসা করল–কী চাও বল৷

আত্মাটিকে আমি বিদায় দিতে চাই।

ডাইনির মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেল। কেঁপে উঠল তার শরীর। নীল চাদরে সে তার মুখটা ঢেকে ফেলল। তারপরে বিড়বিড় করে বলল–সুন্দর যুবক, ওটা বড়ো ভয়ানক জিনিস।

যুবকটি তার তামাটে চুলগুলিকে ঝাঁকুনি দিয়ে হেসে বলল–আয়াটা আমার কাছে কিছু নয়। আমি তাকে দেখতেও পাইনে, সপর্শও করতে পারি নে। আমি তাকে চিনিও না।

সুন্দর চোখ দুটি দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে ডাইনি বলল–যদি তোমাকে আমি বলে দিই তাহলে আমাকে তুমি কী দেবে?

সে বলল–পাঁচটা সোনার মোহর। সেই সঙ্গে দেব ডাল, আমার বাড়ি, আর যে নৌকো ভাসিয়ে আমি মাছ ধরতে যাই সেই লৌকো। শুধু পথটা আমাকে দেখিয়ে দাও; আমার যা কিছু রয়েছে সব তোমাকে দিয়ে দেব।

বিদ্রূপ করে হেসে ডাইনিটি বলল–শরৎকালের পাতাকে আমি সোনায় পরিণত করতে পারি। ইচ্ছে হলে, বিবর্ণ চাঁদের আলোকে আমি রুপোর স্রোতে পরিণত করতে পারি। আমার মনিব বিশ্বের সমস্ত রাজাদের চেয়ে ধনী।

তাহলে, কী চাই তোমার?

আমার সঙ্গে নাচতে হবে।

মাত্র এই? অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল যুবকটি।

ও ছাড়া আর কিছু নয়-এই বলে ডাইনিটি মিষ্টি করে হাসল।

যুবকটি বলল–তাহলে সূর্যাস্তের পরে কোনো গোপন জায়গায় আমরা দুজনে নাচব। নাচের শেষে আমি যা জানতে চাই তুমি আমাকে তাই বলে দেবে।

ডাইনিটি ঘাড় নেড়ে বলল–পূর্ণিমার রাতে, পূর্ণিমার রাতে।

এই কথা বলে চারপাশে একবার উঁকি দিয়ে কান পেতে কী যেন শুনতে লাগল সে। একটা নীল পাখি চিৎকার করতে-করতে তার বাসা থেকে বেরিয়ে উড়ে গেল। মোটা ঘাসের বনে তিনটে। ডোরাকাটা পাখি খস খস করতে করতে শিস দিয়ে পরস্পরকে ডাকতে লাগল। আর শোনা গেল উপলখণ্ডের ওপরে ঢেউ-এর গড়িয়ে পরার শব্দ। এগুলি ছাড়া আর কোনো শব্দ ছিল না। কোথাও।

ডাইনিটি ফিসফিস করে বলল–আজ রাত্রিতে পাহাড়ের ওপরে নিশ্চয় তুমি আসবে। আজ হচ্ছে স্যাবাথা। তিনি সেখানে উপস্থিত থাকবেন।

একটু চমকে উঠে সে জিজ্ঞাসা করল–কার কথা বলছ?

ডাইনিটি বলল— শুনে লাভ নেই তোমার, আজ রাত্রিতে যথাস্থলে উপস্থিত হয়ে হর্নবিম গাছের ডালের নীচে আমার জন্যে অপেক্ষা করবে তুমি যদি কোনো কালো কুকুর তোমার দিকে দৌড়ে আসে তাহলে উইলো গাছের একটা লাঠি দিয়ে তাকে আঘাত করো। তাহলেই সে পালিয়ে যাবে। যদি কোনো পেঁচা তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়– তার কথার কোনো উত্তর দিয়ো না। আকাশে পূর্ণ চাঁদ উঠলেই আমি তোমার কাছে আসব। তারপরে আমরা দুজনে ঘাসের ওপরে নাচব।

সে জিজ্ঞাসা করল–কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর দেবে তো?

ছাগলের খুরে দিব্যি দিয়ে বলছি, দেব।

যুবকটিই তার মাথা থেকে টুপিটা একটু তুলল; তারপরে মাথাটা একটু নুইয়ে খুশি মনে ফিরে গেল।

যতদূর দেখা যায় ডাইনিটি তাকে দেখল; তারপরে গুহার ভিতরে গিয়ে আয়নায় নিজের মুখ দেখল; চারকোল পুড়িয়ে ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে কী যেন দেখল; তারপরে মুষ্টিবদ্ধ করে বলল–জল-অপ্সরীর মতোই আমি সুন্দরী। ও আমারই হওয়া উচিত ছিল।

এবং সেদিন সন্ধ্যায় চাঁদ ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে সে পাহাড়ের ওপরে উঠে হর্নবিম গাছের নীচে অপেক্ষা করতে লাগল। মধ্য রাত্রিতে ডাইনিরা বাদুড়ের মতো উড়তে উড়তে সেখানে হাজির হল। ঘাসের ওপরে নেমে তারা বলাবলি করতে লাগল–এ যে নতুন লোক দেখছি! শেষকালে বাতাসে লাল চুল উড়িয়ে এল সেই যুবতী ডাইনি। তাকে দেখেই অন্য ডাইনিরা চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করল–তিনি কোথায়-তিনি?

ডাইনিটি একটু হেসে হর্নবিম গাছের তলায় দৌড়ে গিয়ে ধীবরটির হাতে ধরে ঘাসের ওপরে টেনে নিয়ে এল। তারপরে তারা নাচতে শুরু করল। দুজনে তারা ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগল। ঠিক এমন সময় মনে হল কে যেন ঘোড়ায় চেপে দ্রুতবেগে তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। কিন্তু কোনো ঘোড়াই তার চোখে পড়ল না। কেমন যেন ভয় পেয়ে গেল সে।

ডাইনি বলল–জোরে, জোরে; আরো জোরে। এই বলে ধীবরটির গলাটা সে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল। তার তপ্তশ্বাস যুবকটির গালের ওপরে এসে পড়ল। আরও জোরে, আরও ডোরে'–চিৎকার করে উঠল ডাইনি। মনে হল, পৃথিবীটা তাদের তলায় বনবন করে ঘুরছে।

যুবকটির কেমন যেন ভয় লাগল। তার মনে হল কোনো অমঙ্গল যেন তাকে লক্ষ করছে। তারপরে তার মনে হল পাথরের ছায়ার নীচে একটা লোক বসে রয়েছে। এর আগে তাকে সে। দেখেনি। লোকটার গায়ে কালো ভেলভেটের পোশাক। তার মুখটা অদ্ভুত রকমের বিবর্ণ কিন্তু তার ঠোঁট দুটি লাল ফুলের মতো গর্বিত। তাকে বেশ ক্লান্ত মনে হল; মনে হল যেন। অন্যমনস্কভাবে একটা ছোরার বাঁট নিয়ে সে খেলা করছে।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো যুবক ধীবরটি তাকে লক্ষ করল। তারপরে চারটি চোখের মিলন হল। ডাইনিটির হাসির শব্দ সে শুনতে পেল। সে তার কোমর জড়িয়ে ধরে বনবন করে ঘুরোতে লাগল। বনের ভেতরে হঠাৎ একটা কুকুর ডেকে উঠল। নাচিঘেরা সব থেমে গেল। তারপরে জোড়া-জোড়া তারা সেই লোকটার দিকে এগিয়ে দিয়ে তার হাতে চুমু খেল। কিন্তু লোকটির ঠোঁট দুটো ব্যঙ্গের হাসিতে বেঁকে গেল। সে কেবল যুবক ধীবরটির দিকে তাকিয়ে রইল।

ডাইনিটি তাকে ফিসফিস করে বলল–এস আমরা ওঁকে পুজো করি।

হাত ধরে তাকে সে এই লোকটির কাছে নিয়ে গেল; কিন্তু কাছাকাছি আসতেই কী জানি কেন ধীবরটি ক্রুশের ভঙ্গিতে তার বুকের ওপরে হাত দুটো রাখল; আর ঈশ্বরের নাম করল।

যুবকটির এরকম ব্যবহার দেখেই ডাইনিরা বাজপাখির মতো চিৎকার করতে করতে উড়ে পালাল; যে বিবর্ণ মুখটা এতক্ষণ ধরে তাকে লক্ষ করছিল সেটা যন্ত্রণায় কুঁকড়ে কুঁকড়ে উঠতে লাগল, তারপরে সে বনের মধ্যে দৌড়ে গিয়ে ঘোড়ায় চেপে তার দিকে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

লাল চুল-ওয়ালী সেই ডাইনিটিও পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল; কিন্তু ধীবরটি শক্ত করে তার কব্জিটা ধরে রইলা সে চিৎকার করে বলল–আমাকে ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও; কারণ, তুমি এমন একটি শব্দ উচ্চারণ করে যা তোমার উচ্চারণ করা উচিত হয়নি; এমন একটি চিহ্ন দেখিযে যার দিকে তাকানো উচিত নয় আমাদের।

ধীবরটি বলল–ওসব ছাড়া সেই গোপন কথাটা না বলা পর্যন্ত আমি তোমাকে ছেড়ে দেব না।

ডাইনির ঘেসো-সবুজ রঙের চোখ দুটো জলে করুণ হয়ে উঠল; বলল–ওটা বাদ দিয়ে তোমার যা ইচ্ছা তাই চাও।

ধীবরটি হেসে তার মুঠো আরও শক্ত করে ধরে রইল।

তার হাতে থেকে নিস্তার নেই বুঝতে পেরে ডাইনি অনুনয় করে বলল–সমুদ্রের মেয়ের মতোই নিশ্চয় আমি সুন্দরী, আর তারই মতো শান্ত।

কিন্তু ধীবরটি তাকে একটা ঝাঁকনি দিয়ে বলল–হয় বল; না হয়তো তোমাকে আমি খুন করে ফেলুব]

এই কথা শুনে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ডাইনি বলল–তবে তাই হোক। তোমার আত্মা তোমার নিজস্ব। আমার নয়। ওকে নিয়ে যা ইচ্ছা তাই তুমি করতে পার।

এই বলে কোমরবন্ধনী থেকে ছোটো একটা ছুরি বার করে সে যুবকটির হাতে দিল।

অবাক হয়ে যুবকটি জিজ্ঞাসা করল–এ দিয়ে আমি কী করব?

একটু চুপ করে রইল ডাইনি; ভয়ার্ত হয়ে উঠল তার দৃষ্টি। তারপরে কপালের উপর থকে। চুলগুলি সরিয়ে দিয়ে অদ্ভুতভাবে হেসে বলল–মানুষ যেটাকে দেহের ছায়া বলে মনে করে। সেটা দেহের ছায়া নয–সেটা হল আত্মার ছায়া। চাঁদের দিকে পেছন করে সমুদ্রের উপকূলে। দাঁড়াও। পায়ের চারপাশে তোমার যে ছায়াটাকে দেখতে পাবে সেটা কেটে ফেলবে। তারপরে তোমার আত্মাকে নির্দেশ দেবে তোমাকে ছেড়ে যেতো তখনই তোমার আত্মা তোমাকে ছেড়ে চলে যাবে।

সত্যি?

সত্যি তোমাকে এটা হয়তো আমার বলা উচিত হয়নি।

এই বলে কাঁদতে কাঁদতে সে তার হাঁটু দুটো জড়িয়ে ধরল।

ধীবরটি তাকে ঘাসের ওপরে ফেলে রেখে ছুরিটা তার কোমরে বেঁধে পাহাড় থেকে নেমে এল।

এবং তার ভেতরে যে আত্মাটা ছিল সে তাকে ডেকে বলল–শোন। আমি এতদিন তোমার সঙ্গে বাস করেছি–দাসত্ব করেছি তোমার। এখন আমাকে তুমি বিসর্জন দিয়ো না। আমি তো কোনো অন্যায় করিনি।

যুবকটি হেসে বলল–তা তুমি করনি। কিন্তু তোমাকে আমার আর প্রয়োজন নেই। বিরাট বিশ্ব–এখানে স্বর্গ আর নরক দুই-ই রয়েছে। যেখানে ইচ্ছে তুমি চলে যাও। আর আমাকে বিরক্ত করো না। কারণ, আমার প্রেয়সী আমাকে ডাকছে।

আত্মা বলল–যদি একান্তই আমাকে বিদায় দাও তাহলে অন্তত হৃদয়টাকেও দাও। এই পৃথিবী বড়োই নিষ্ঠুর। সুতরাং হৃদযটাকেও নিয়ে যেতে দাও আমাকে।

যুবকটি হেসে মাথা নেড়ে বলল–হৃদয়টাই যদি তোমাকে দিলাম তাহলে প্রেয়সীকে আমি কী দেব? ওটা আমার প্রেমিকার। অতএব চলে যাও। আর দেরি করো না।

প্রেমে কি আমারও প্রয়োজন নেই?

চলে যাও, চলে যাও। তোমাকে আমার আর প্রয়োজন নেই।

এই বলে ছুরিটা নিয়ে সে পায়ের ছায়াটা কেটে ফেলে ছুরিটা আবার কোমরে গুঁজে রাখল। চলে যাও, চলে যাও। তোমাকে আর আমার প্রয়োজন নেই।

আটি বলল–না, আবার আমাদের দেখা হবে।

যুবকটি জিজ্ঞাসা করল–কী করে? তুমি নিশ্চয় সমুদ্রের তলায় আমার সঙ্গে যাবে না?

বছরে একবার এইখানে এসে আমি তোমাকে ডাকব। হয়তো, আমাকে তোমার প্রয়োজন হতে পারে।

যুবকটি বলল–তোমাকে আমার আবার কী প্রয়োজন হবে বুঝতে পারছি নে, তবে তুমি যখন আসতে চাইছ তখন এস।

এই বলে সে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ট্রিটনরা তাদের শিঙে ফুকল। সেই খুদে ভলঅস্পরীটি সমুদ্রের জলে ভেসে তাকে অভ্যর্থনা জানাল; তার দুটি হাতে যুবকের গলাটা জড়িয়ে ধরে। তার মুখে চুমু খেল।

আর সেই নির্জন সমুদ্রতীরে আত্মাটি নিঃসঙ্গভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখল। যখন তারা জলের তলায় ডুবে গেল তখনই সে কাঁদতে-কাঁদতে জলাভূমির ওপর দিয়ে চলতে লাগল।

এক বছর পরে সেইখানে ফিরে এসে আত্মাটি তাকে ডাকল। সমুদ্র থেকে উঠে যুবকটি জিজ্ঞাসা করল–ডাকছ কেন?

আমার কাছে এস। আমি কী অদ্ভুত জিনিস দেখেছি সেই সব কথাই তোমাকে বলব।

কাছে এস অগভীর জলে হেলান দিয়ে বসে ধীবরটি তার কথা শুনতে লাগল।

আত্মাটি বলল– তোমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উত্তর দিকে মুখ করে আমি হাঁটতে লাগলাম। বিশ্বের যা কিছু বিজ্ঞতা সবই এই পূর্বদিক থেকে এসেছে। ছ'দিন হাঁটার পরে সপ্তম দিন সকালে আমি একটা পাহাড়ের কাছে এসে হাজির হলাম। এই দেশটা হচ্ছে তাতারদের। রোদের ঝাঁঝ এড়ানোর জন্যে আমি একটা গাছের ছায়ায় বসলাম। শুকনো মাটি, একেবারে রোদে পুড়ে গিয়েছে। মাছির মতো গুঁড়ি দিয়ে মানুষরা সব ঘুরে বেড়াচ্ছে সেখানে।

দুপুরের সময় দেখলাম সমতলভূমি থেকে লাল ধুলো উঠে আকাশ ছেয়ে দিয়েছে। এই দেখেই তাতাররা তাদের চিত্রিত ধনুক নিয়ে ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে সেইদিকে এগিয়ে গেল। মেয়েরা চিঞ্জার করতে করতে গাড়ির পেছনে নিজেদের লুকিয়ে ফেলল।

সন্ধ্যার দিকে তাতাররা ফিরে এল; কিন্তু তাদের মধ্যে পাঁচজনকে দেখা গেল না। যারা ফিরে। এল তাদের মধ্যেও কম লোক আহত হয়নি। তারা সেই গাড়িগুলোকে ঘোড়ার সঙ্গে জুড়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেল। তিনটে শেয়াল গর্ত থেকে বেরিয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে একবার দেখেই উলটো দিকে চলে গেল।

চাঁদ উঠলে দেখলাম সমতলভূমির ওপরে তাঁবুর কাছে আলো জ্বলছে। এই দেখে আমি সেই দিকে এগিয়ে গেলাম। দেখলাম কার্পেটের ওপরে একদল বণিক বসে রয়েছে। পেছনে বাঁধা। রয়েছে উটের দল; আর তাদের নিগ্রো চাকররা তাদের জন্যে তাঁবু খাঁচাচ্ছে। তাদের কাছে হাজির হতে বণিকদের নেতা তরোয়াল খুলে জিজ্ঞাসা করল–কী চাই?

বললাম আমি আমার দেশের একজন রাজপুত্র। তাতাররা আমাকে ধরে এনে ক্রীতদাস করে রাখবে ভেবেছিল, আমি তাদের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছি।

আমার কথা শুনে লোকটা হেসে আমাকে পাঁচটা কাটা মুণ্ডু দেখাল। মুণ্ডুগুলো পাঁচটা লম্বা। বাঁশের মাথার ওপরে গাঁথা ছিল। লোকটা আমাকে জিজ্ঞাসা করল–ঈশ্বরের অবতার কে? আমি বললাম-মহম্মদ।

এই কথা শুনে মাথাটা নুইয়ে সে হাত ধরে আমাকে তার পাশে বসাল। কাঠের পাত্রে একটা নিগ্রো ক্রীতদাস আমার জন্যে ঘোড়ার দুধ এনে দিল; আর এনে দিল সেদ্ধকরা একটুকরো মেড়ার মাংস।

সকাল হতে আমাদের যাত্রা শুরু হল। দলপতির পাশে-পাশে লাল-চুলো একটা উটের পিঠে চড়ে আমি চলতে লাগলাম। আমাদের সামনে বর্শা নিয়ে ছুটতে লাগল একটা লোক। আমাদের দু'পাশে চলল সৈন্য। পেছনে চলল খচ্চরের দল পণ্য নিয়ে।

তাতারদের দেশ ছেড়ে আমরা আর একটা দেশে হাজির হলাম। সেখানকার লোকেরা চন্দ্রকে অভিসম্পাত দেয়। আমরা গ্রাইফোনসদের দেখলাম। সাদা পাহাড়ের ওপরে বসে তারা। তাদের ধনরত্ন পাহারা দিচ্ছিল। পাচ্ছে নিঃশ্বাসের হাওযার বরফ ঝরে পড়ে এই ভযে পাহাড়ের ওপর দিয়ে আমরা নিঃশ্বাস বন্ধ করে হাঁটছিলাম। উপত্যকা দিয়ে যাওয়ার সময় গাছের কোটর থেকে পিগমিরা আমাদের দিকে তীর ছুঁড়ল রাত্রিতে বন্য মানুষেরা ভট্রাক পিটতে লাগল। বাঁদরদের টাওয়ারে এসে আমরা তাদের ফল খেতে দিলাম। ফলে, তারা আমাদের কোনো অনিষ্ট করল না। সাপেদের টাওয়ারে এসে তামার পাত্রে তাদের দুধ খেতে দিলাম। তারা আমাদের পথ ছেড়ে দিল।

প্রতিটি শহরের রাজা আমাদের ওপরে কর বসাল; কিন্তু আমাদের ভেতরে ঢুকতে দিল না। দেওয়ালের ওপাশ থেকে কিছু বুটি আর অন্যান্য খাবার ছুঁড়ে দিল। গ্রামবাসীরা আমাদের আসতে দেখে পাতকুযযার ডলে বিষ মিশিয়ে দিয়ে সব পাহাড়ের ওপরে পালিয়ে গেল। আমরা ম্যাগভি-দের সঙ্গে লড়াই করলাম। এরা বুড়ো হয়ে জন্মায়। তারপর ছোটো হয়ে ক্রমশ বাড়তে থাকে। শেষকালে মারা যাওয়ার সময় শিশু হয়ে যায়। লড়াই করলাম ল্যাকট্রইদের সঙ্গে। বাঘেদের সন্তান বলে নিজেদের জাহির করে তারা। আমাদের লড়াই করতে হল অরেনটিসদের সঙ্গে। মৃতদেহকে এরা গাছের ওপরে কবর দেয়, নিজেরা থাকে গুহার অন্ধকারে। এই সব লড়াই-এ আমাদের দলের এক তৃতীয়াংশ মারা গেল; আর এক তৃতীয়াংশ মারা গেল অভাবে বাকি যারা রইল তারা আমার বিরুদ্ধে এই বলে অভিযোগ করত লাগল যে তাদের এই সব দুর্ভাগ্যের জন্যে আমিই দায়ী। পাথরের নীচে থেকে শিং-ওয়ালা একাট বিষাক্ত সাপ বার করে ছোবল খেলাম তার। তারা যখন দেখল সাপের ছোবল খেয়েও আমাদের কিছু হল না তখন তারা ভয় পেয়ে গেল।

চতুর্থ মাসে আমরা হাজির হলাম ইলেল শহরে। তখন রাত্রি, আকাশে ফিকে চাঁদ দেখা যাচ্ছে। গাছ থেকে ডালিম পেড়ে তারই রস খেলাম আমরা। তারপরে আমাদেরই কার্পেট বিছিয়ে সকালের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। সকাল হলে শহরের ফটকে ধাক্কা দিলাম আমরা, ফটকের দরজা ছিল লাল ব্রোঞ্জ-এর; তার গায়ে আঁক ছিল সামুদ্রিক আর পাখা-ওয়ালা ড্রাগনদের ছবি। প্রাচীরের ওপর থেকে সশস্ত্র প্রহরীরা জিজ্ঞাসা করল–কী চাই তোমাদের? আমাদের মধ্যে যে দোভাষী ছিল সে বলল–সিরিয়া থেকে আমরা

অনেক। পণ্যদ্রব্য নিয়ে এসেছি। আমাদের মধ্যে কয়েকজনকে তারা জামিন রেখে বলল– দুপুরের দিকে দরজা খোলা হবে। তোমরা ওখানে অপেহক্ষা কর।

দুপুরের দিকে দরজা খোলা হল। শহরের ভেতরে আমরা ঢুকে গেলাম। চারপাশ থেকে লোক এসে আমাদের দেখতে লাগল। একজন ঘোষক আমাদের আগমনবার্তা জানিয়ে জানিয়ে এগিয়ে গেল আমরা বাজারে এসে দাঁড়ালাম, আর নিগ্রোরা বাক্সপ্যাটরা খুলে জিনিসপত্র সব দেখাতে লাগল।

প্রথম দিন পাদরি এসে আমাদের সঙ্গে দরকষাকষি করল। দ্বিতীয় দিন এলো অভিজাত

সম্প্রদায়ের লোকেরা তৃতীয় দিনে হাজির হল মিস্ত্রি আর ক্রীতদাসের দল। বিদেশ থেকে বণিকরা এলে এই রীতিতেই ওখানকার মানুষেরা তাদের সঙ্গে সওদা করত।

প্রায় পনেরোটি দিন এইভাবে আমাদের কেটে গেল। তারপরে শুক্লপক্ক শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্লান্ত হয় আমি শহরের রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। ঘুরতে ঘুরতে আমি একটা বাগানে এসে হাজির হলাম। সেখানে ওদের দেবতা বাস করেন। বেগুনে পোশাক পরে পাদরীরা সবুজ গাছের মধ্যে দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। কালো মার্বেল পাথরের একটি জায়গার ওপরে একটা। গোলাপের মতো লাল বাড়ি। সেখানেই দেবতারা থাকে। মণি-মুক্তা দিয়ে খচিত তার দরজা নানা চিত্রে শোভিত তার দেওয়াল। মন্দিরের সামনে পরিষ্কার ঝকঝকে একটি জলাশয়। তার পাশে আমি শুয়ে রইলাম। আমার বিবর্ণ আঙুলগুলি দিয়ে চওড়া-চওড়া পাতাগুলিকে ধরলাম। একটি পাদরি আমার দিকে এগিয়ে এসে পেছনে

দাঁড়ালেন। তাঁর পায়ে চটি-জুতো। একটা পাটি জুতো সাপের নরম চামড়া দিয়ে তৈরি, আর এক পাটি জুতো তৈরি পাখির পালক দিয়ে।

একটু পরে আমাকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন-কী চাই তোমার?

আমি বললাম–দেবতাকে দেখতে চাই।

তাঁর সেই তেবচা ছোটো চোখে আমার দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে তিনি বললেন–দেবতা শিকার করছেন।

বললাম-কোন বনে শিকার করছেন বলুন; আমি তাঁর সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে শিকার করব।

লম্বা নখ দিয়ে তাঁর ঢিলে পোশাকটা চেঁছে তিনি বললেন–দেবতা ঘুমোচ্ছেন।

জিজ্ঞাসা করলাম–কোন সোফায় ঘুমোচ্ছেন বলুন। আমি তাকে ঘুমোতে দেখব।

তিনি চেঁচিয়ে বললেন–দেবতা এখন ভোজনাগারে খাচ্ছেন।

বললাম-মদ যদি মিষ্টি হয় তাহলে তাঁর সঙ্গে আমি মদ খাব। তেতো হলেও পিছিয়ে আসব না।

বিস্ময়ে তিনি মাথাটা নীচু করে আমাকে হাত ধরে তুললেন; তারপরে মন্দিরে নিয়ে গেলেন আমাকে।

প্রথম ঘরে দেখলাম একটা সিংহাসনের ওপরে একটি মূর্তি বসানো রয়েছে। সিংহাসনটি মূল্যবান ধাতুতে তৈরি। তার চারপাশটা প্রাচ্যদেশীয় মুক্তা দিয়ে খচিত। মূর্তিটার চেহারা একটা মানুষের মতো। তার কপালে একটা রুবি বসানো; তার চুল থেকে দাবনা পর্যন্ত তেলে ড্যাব ড্যাব করছে। নতুন জবাই করা একটা ছাগল শিশুর রক্ত তার পায়ে।

পাদরিকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম–এই কি দেবতা?

পাদরি বললেন–এই দেবতা।

আমি চিৎকার করে বললাম-আমাকে দেবতা দেখাও। তা না হলে আমি তোমাকে খুন করব। এই বলে আমি তাঁর হাত ধরলাম। সঙ্গে-সঙ্গে তার হাতটা শুকিয়ে গেল।

পাদরি অনুনয় করে বলল–ঈশ্বর তাঁর সেবককে নিযোগ করুন এবং আমি তাকে ঈশ্বর দেখাব।

এই শুনে আমি তাঁর হাতের ওপরে নিঃশ্বাস ফেললাম। তাঁর হাতটা সঙ্গে-সঙ্গে সেরে উঠল। কাঁপতে কাঁপতে তিনি আমাকে দ্বিতীয় কক্ষে নিয়ে গেলেন। সেখানে আমি আর একটি মূর্তি দেখলাম। সেই মূর্তিটিও বহুমূল্য অলঙ্কারে সুসজ্জিত।

দেবতা কোথায়?–জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

ইনিই দেবতা।

সত্যিকার দেবতা আমাকে দেখাও; না হলে, আমি তোমাকে হত্যা করব। এই বলে আমি তাঁর। চোখ দুটি সপর্শ করলাম। সঙ্গে সঙ্গে তিনি অন্ধ হয়ে গেলেন।

পাদরি আমাকে অনুনয় করে বললেন–ঈশ্বর তাঁর সেবককে নিরোগ করুন, তাহলেই আমি তোমাকে ঈশ্বর দেখাব।

তাঁর চোখের ওপরে নিঃশ্বাস ফেলতেই তিনি আবার তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন।

তিনি আমাকে তৃতীয় প্রকোষ্ঠে নিয়ে গেলেন। কিন্তু সেখানে কোনো মূর্তি নেই রয়েছে পাথরের বেদীর ওপরে একটা আয়নামাত্রা

দেবতা কোথায়?–জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

তিনি বললেন–দেবতা বলে কিছু নেই। রয়েছে মাত্র এই আয়না; এটাকে বলা হয় বিজ্ঞতার আয়না। এর মধ্যে থেকে স্বর্গ আর মর্তের প্রতিটি জিনিস প্রতিফলিত হয়। অনেক আয়নাই এখানে রয়েছে; কিন্তু সেগুলি সবই ওই বিভিন্ন মতবাদের আয়না।

যাদের এই আয়নাটি রয়েছে তারা সব কিছুই জানতে পারে। সেই জন্যে এটি আমাদের ঈশ্বর। আমরা সবাই একে পুজো করি।

আয়নার দিকে তাকিয়েই বুঝলাম পাদবিটি সত্যি কথাই বলেন। তারপরে আমি একটা অদ্ভুত কাজ করলাম; কিন্তু সে কথা থাক। এখান থেকে একদিনের দূরত্ব একটি জায়গায় আমি সেটিকে লুকিয়ে রেখে এসেছি। আমাকে যদি তোমার ভেতরে ঢুকতে দিয়ে তোমাকে সেবা। করার সুযোগ দাও তাহলে বিশ্বের সমস্ত জ্ঞানী মানুষদের চেয়েও তুমি বেশি বিজ্ঞ হতে পারবো সেই আয়নাটি হবে তোমার সম্পত্তি। সুতরাং তোমার ভেতরে আমাকে প্রবেশ করতে দাও।

কিন্তু যুবক ধীবরটি হেসে বলল–জ্ঞানের চেয়ে প্রেম মহত্তর এবং খুদে জল-অপ্সরী আমাকে ভালোবাসে।

আত্মাটি বলল–না, না-ওকথা বলো না। জ্ঞানের চেয়ে ভালো জিনিস আর কিছু নেই।

ধীবরটি বলল–প্রেম মহত্তর। এই বলে সে ডলে ডুবে গেল। কাঁদতে কাঁদতে ফিরে গেল আত্মা। দ্বিতীয় বছরের শেষে আত্মাটি আবার সেইখানে ফিরে এসে তাকে ডাকল। সমুদ্রের তলা থেকে মুখ তুলে ধীবরটি জিজ্ঞাসা করল–আমাকে ডাকছ কেন?

আত্মাটি বলল–আমার কাছে এস। আমি যে সব অদ্ভুত জিনিস দেখেছি সেসব কাহিনি তোমাকে আমি বলব।

সুতরাং সে অগভীর জলে উঠে এসে কাহিনি শোনার জন্যে হাতের ওপরে মাথাটা হেলিয়ে দিয়ে বসল।

আত্মাটি বলে গেল–তোমার কাছ থেকে ফিরে গিয়ে আমি দক্ষিণ দিকে এগিয়ে গেলাম। ওই দক্ষিণ দেশ থেকে সমস্ত কিছু মূল্যবান জিনিস দেশ-বিদেশে যায়। যে রাস্তাটা আশতার শহরে দিকে এগিয়ে গিয়েছে আর যার ওপর দিয়ে নানান তীর্থযাত্রী আসা-যাওয়া করে সেই রাস্তা ধরে ছ'দিন আমি হাঁটলাম। সাত দিনের দিন চোখ তুলে দেখলাম উপত্যকার ওপরে একটা শহরের কাছে এসে পৌঁছেছি।

সেই শহরের দরজা নটা। প্রতিটি দরজার সামনে একটা ব্রোঞ্জ-এর ঘোড়া দাঁড়িয়ে। পাহাড়ের ওপর থেকে বেদুইনের দল শহরের দিকে এগিয়ে এলেই তারা চিৎকার করে ওঠে। তামা দিয়ে দেওয়ালগুলি মোড়া; ছাদের ওপরে দস্তা ঢালা। প্রত্যেক গম্বুজের ওপরে একজন করে তীরন্দাজ ধনুক হাতে নিয়ে পাহারা দিচ্ছে।

আমি ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করতেই প্রহরীরা আমাকে বাধা দিল। আমি কে জিজ্ঞাসা করতে আমি বললাম আমি একজন দরবেশ। আমি মক্কায় যাচ্ছি। সেখানে সবুজ কাপড়ে মোড়া কোরান রয়েছে। দেবদূতেরা রুপোর অক্ষরে তার ওপরে নক্সা এঁকেছে। এই শুনে অবাক হয়ে তারা আমাকে ভেতরে প্রবেশ করার অনুমতি দিল।

শহরের ভেতরে বাজার। তোমার আমার সঙ্গে থাকা উচিত ছিল। সর সর রাস্তার ওপরে সেখানে প্রজাপতির মতো খুদে-খুদে কাগজের লণ্ঠন জ্বলছে। দোকানের সামনে সিল্কের কার্পেটের ওপরে বণিকরা বসে রয়েছে। তাদের দড়িগুলো কালো সূচলো। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ভারত মহাসাগর থেকে আমদানি করা সুগন্ধী আতর বিক্রি করে। কেউ তাদের সঙ্গে কথা বলার জন্যে দাঁড়ালে তারা জ্বলন্ত ধুলোচুরের ওপরে কিছু সুগন্ধ মশলা ঢেলে দিয়ে বাতাসটাকে মাতোয়ারা করে তোলে। বাজারে নানান লোক নানান জিনিস বিক্রি করছে। কেউ বিক্রি করছে রুপোর ব্রেসলেট, কেউ বিক্রি করছে মুক্তাখচিত দস্তার অ্যালকলেট, কেউ বা আবার বিক্রি করছে সোনার পাতের মধ্যে আকা বাঘের থাবা, কেউ চিতাবাঘের থাবা। চাযের দোকানের ভেতর থেকে গিটার বাজানোর শব্দ আসছে; আর আফিওখোরেরা তাদের সাদা। সাদা হাস মুখ নিয়ে পথচারীদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

সত্যি কথা বলতে কি আমার সঙ্গে তোমার থাকা উচিত ছিল। কাঁধের ওপরে চামড়ার কালো ভিস্তি নিয়ে কেউ মদ বিক্রি করার জন্যে ভিড় ঠেলে ঠেলে হেঁটে বেড়াচ্ছিল। অধিকাংশ মদের ব্যবসাদাররাই বিক্রি করছিল মধুর মতো মিষ্টি স্কিরাজ-এর মদ। বাজারে ফলওয়ালারা কত। রকমের ফলই না নিয়ে বসেছিল বিক্রি করার জন্যে! একবার একটা হাতি আমার চোখে পড়ল। তার শুডটা সিঁদুর আর হলুদে চিত্রিত। কানের ওপরে লাল সিল্কের দড়ি জড়ানো। হাতিটা একটা দোকানের উলটো দিকে দাঁড়িয়ে কমলালেবু খেতে লাগল। তাই দেখে হাসতে লাগল দোকানদার। তারা যে কী অদ্ভুত ধরনের মানুষ সেকথা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। আনন্দ হলে তারা কোনো পাখি-বিক্রির দোকানে গিয়ে খাঁচাসুদ্ধ পাখি কিনে আনে; তারপরে তাকে খাঁচা খুলে

আকাশে উড়িয়ে দেয়। এতে তাদের আনন্দ আরো বেশি হয়। দুঃখ হলে যাতে, তাদের দুঃখ না কমে সেই জন্যে নিজেদের তারা কাঁটাগাছের চাবুক মারে।

একদিন সন্ধেবেলা দেখলাম কয়েকজন নিগ্রো একটা ভারী পালকি বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। রঙ করা। বাঁশ দিয়ে সেটা তৈরি; এর ডাণ্ডাগুলির মাথায় সীসের ময়ূর বসানো। জানালার ওপরে টাঙানো সূক্ষম মসলিনের পর্দা। আমার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় একটি সিরকাসিয়েন মহিলা বিবর্ণমুখে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। আমি তাকে অনুসরণ করলাম। আমাকে দেখে নিগ্রোরা দাঁত খিচোল। কিন্তু আমার এতই কৌতূহল হয়েছিল যে আমি তাদের দাঁত খিচোনিকে গ্রাহ্য করলাম না।

তারপরে তারা একটা সাদা চৌকো ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালা এ ঘরে কোনো জানালা ছিল না; ছিল কবরের ভেতরে ঢোকার মতো একটা ফুটো। সেইখানে পালকিটা নামিয়ে একটা তামার হাতুড়ি দিয়ে বার-তিনেক তারা মাটি ঠুকল। একজন আর্মেনিয়ান তাদের দেখে দরজা খুলে একটা কার্পেট বিছিয়ে দিল। মহিলাটি বাইরে বেরিয়ে এল। ভেতরে ঢোকার সময় আমার দিকে তাকিয়ে সে আবার একটু হাসল। এত বিবর্ণ মুখ জীবনে আর কখনো আমি দেখিনি।

চাঁদ উঠলে আমি আবার সেখানে গেলাম; সেই বাড়িটা খুঁজলাম; কিন্তু কোনো বাড়ি চোখে পড়ল না। তখনই আমি বুঝতে পারলাম মেয়েটি কে, আর কেনই বা সে আমাকে দেখে হেসেছিল।

সত্যিই বলছি আমার সঙ্গে তোমার থাকা উচিত ছিল। অমাবস্যার দিন ওখানে যে ভোজের উৎসবর হয় সেইদিন প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে যুবক রাজকুমার প্রার্থনা করার জন্যে মসজিদে। ঢুকলেন। সূর্যোদয়ের সময় রুপোর পোশাক পরে তিনি প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এলেন; সন্ধের সময় সোনার পোশাক পরে আবার তিনি ফিরে এলেন। জনতা তাঁর সামনে লম্বা হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ে নিজেদের মুখ ঢাকল, আমি কিন্তু তা করলাম না। একটা খেজুরের দোকানের পাশে দাঁড়িয়ে আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমাকে দেখে সম্রাট তাঁর চিত্রিত ভুরু দুটি তুলে থেমে গেলেন। আমি তবু দাঁড়িয়ে রইলাম। তাঁকে সেলাম জানালাম না। আমার এই দুঃসাহসে সবাই অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল; আমাকে পালিয়ে যাওয়ার উপদেশ দিল। তাদের দিকে গ্রাহ্য না করে আমি কতগুলি ঘৃণ্য দেবতার স্টলে গিয়ে বিক্রেতাদের সঙ্গে বসে রইলাম। আমি কী করছই তা শুনে তাদের প্রত্যেকেই একটা দেবমূর্তি আমার হাতে দিয়ে তাদের কাছ থেকে সরে যেতে তারা আমাকে অনুরোধ জানাল।

সেইদিন রাত্রিতে ডালিম গাছে ভরা একটি রাস্তার ওপরে চা-এর দোকানে জাজিমের ওপরে আমি শুয়েছিলাম। এমন সময়ে সম্রাটের রক্ষীরা ঘরে ঢুকে আমাকে প্রাসাদে নিয়ে গেল। ভেতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি ঘরের দরজা তারা বন্ধ করে শেকল এঁটে দিল। ভেতরে বিরাট একটা দরবার। তার চারপাশে বিরাট-বিরাট থামের ওপরে খিলান বসানো। দেওয়ালগুলি স্ফটিক পাথর দিয়ে তৈরি–মাঝে মাঝে নীল আর সবুজ টালি বসানো। এ রকম জায়গা এর আগে আমি কোনোদিন দেখিনি। দরবার দিয়ে যাওয়ার সময় ঘোমটায় ঢাকা দুটি মহিলা আমার দিকে তাকিয়ে আমাকে অভিসম্পাত দিল। প্রহরীরা দ্রুত হাঁটতে লাগল। তাদের বর্শার বাঁটগুলো মসৃণ মেঝের ওপরে লেগে শব্দ

করতে লাগলা হাতির দাঁতের একটা দরজা খুলে তারা ভেতরে এল। দেখলাম আমি একটি জলসিক্ত বাগানের মধ্যে দাঁড়িয়ে। রয়েছি। এর ছাদ হচ্ছে সাতটা। একটা বাগান থেকে নাইটিংগেল পাখির গান শোনা যাচ্ছিল।

কিছুক্ষণ পরে প্রহরীদের দলপতি সবাইকে সরিয়ে দিতেই তারা সব প্রাসাদের দিকে ফিরে গেল। বাগানের শেষে একটা তাঁবু ছিল। তাদের বিদায় করে দলপতি আমাকে সেই তাঁবুর দিকে যাওয়ার জন্যে ইশারা করল। নির্ভয়ে এগিয়ে গেলাম আমি। তারপরে ভারী পর্দা সরিয়ে

ভেতরে ঢুকে গেলাম। যুবক সম্রাট রঙ করা সিংহের চামড়ায় ঢাকা একটা সোফার ওপরে। শুয়েছিলেন। তাঁর পেছনে সীসের পাগড়ি চাপিয়ে একজন নুবিযার ক্রীতদাস দাঁড়িয়েছিল। তার দু-ফাঁককরা কালের ওপরে দুটো বেশ ভারী মাকড়ি ঝুলছিল। সোফার পাশে ছিল একটা টেবিল। সেই টেবিলের ওপরে ছিল ইস্পাতের তৈরি বিরাট একখানা তরোযাল।

আমাকে দেখে সম্রাট ভ্রূকুটি করে ডিজ্ঞাসা করলেন–তোমার নাম কী? তুমি কি জান না আমি এখানকার সম্রাট? কিন্তু আমি কোনো উত্তর দিলাম না।

তিনি তখন সেই তরোয়ালটার দিকে আঙুল বাড়ালেন। এই দেখ সেই ক্রীতদাসটি সেটাকে তুলে নিয়ে ভীষণ জোরে আমাকে আঘাত করল। হুইস-হুঁইস শব্দে তরোয়ালের মুখটা। আমার ভেতর দিয়ে এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গেল। কিন্তু আমার কোনো ক্ষতি করল

না। এই দেখে লোকটা মেঝের ওপরে ডিগবাজি খেয়ে পড়ে গেল। যখন সে উঠল তখন তার দাঁতে দাঁত বসে গিয়েছে; সোফার পেছনে ভযে সে লুকিয়ে পড়ল। এই দেখে দাঁড়িয়ে উঠলনে সম্রাট ঘরের একপাশে কয়েকটা অস্ত্র দাঁড় করানো ছিল। সেখান থেকে একটা বর্শা তুলে নিয়ে। আমার দিকে ছুঁড়ে দিলেন। সেটা আমি ধরে ফেলে দু-আধখানা করে ফেললাম। তিনি একটা তীর ছুঁড়লেন; কিন্তু আমি হাত দুটো আকাশে তোলার সঙ্গে সঙ্গে তীরটাও মাঝখানে থেমে গেল। তখন তিনি কোমরবন্ধনী থেকে একটা ছোরা বার করে সেই ক্রীতদাসটির গলায় নলি কেটে দিলেন। তাঁর ভয় হচ্ছিল তাঁর অপমানের কথা যদি সে বাইরে প্রকাশ করে দেয়। লোকটা কাটা সাপের মতো মেঝের ওপর ন্যাকপ্যাক করতে লাগল; মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল। সাদা গ্যাঁজলা।

সে মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সম্রাট আমার দিকে ঘুরে তাকালেন; তাঁর কপালের ওপরে তখন বড়ো বড়ো ফোঁটার ঘাম জমে উঠেছিল। ছোটো একটা রুমাল দিয়ে সেই ঘাম মুছে তিনি। আমাকে বললেন–আপনি কি নবী, না, ঈশ্বরের পুত্র যে আপনাকে আমি আঘাত করতে পারলাম না? আপনাকে অনুরোধ করছি আজ রাত্রিতেই আমার শহর ছেড়ে আপনি চলে যান। কারণ, যতক্ষণ আপনি এখানে থাকবেন ততক্ষণ আমি আর এখানে রাজত্ব করতে পারব না।

এই কথা শুনে আমি বললাম-তোমার ধনরত্নের অর্ধেক পেলে আমি চলে যেতে রাজি আছি।

সম্রাট আমার হাত ধরে বাগানে নিয়ে গেলেন। সেখানে একটা ঘর রয়েছে। সেই ঘরে শক্ত লাল পাথরের আটটা দেওয়াল। সম্রাট একটা দেওয়ালের গায়ে হাত দিতেই সেটো সরে গেল। আমরা সিড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেলাম। সিড়িঁর তখন অনেকগুলো টর্চ একসঙ্গে জ্বলছিল। তুমি বললে বিশ্বাস করবে না কী অদ্ভুত সেই জায়গাটা! হীরে, মুক্তো, মণি, ডহরৎ, পান্না, চুনি, দামি-দামি পাথরে একেবারে বোঝাই।

সম্রাট বললেন–এই আমার ধনরত্ন। এর অর্ধেক আপনার। আমি প্রতিজ্ঞা করছি। আমি আপনাকে উট দেব, উট চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার লোক দেব। আপনি আপনার অর্ধেক সম্পত্তি নিয়ে আজ রাত্রেই এই শহর ছেড়ে চলে যান। পৃথিবীর যেখানেই যান না কেন আমার। লোকজন আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে। কিন্তু আভ রাত্রিতেই আপনাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে। আমার শহরে এমন একডনি রয়েছেন যাঁকে আমি হত্যা করতে পারি নে এই কথাটা আমার পিতা সূর্যদেব জানতে পারুন তা আমি চাই নে।

বললাম-সোনা, রুপো, মূল্যবান সমস্ত পাথর যা এখানে রয়েছে তা সব তোমার। কিছুই আমার চাই নে। শুধু ওই ছোটো আংটিটা আমাকে দাও, ওই যেটো তুমি পরে আছ। তাহলেই। আমি চলে যাব।

সম্রাট ভ্রূকুটি করে বললেন–এটা তো সীসের আংটি। এর কোনো দাম নেই। তার চেয়ে আপনি বরং আমার অর্ধেক ধনরত্ন নিয়ে যান।

উহু! ওটা ছাড়া আর কিছুই আমি লেবু না। ওতে কী লেখা রয়েছে আর কী জন্যে লেখা রয়েছে তা আমি জানি।

সম্রাট কাঁপতে কাঁপতে বললেন–আমার অর্ধেক ধনরত্ন নিয়ে যান।

সেই শুনে আমি একটা অদ্ভুত কাজ করলাম। কিন্তু সেকথা থাকা আমি একটা গুহায় সেটা। লুকিয়ে রেখে এসেছি। ওটা হচ্ছে অর্থের আংটি। জায়গাটা এখান থেকে একদিনের যাত্রাপথ। এই আংটি যার হাতে থাকবে বিশ্বের সমস্ত ধন হবে তার। তুমি আমার সঙ্গে এসে সেটি গ্রহণ কর। বিশ্বের সম্পদ তোমার কারও হবে।

কিন্তু যুবক ধীরবটি হেসে বলল–অর্থের চেয়ে প্রেম অনেক বড়ো; এবং খুদে জল-অপ্সরীটি আমাকে ভালোবাসে। এই বলে সে সমুদ্রে ডুবে গেল। কাঁদতে-কাঁদতে ফিরে গেল আত্মা।

তৃতীয় বছরে শেষ হওয়ার পরে আত্মাটি আবার সমুদ্রোপকূলে ফিরে এসে ধীবরকে ডাকাল। ধীবর উঠে এসে ডিাসা করল–আমাকে ডাকছ কেন?

আত্মাটি বলল–আমার কাছে এস। আমি কত অদ্ভুত জিনিস দেখেছি। সে সব কথা তোমাকে আমি বলব। ধীবরটি অগভীর জলে এসে তার কাহিনি শোনার জন্যে হাতের ওপরে মাথাটা রেখে হেলান দিয়ে বসল।

আত্মাটি বলে গেল–আমি একটি শহরের কথা জানি, সেখানে নদীর ধারে একটা সরাইখানা রয়েছে। নাবিকরা সেখানে বসে দুটি বিপরীত-রঙা মদ্য পান করছিল, খাচ্ছিল বার্লির। রুটি–আর ভিনিগার মেশানো ছোটো ছোটো লোনা মাছ। তাদের পাশেই আমি বসেছিলাম। আমরা বসে-বসে ফুর্তি করছি এমন সময় একটি বৃদ্ধ এসে হাজির হল। তার হাতে একটি চামড়ার কার্পেট, আর দুটো অম্বরের শিং-ওয়ালা একটা বাঁশি। কাছে এসে সে কার্পেটটি বিছিয়ে সেই বাঁশির তারে পাখির একটা পালক দিয়ে আঘাত করল। সেই শব্দ শুনে ঘোমটায়। মুখ ঢেকে একটি বালিকা দৌড়ে এসে আমাদের সামনে নাচতে শুরু করল। তার পা দুটি ছিল অনাবৃত। ছোটো-ছোটো সাদা পায়রার মতো সে দুটি ঘুরতে লাগল। এমন অপরূপ নাচ ডীবনে আর কোনো দিনই আমি দেখিনি। যে শহরে মেয়েটি নাচে সেটি এখান থেকে একদিনের হাঁটাপথ মাত্র।

তার আত্মার কথা শুনে ধীবরের মনে হল তার প্রেমিকা অপ্সরীটির পা নেই। সে নাচতে পারে না। তাই হঠাৎ সেই নাচ দেখার প্রবল একটা ইচ্ছে হল তার সে নিজের মনে মনে। বলল–মাত্র একদিনের পথ। আমি আবার আমার প্রেমিকার কাছে ফিরে আসতে পারব। এই ভেবে একুট হেসে সে উপকূলের দিকে জল কেটে-কেটে এগিয়ে আসতে লাগল। শুকনো জায়গায় এসে একটু হেসে সে আত্মার দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিল। আনন্দে চিৎকার করে তাকে সম্পূর্ণ করার জন্যে তার দিকে দৌড়ে গেল আত্মা; তারপরে তার ভেতরে ঢুকে গেল। যুবক ধীবরটি দেখতে পেল বালির ওপরে তার দেহের ছায়াটি লম্বা হয়ে পড়ে রয়েছে; আর। সেইটিই হচ্ছে তার আত্মার দেহ।

আত্মাটি বলল–আর অপেক্ষা করে লাভ কি? চল, আমরা তাড়াতাড়ি পালিয়ে যাই। কারণ সমুদ্রের দেবতারা বড়োই হিংসুটে, তাদের আজ্ঞা পালন করার জন্য দৈত্যেরা দৌড়ে আসে।

সুতরাং তারা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল, চাঁদের আলোতে তারা সারারাত হাঁটল; সূর্যের আলোতে হাঁটল সারাটা দিন; তারপর সন্ধের সময় তারা সেই শহরে এসে হাজির হল।

যুবক ধীবরটি জিজ্ঞাসা করল–এই শহরেই কি সেই মেয়েটি নাচে?

তার আত্মাটি বলল–এটা নয়! আর একটা। যাই হোক, চল, ভেতরে যাই।

সুতরাং তারা ভেতরে ঢুকল। রাস্তার দু'পাশে ভতুরিদের দোকান। তারা দেখল দোকানের। ওপরে একটা সুন্দর রুপোর কাপ বসানো রয়েছে। তার আত্মা বলল–ওই কাপটা নিয়ে লুকিয়ে ফেল।

সে কাপটা নিয়ে পোশাকের মধ্যে লুকিয়ে ফেলল।

শহর থেকে এক লিগের মতো দূরে গিয়ে ভ্রূকুটি করে কাপটা দূরে ছুঁড়ে দিল; তারপরে আত্মাকে বলল তুমি আমাকে কাপটা নিয়ে লুকিয়ে ফেলতে বললে কেন? কারণ, একাজ করা অন্যায়-তাই না?

আত্মা বলল–শান্ত হও, শান্ত হও।

দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় তারা আর একটি শহরে এসে পৌঁছল। সে জিজ্ঞাসা করল–এই শহরেই কি সেই মেয়েটি নাচে?

তার আত্মা বলল–এই শহরে নয়। অন্য শহরে। তা হোক, চল, ভেতরে যাই।

সুতরাং তারা শহরে ঢুকলা চপ্পলের দোকানের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তারা দেখল এক কলসি জলের পাশে একটা ছেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আত্মা তাকে বলল–এই ছেলেটাকে মার।

সে ছেলেটিকে এমন মার মারল যে ছেলেটি কাঁদতে লাগল। ছেলেটিকে মেরেই তারা তাড়াতাড়ি শহর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

শহর থেকে এক লিগের মতো পথ গিয়ে যুবক ধীবরটি চটে গিয়ে বলল–তুমি আমাকে। ছেলেটিকে মারতে বললে কেন? এটা অন্যায় কাজ তা তুমি ভাল না?

কিন্তু আত্মাটি বলল–শান্ত হও, শান্ত হও।

তৃতীয় দিনের সন্ধ্যাকালে তারা একটি শহরে এসে উপস্থিত হল। যুবকটি ডিজ্ঞাসা। করল–এটা কি সেই শহর?

আত্মা বলল–মনে হচ্ছে যেন। চল, ভেতরে যাই।

সুতরাং তারা ভেতরে ঢুকে হাঁটতে শুরু করল। কিন্তু কোথাও সে কোনো নদী বা নদীর ধারে কোনো সরাইখানা দেখতে পেল না। শহরের লোকেরা তার দিকে কৌতূহলের দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে রইল। ভয় পেয়ে সে আত্মাকে বলল–চল, আমরা এখান থেকে চলে যাই; কারণ সাদা

পা যার সে-মেয়েটি এখানে নাচে না।

কিন্তু আত্মা বলল–না, আমরা এখানে অপেক্ষা করি এস। কারণ রাত অন্ধকার। রাস্তার ওপরে ডাকাতরা সব ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সুতরাং বাজারে সে বিশ্রাম নেওয়ার জন্যে বসে পড়ল। কিছুক্ষণ পরে, মাথার ওপরে উঁচুটুপি চাপিযে একজন বণিক সেইদিকে এল। তাতারী পোশাক তার গায়ে। বণিক তাকে বলল তুমি এই বাজারে বসে রয়েছে কেন? দোকান বন্ধ রয়েছে না?

যুবক ধীবর বলল–এই শহরে কোনো সরাইখানা দেখছি নে; অথবা, এমন কোনো আত্নীয়-স্বজন এখানে নেই যার বাড়িতে আমরা আশ্রয় পেতে পারি।

বণিকটি বলল—আমরা সবাই সকলের আত্মীয় বই কী? ঈশ্বরই কি আমাদের সবাইকে সৃষ্টি করেননি? সুতরাং আমার সঙ্গে এস; কারণ, আমার একটি অতিথি নিবাস রয়েছে। ধীবর উঠে দাঁড়াল; বণিকের পিছুপিছু তার বাড়িতে এসে হাজির হল। ঘরে ঢোকার পরে বণিক তাকে পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়ে অভ্যর্থনা করল, তৃষ্ণা মেটানোর জন্য এনে দিল পাকা তরমুভ। খেতে দিল একথালা ভাত আর একতাল সেদ্ধ মাংস।

খাওয়া-দাওয়ার পরে বণিকটি তাকে অতিথি-নিবাসে নিয়ে গেল, তারপরে তাদের ঘুমিয়ে পড়তে বলল। ধীবরটি তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাঁঠার লোমের কার্পেটে শুয়ে পড়ল। তারপরে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

সকাল হতে তখন ঘণ্টা তিনেক বাকি, বলতে গেলে তখনো রাত্রি রয়েছে। আত্মা তাকে জাগিয়ে দিয়ে বলল—ওঠ; বণিক যে ঘরে শুয়ে রয়েছে সেই ঘরে গিয়ে তাকে হত্যা করা তারপরে তার ধনরত্ন নিয়ে নাও। কারণ, ওটার প্রয়োজন রয়েছে আমাদের।

যুবক ধীরবটি উঠে গুঁড়ি দিয়ে বণিকের ঘরে হাজির হল। বণিকের পায়ের দিকে একটা বাঁকানো তরোয়আল পড়ে ছিল। হাত বাড়িয়ে সে তরোয়ালটা তুলে নিল। কিন্তু সেই মুহূর্তে বণিকটি জেগে উঠে বলল—উপকারের প্রতিদানে তুমি আমার এই অপকার করছ? তোমাকে যে দয়া আমি দেখিয়েছি তার পুরস্কার হিসাবে তুমি আমার রক্তপাত করছ?

আত্মা তাকে বলল তুমি ওকে আঘাত কর।

যুবক ধীবর বণিককে আঘাত করতেই সে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। তারপরে ধীবরটি তার নটা সোনার থলি নিয়ে চটপট বেরিয়ে এল তার বাড়ি থেকে। তখন সকাল হয়েছে।

শহর থেকে তারা এক লিগের মতো দূরে গিয়েছে এমন সময় যুবক ধীবরটি নিজের বুক চাপড়ে বলল–বণিককে আঘাত করে তার সোনা নিতে তুমি আমাকে বললেন কেন? নিশ্চয় তুমি আমার দুর্গ্রহ।

কিন্তু আত্মা বলল–শান্ত হও, শান্ত হও।

যুবক ধীবর চিৎকার করে বলল–না, আমি শান্ত হব না। তুমি আমাকে দিয়ে যা করালে সেসব কাজ করে নিজের ওপরে আমার ঘৃণা হচ্ছে তোমাকেও আমি ঘৃণা করি। তুমি আমাকে এই সব কাজ করাতে বাধ্য করলে কেন তা বলতে আমি তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছি।

তার উত্তরে আত্মা বলল–যখন তুমি আমাকে বিদায় দিলে তখন হৃদয়টা আমাকে তুমি দাওনি। সেই জন্যেই এই সব কাজ করতে আমার ভালো লাগছে।

যুবক ধীবর গজগজ করল–কী বলছ তুমি?

আত্মা উত্তর দিল-তুমিই তা ভালো জান। তুমি যে আমাকে হৃদয় দাওনি সেকথা কি তুমি ভুলে গিয়েছ? সুতরাং আমার কথা ভেবে তুমি অশান্তি ভোগ করো না। শান্ত হও। কারণ

এমন কোনো যন্ত্রণা নেই যা তুমি বিসর্জন দিতে পার না, এমন কোনো আনন্দ নেই যা তুমি পাবে না।

এই সব কথা শুনে কাঁপতে-কাঁপতে সে আত্মাকে বলল–উঁহু। তুমি দুর্গ্রহ। তুমি আমাকে। আমার ভালোবাসাকে ভুলতে বাধ্য করে। আমাকে প্রলুব্ধ করে। পাপের পথে পা দিতে আমাকে প্ররোচিত করেছ।

আত্মা বলল–আমাকে যখন তুমি পৃথিবীর বুকে ছেড়ে দিয়েছিলেন তখন যে তুমি আমাকে হৃদ্য দাওনি সেকথা তোমার ভুলে যাওয়া উচিত নয়। এস, অন্য এক শহরে আমরা যাই–সেখানে গিয়ে আনন্দ করি। আমাদের হাতে এখন ন'থলে সোনা রয়েছে।

কিন্তু যুবক ধীবর সেই ন'থলে সোনা নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে পা দিয়ে মাড়িয়ে দিল। তারপরে চিৎকার করে বলল–না, তোমাকে আমার আর প্রয়োজন নেই। তোমার সঙ্গে আর আমি কোথও যাব না। তোমাকে আগে একবার আমি যেমন বিতাড়িত করেছিলাম এখনো সেইরকম তাড়িয়ে দিচ্ছি। কারণ তুমি আমার কোনো দল করনি।

তবু আত্মা তার কাছ থেকে সরে গেল না বা তার কথায় কান দিল না, তাকে বলল–ডাইনি। তোমার ওপরে যে মোহ বিস্তার করেছিল তার মূল্য এখন আর কিছু নেই। কারণ, আমাকে তুমি পরিত্যাগও করতে পারবে না। তোমাকেও আমি ছেড়ে যাব না। মানুষ জীবনে একবার। মাত্র তার আত্মাকে বিসর্জন দিতে পারে; কিন্তু সেই আত্মাকে

যখন সে ফিরে পায় তখন সারা। জীবনই তাকে তার ধরে রাখতে হয়। শান্তি বা পুরস্কার যাই বল এইটিই তার প্রাপ্য।

যুবক ধীবরটি এই কথা শুনে বিবর্ণ হয়ে গেল, সে হাত দুটো মুঠো করে চেঁচিয়ে বলল–ডাইনি ঝুটা। সে আমাকে একথা বলেনি কেন?

আত্মা বলল–না, ডাইনি তার দেবতাকে পূজা করে। তাঁর প্রতি সে অবিশ্বাসিনী নয়, তাঁকেই সে চিরকাল সেবা করবে।

যুব ধীবরটি যখন বুঝতে পারল যে আত্মাকে আর সে বর্জন করতে পারবে না, আর সেই আত্মা তার মঙ্গলের প্রতীক নয়, এবং সে তার সঙ্গে চিরকাল থাকবে তখন সে মাটির ওপর লুটিয়ে পড়ে ভীষণভাবে কাঁদতে লাগল।

সকাল হলে যুবক ধীবর উঠে তার আত্মাকে বলল–যাতে তোমার নির্দেশ পালন করতে না হয় সেই জন্যে আমার হাত দুটো বেঁধে ফেলব; যাতে তোমার কথা মুখে উচ্চারণ করতে না হয় সেইজন্যে ঠোঁট দুটো আমি বন্ধ করে রাখব। যেখানে অল্মরী থাকে, যে আমাকে ভালোবাসে, আমি সেইখানেই ফিরে যাব। আমি কী অন্যায় করেছি, আর তুমি আমার কী ক্ষতি করেছ সে-সব কথা তাকে আমি বলব।

আত্মা তাকে প্রলুব্ধ করে বলল–তোমার প্রেয়সী কে যে তুমি তার কাছে ফিরে যাবে? তার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর হচ্ছে এই পৃথিবী। এখানে স্যামারিস নর্তকীরা রয়েছে,

তারা পাখি আর পশুদের মতো নাচতে পারে। তাদের পালি রঙ দিয়ে চিত্রিত; হাতে তাদের ছোটো-ছোটো তামার ঘন্টা। নাচতে-নাচতে তারা হাসে, তাদের হাসি জলের হাসির মতো। পরিচ্ছন্ন। আমার সঙ্গে এস; আমি তাদের দেখাব। যেটা পান করতে ভালো লাগে তার মধ্যে কি বিষ মেশানো থাকে? পাপ করে বলে চেঁচাচ্ছো কেন? বাজে চিন্তায় কষ্ট না পেয়ে আমার সঙ্গে আর একটি শহরে চল। কাছেই একটা ছোট্ট শহর রয়েছে। সেখানে টিউলিপ গাছের বাগান রয়েছ। এখানে অনেক ময়ুর রয়েছে। তাদের বুকগুলি সব নীল, সেখানে যে মেয়েটি তাদের খাওয়ায় সে মাঝে-মাঝে হাতের ওপরে নাচে, কখনো বা পায়ের ওপরে। তার নাকটি চড়াই পাখির ডানার মতো। নাচতে নাচতে সে হাসে; নাচার সময় তার নুপুরগুলি রুপোর ঘণ্টার মতো শব্দ করে। সুতরাং বাজে চিন্তা করে নিজেকে কষ্ট না দিয়ে আমার সঙ্গে সেই শহরে চল।

কিন্তু যুবকটি তার আত্মাকে কিছু না বলে ঠোঁট দুটি বন্ধ করে চোখ বুজে রইলা একটা শক্ত দড়ি দিয়ে বাঁধল তার দুটো হাত, যেখান থেকে এসেছিল সেইদিকে ফিরে গেল। তার আত্মা তাকে যতোই প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করুক না কেন সে কোনো উত্তর দিল না। সে তাকে দিয়ে যত অন্যায় কাজ করানোর চেষ্টাই করুক না কেন সেদিকে সে কোনো ভ্রূক্ষেপই করল না। এমনি তার প্রেম।

সমুদ্রের তীরে গিয়ে সে হাতের দড়ি খুলে দিল, ঠোঁট দুটো খুলল; তারপরে জল-অপ্সরীকে ডাকল। সারাদিন ধরেই তাক ডাকল সে; কিন্তু জল-অপ্সরী তার ডাকে সাড়া দিল না।

তখন আত্মা তাকে বিদ্রূপ করে বলল–এখন বুঝতে পারছ প্রেয়সীর কাছ থেকে কোনো আনন্দ পাওয়ারই সম্ভাবনা তোমার নেই। মৃত্যুর সময় ভাঙা কলসির ভেতরে যে মানুষ জল ঢালে তোমার অবস্থা সেই রকমই তোমার যা রয়েছে তাই তুমি বিলিয়ে দিচ্ছ প্রতিদানে কিছুই পাচ্ছ না তুমি আনন্দের উপত্যকা কোথায় রয়েছে তা আমি জানি, সেখানে কী রয়েছে তাও আমার অজানা নয। তাই আমার সঙ্গে আসাই তোমার ভালো।

কিন্তু যুবকটি কোনো উত্তর দিল না; পাহাড়ের ওপরে কঞ্চির একটা ঘর তৈরি করে সেখানে সে। বছর খানেক বাস করল। প্রতিটি দিন সকাল, দুপুর আর রাত্রি চব্বিশ ঘন্টাই সে জল-অপ্সরীকে ডাকত তবু সাগর থেকে উঠে কোনোদিনই সে তাকে দেখা দিল না। তার আত্মা প্রতিদিনই খারাপ কাজ করার জন্যে তাকে প্রলুব্ধ করতে লাগল, কিন্তু তাকে প্রলুব্ধ। করতে পারল না।

বছর খানেক পরে আত্মা ভাবল আমাকে প্রভুকে খারাপ কাজ করার জন্যে আমি প্রলুব্ধ করেছি; কিন্তু আমার চেয়ে তার প্রেমের শক্তি বেশি। আমি এখন তাকে ভালো কাজ করার জন্যে প্রলুব্ধ করব। তাহলে হয়তো সে আমার সঙ্গে আসে পারে।

এই ভেবে সে যুবক ধীবরকে বলল–বিশ্বে যত আনন্দ রয়েছে সে সব কথা আমি তোমাকে বলেছি। তুমি সেসব কথায় কান দাওনি। এখল জগতের দুঃখের কথা আমাকে বলতে দাও। তাহলে হয়তো তুমি তা শুনবে। কারণ সত্যি কথা বলতে কি যন্ত্রণাই হচ্ছে বিশ্বের সম্রাট। এমন কেউ নেই যে সে হাত থেকে বাঁচতে পারে। কারও কারও পরার পোশাক নেই, কারও নেই খাবার। এমন অনেক বিধবা রয়েছে যারা রক্তাক্ত হৃদয়ে বেঁচে

রয়েছে এমন অনেক পতিহীনা রয়েছে যারা ছিন্ন পোশাকে বসে থাকে; রাজপথের ওপর দিয়ে ভিক্ষুকরা ঘুরে বেড়ায়; তাদের টাকার থলি শূন্য। শহরের পথে-পথে দুর্ভিক্ষ ঘুর বেড়ায়; প্লেগ বসে রয়েছে তাদের ঘরের দরজায। এস, এদের দুঃখ আমর দূর করি। এখানে প্রেমিকাকে ডেকে ডেকে তুমি বৃথা সময়। নষ্ট করছ কেন? দেখতেই পাচ্ছ তোমার ডাকে সাড়া দিচ্ছে না অপ্সরী। তাছাড়া, প্রেমের দামই বা কী?

কিন্তু যুবক ধীবর কোনো উত্তর দিল না। তার প্রেমের শক্তি এতই বেশি চব্বিশ ঘন্টাই সে তার প্রেয়সীকে ডাকতে লাগল-সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা। কিছু অপ্সরীর দেখা সে পেল না। কোথাও সে তাকে দেখতে পেল না।

দ্বিতীয় বছর এইভাবে শেষ হওয়ার পরে একদিন রাত্রিতে নির্জনে আত্মা তাকে বলল–শোন; তোমাকে আমি অন্যায় কাজ করার জন্যে প্রলুব্ধ করেছি, প্রলুব্ধ করেছি ভালো কাজ করার। জন্যে। কিন্তু দেখছি, আমার চেয়ে প্রেমর শক্তিই তোমার কাছে অনেক বেশি। তাই তোমাকে আর আমি প্রলুব্ধ করব না। অনুরোধ করছি, আমাকে তোমার হৃদয়ে প্রবেশ করতে দাও। আগের মতোই তোমার সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে যাই।

যুবক ধীবর বলল–নিশ্চয়, নিশ্চয়। কারণ হৃদয়হীন হয়ে তুমি যখন বিশ্বে ঘুরে বেড়িয়েছিলে তখন নিশ্চয়ই খুব দুঃখ পেয়েছিলে।

আত্মা চিৎকার করে বলল–হায়, হায়! তোমার হৃদয় প্রেমে এমনই ভরাট হয়ে রয়েছে যে ঢোকার কোনো পথই যে আমি পাচ্ছি নে।

সে এই কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গে সমুদ্র থেকে বিরাট একটা আর্তনাদ উঠল। সমুদ্রের কোনো অধিবাসী মারা গেলে মানুষ এইরকম আর্তনাদ শুনতে পায়। এই শুনে যুবক ধীবর লাফিয়ে উঠল; তার কঞ্চির ঘর ছেড়ে দৌড়ে নেমে এল নীচে। কালোকালো ঢেউগুলি ঝাঁপিয়ে পড়ল। তীরের ওপরে। সঙ্গে নিয়ে এল বরফের চেয়ে সাদা একটি বস্তু। দেখে মনে হবে, তীরের ওপরে আছড়ে-পড়া সমুদ্র তরঙ্গ। তরঙ্গের ওপরে ফুলের মতো সেটা যেন আছাড় খেয়ে পড়ল। তাকে তরঙ্গ-শিশুরা তুলে নিল সমুদ্রের কাছ থেকে তাদের কাছ থেকে তাকে তুলে নিল ফেলারা। শেষ পর্যন্ত তাকে তুলে নিল উপকূলে তারপরে দেখা গেল ধীবরের পায়ের কাছে পড়ে রয়েছে জল-অপ্সরীর দেহটি-জল-অপ্সরীর মৃতদেহ।

যন্ত্রণায় পাগল হয়ে সে তার পাশে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার রক্তাক্ত ঠান্ডা ঠোঁটের ওপরে চুমু খেতে লাগল, তার সেই ভিজে সোনালি চুলগুলির ভেতরে আঙুল বোলাতে লাগল, বালির ওপরে লুটিয়ে পড়ে আনন্দ উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে সে কাঁদতে লাগল, দু'হাতে বুকের ওপর জড়িয়ে ধরল তাকে। তার ঠোঁট দুটি ঠান্ডা; তবুও সে তাকে চুম্বন করতে লাগল। তার চুলের স্বাদ নোনা। তবু একটা তিক্ত আনন্দে সে তাকে চুম্বন করল।

সেই মৃতদেহের কাছে সে তার পাপের স্বীকারক্তি করল। তিক্ত, তিক্ত তার আনন্দ; তার যন্ত্রণা একটি অদ্ভুত মাদকতায় উঠল ভরে।

কালো সাগর ক্রমশ তার কাছে এগিয়ে। কুষ্ঠরোগীর মতো সাদা ফেনা করতে লাগল বিলাপ ফেলার সাদা নখ দিয়ে সমুদ্র আঁচড়ে ধরল উপকূলকে। সমুদ্র সম্রাটের প্রাসাদ থেকে আবার বিলাপ ধ্বনি উঠল।

আত্মা বলল–পালাও, পালাও, সমুদ্র এগিয়ে আসছে। আর দেরি করলে ও তোমাকে হত্যা করে ফেলবে। পালাও, পালাও। তোমার মহৎ প্রেমের জন্যে, ভয় হচ্ছে, আমার প্রবেশের পথ হৃদয় তোমার রুদ্ধ করে দিয়েছে। নিরাপদ জায়গায় পালিয়ে যাও। নতুন জগতে নিশ্চয় তুমি আমাকে হৃদয়হীন অবস্থায় তাড়িয়ে দিতে চাও না।

কিন্তু যুবক ধীবর তার আত্মার আবেদনে সাড়া দিল না, সে অপ্সরীকে সম্বোধন করে বুলল–জ্ঞানের চেয়ে প্রেম মহর, সম্পদের চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান, নর্তকীর পায়ের চেয়ে। অনেক বেশি সুন্দর। আগুনে তাকে ধ্বংস করতে পারে না, জল পারে না তাকে নিঃশেষে পাল করতে। প্রভাতে তোমাকে আমি ডেকেছিলাম। সেই ডাক শুনে তুমি এসেছিলো চাঁদ তোমার নাম ডাকতে শুনেছিল; কিন্তু সে-ডাকে তুমি সাড়া দাওনি। কারণ অন্যায় কাজ করার জন্যে আমি তোমাকে ছেড়ে এসেছিলাম। এবং নিজের ক্ষতি করে আমি বিশ্বময় ঘুরে বেড়িয়েছি। তবু তোমার প্রেম আমার হৃদয়ে ভাস্বর হয়ে ছিল। যদিও আমি ভালো আর মন্দ দুই-ই দেখেছি, তবু কেউ তোমার প্রেম থেকে আমাকে বিচ্যুত করতে পারেনি। এখন তুমি মারা গিয়েছ। আমিও নিশ্চয় তোমার সঙ্গেই মারা যাব।

আত্মা তাকে নিরাপদে সরে যেতে অনুরোধ করলেও সে তার কথায় কর্ণপাত করল না। তার ভালোবাসা এতই বিরাট ছিল। সমুদ্র ধীরে-ধীরে কাছে আসতে লাগল তার ঢেউ দিয়ে তাকে গ্রাম করতে চাইল। যখন সে বুঝতে পারল তার সময় শেষ হয়ে আসছে তখন সে উন্মাদের মতো অপ্সরীকে চুমি খেতে লাগল; সেই দুঃখে ভেঙে যেতে লাগল তার হৃদযটা। প্রেমের প্রাচুর্যে তার হৃদযটা ভেঙে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ভেতরে ঢোকার সুযোগ পেল আত্মা-ভেতরে ঢুকে আগের মতোই ধীবরের সঙ্গে আবার এক হয়ে গেল। সমুদ্র এসে তার তরঙ্গ দিয়ে ঢেকে দিল তাকে।

প্রভাতে সমদ্রকে আশীর্বাদ করার জন্যে পাদরি এসে হাজির হলেন, কারণ, সমদ্র বেশ অস্থির হয়ে উঠেছিল। তাঁর সঙ্গে এলেন সন্ন্যাসী আর গাযকরা; আর এলো বাতিধারী কয়েকজন–আর এলো বিরাট একট দল। সমুদ্রের তীরে এসে দেখলেন যুবক ধীবরটি সমুদ্রের জলে ডুবে মরে রয়েছে; তাঁর হাত দুটি জড়িয়ে রয়েছে মৃত জল-অপ্সরীর দেহটিকে। কুটি করে তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন, তারপরে বললেন–এই সমুদ্র বা এই সমুদ্রের কোনো কিছুকেই আমি আশীর্বাদ করব না। সমুদ্রের বাসিন্দারা সব অভিশপ্ত, আর অভিশপ্ত তারা যারা এদের। সঙ্গে মেলামেশা করে আর সেই লোকটি যে তার ভালোবাসার জন্যে ঈশ্বরকে ভুলে। গিয়েছিল, এবং সেই ঈশ্বরের বিচারেই যে তার প্রণঘিনীর পাশে নিহত অবস্থায় পড়ে রয়ছে। তার দেহ আর তার প্রণয়িনীর দেহ এখান থেকে তুলে নিয়ে ফুলারাস-এর মাঠের এক কোণে কবর দাও। তাদের ওপরে কোনো চিহ্ন বা স্মৃতিস্তম্ভ থাকবে না। ওখানে কাদের কবর দেওয়া হয়েছে সেকথা কেউ যেন জানতে না পারে। কারণ বেঁচে থাকতেও তারা অভিশপ্ত ছিল, মৃত্যুতেও তারা তাই।

তিনি যা বললেন লোকেরা তাই করল। ফুলারাস-এর মাঠের এক কোণে যেখানে কোন শাকসজি জন্মাতো না, তারা গভীর গর্ত খুঁড়ে সেই মৃতদেহ দুটিকে শুইয়ে দিল।

তৃতীয় বছর শেষ হলে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের দিনে পাদরি গির্জায় গেলেন। ঈশ্বরের ক্ষত দেখানোর জন্যে সেখানে তিনি উপস্থিত হলেন। অনেক লোকও জমায়েত হয়েছিল সেখানে। ঈশ্বরের ক্রোধের সম্বন্ধে তাদের তিনি কিছু বলতে চেয়েছিলেন।

ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পোশাক পরে, তিনি গির্জায় ঢুকেলেন, বেদীর সামনে নোয়ালেন তাঁর মাথা। এমন সময় তাঁর চোখে পড়ল বেদীর ওপরে অদ্ভুত কতগুলি ফুল ছড়ানো রয়েছে। দেখতে সেগুলি কেবল অদ্ভুত-ই নয়-সৌন্দর্যও তাদের বড়ো অদ্ভুত। সেই সৌন্দর্য তাঁকে অস্থির করে তুলল। তাদের গন্ধ তাঁর নাকে ঢুকল। কারণটা বুঝতে পারলেন না বটে, কিন্তু তাঁর বেশ ভালো লাগল। গির্জার দরজা খুলে রঙিন চিঠির কাগজটা বার করলেন। তারপরে কাপড়ের মধ্যে সেটিকে জড়িয়ে ঈশ্বরের ক্রোধের কথা সমবেত জনতাকে বোঝাতে চাইলেন। কিন্তু সাদা ফুলগুলির সৌন্দর্য তাঁকে অস্থির করে তুলল। কিন্তু সে সব কথা তাঁর মুখ দিয়ে বেরোল না; যা বেরোল তা হচ্ছে প্রেমময় ঈশ্বরের কথা।

সেই কথা শোনার পরে সবাই অশ্রু বিসর্জন করল। গির্জার যে সব কর্মচারী কবর খোঁড়ার কাজ করে তাদের কাছে তিনি গেলেন। চোক দুটোতে তখন তাঁর জল ছাপিয়ে উঠেছে। নিম্নপদস্থ কর্মচারীরা এসে তাঁর ধর্মীয় পোশাকগুলি খুলে দিল। তিনি স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

পোশাক খোলার পর্ব শেষ হলে তিনি তাদের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন–দেবীর ওপরে যে ফুলগুলি ছড়ানো রয়েছে ওগুলি কী ফুল? কোথা থেকেই বা ওগুলি তোমরা সংগ্রহ করেছ?

তারা বলল–ফুলগুলি কী তা আমরা জানি নে, কিন্তু ওগুলি এসেছে ফুলারাস-এর মাঠ থেকে।

এই কথা শুনে পাদরি কেঁপে উঠলেন নিজের ঘরে গিয়ে প্রার্থনায় বসলেন।

পরের দিন প্রত্যুষে, সঙ্গীদের নিয়ে তিনি সমুদ্রের তীরে এসে হাজির হলেন; সমুদ্রকে আশীর্বাদ করলেন; সেই সঙ্গে আশীর্বাদ করলেন সমুদ্রে যারা বাস করে তাদেরও রোমক বনদেবতা, বনের মধ্যে যে সব ছোটো ছোটো প্রাণি নেচে-নেচে বেড়ায় তাদের আশীর্বাদ। করলেন–ঈশ্বরের সমস্ত সৃষ্ট প্রাণীদের মঙ্গলের জন্যে প্রার্থনা করলেন তিনি। জনতার মন আনন্দে ভরে উঠল। তারপর থেকে ফুলারাস-এর মাঠে আর কোনোদিন কোনো ফুল ফোটেনি; আগের মতোই জায়গাটা অনুর্বর রয়ে গেল। সামুদ্রিক প্রাণীরা আগের মতো সেই উপকূলে আর এল না–তারা অন্য উপকুলে চলে গেল।

নাইটিংগেল পাখি ও গোলাপ ফুল

The Nightingale and the Rose

একটি তরুণ ছাত্র আক্ষেপ করে বলল–মেয়েটি কথা দিয়েছে আমি যদি তাকে একটি লাল। গোলাপ এনে দিতে পারি তাহলে সে আমার সঙ্গে নাচবে। কিন্তু হায়রে, আমার সারা বাগানে একটি লাল গোলাপ নেই।

ওক গাছের ডালে বসে একটি নাইটিংগেল তার কথাগুলি শুনল; তারপরে সে পাতার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল।

ছেলেটির সুন্দর চোখ দুটি জলে টলটল করছে।

সারা বাগানে আমার একটিও লাল গোলাপ ফোটেনি। হায়রে, কত ছোট ছোট জিনিসের ওপরেই না মানুষের সুখ নির্ভর করে! জ্ঞানী মানুষেরা আজ পর্যন্ত যা কিছু লিখেছেন সে-সবই আমি পড়েছি; দর্শনশাস্ত্রের গোপন রহস্যটুকুও আমার জানা। তবু একটি লাল গোলাপের অভাবে আমার জীবন আজ নষ্ট হতে বসেছে।

নাইটিংগেল পাখি বলল–এতদিন পরে সত্যিকারের একজন প্রেমিকের দেখা পেলাম। আমি জানতাম না এই জন্যে রাতের পর রাত আমি প্রেমের গান গেযেছি। রাত্রির পর রাত্রি নক্ষত্রদের কাছে আমি এরই গল্প বলেছি। এখন সাস্কাতে দেখলাম একো এর চুলগুলি। কচুরিপানার ফুলের মতো কালো কুচকুচে, ঠোঁট দুটি কামনার গোলাপী রঙে

রাঙানো; কিন্তু উদগ্র কামনার বিবর্ণ হাতির দাঁতের মতো এর রঙ; গভীর একটা দুঃখ এর কপালে তার চিহ্ন এঁকে দিয়েছে।

যুবকটি বিড়বিড় করে বলল–কাল রাত্রিতে রাজকুমার নাচের আসর বসাবেন। আমার প্রেমিকা যাবে সেখানে নাচতে। আমি যদি তাকে একটা লাল গোলাপ দিতে পারি তাহলে সে আমার সঙ্গে সারা রাত নাচবো আমি যদি তাকে একটা লাল গোলাপ এনে দিতে পারি। তাহলে সে আমার বাহুর মধ্যে ধরা দিয়ে আমার বুকের ওপরে তার মাথাটা রাখবে; তার দুটি হাত আমার দুটির কাছে আত্মসমর্পণ করবে। কিন্তু আমার বাগানে কোনো লাল গোলাপ নেই তাই আমি নিঃসঙ্গ অবস্থায় বসে রয়েছি, সে আমাকে অগ্রাহ্য করে চলে যাবে, সে তাকাবে না আমার দিকে; আমার হৃদয় যাবে ভেঙে।

নাইটিংগেল বলল–এইতো আসল প্রেমিক। আমি যে দুঃখের গান গাই সেই দুঃখই এ ভোগ করছে; আমার কাছে যেটা আনন্দ, এর কাছে সেইটাই দুঃখ প্রেম কতই না আশ্চর্য বস্তু! এমারেলড-এর চেয়েও দামি, ওপ্যাল পাথরের চেয়েও ও প্রিয়। কোনো দামেই ওকে কেনা যায় না; হাটে-বাজারে ও-জিনিস বিকোয় না।

যুবকটি আক্ষেপ করতে শুরু করল নাচের মজলিসে বাজনাদারেরা বসে-বসে বাজনা বাড়াবে, সেই বাজনার সুরে-সুরে আমার প্রেমিকা নাচবো এম লঘু পদসঞ্চারে সে নাচবে যে মেঝের ওপরে তার পা-ই যাবে না দেখা। রাজপুরুষেরা ভিড় করে দাঁড়াবে তার চারপাশে, কিন্তু আমার সঙ্গে সে আর নাচবে না–আমি তাকে কোন লাল গোলাপ দিতে পারিনি।–এই বলে সে ঘাসের ওপরে মুখ লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদতে থাকো।

লেজ তুলে তার পাশ দিয়ে দৌড়ে যেতে-যেতে একটা সবুজ রঙের গিরগিটি হঠাৎ থেমে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল–ছেলেটা কাঁদছে কেন?

সূর্য-কণার উদ্দেশ্যে উড়তে উড়তে একটা প্রজাপতিও সেই একই প্রশ্ন করল–তাইতো, তাইতো!

একটা ডেইজি ফুল তার প্রতিবেশীকে জিজ্ঞাসা করল–ব্যাপারটা কী বল তো?

উত্তর দিল নাইটিংগেল–ও কাঁদছে লাল গোলাপের জন্যে।

সবাই চিৎকার করে উঠল-লাল গোলাপের জন্য? অবাক কাণ্ড! ওদের মধ্যে সবচেয়ে নৈরাশ্যবাদী বাচ্চা গিরগিটিটা হেসে উঠল হো-হো করে।

কিন্তু ছেলেটির দুঃখ কোথায় তা বুঝল নাইটিংগেল। ওক গাছের পাতার মধ্যে চুপটি করে বসে সে প্রেমের রহস্যের কথা ভাবতে লাগল।

হঠাৎ দুটো ডানা মেলে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল শন্যে; তারপরে হাওযার বকে উডতে লাগল। তারপরে ছায়ার মতো সে বাগানের ওপর দিয়ে গেল উড়ে ঘাসের জডিমের মাঝখানে একটি সুন্দর গোলাপ গাছ দাঁড়িয়ে ছিল। তারই পাশে গিয়ে সে বলল–আমাকে একটা লাল গোলাপ দাও।প্রতিদানে তোমাকে আমি আমার সবচেয়ে মিষ্টি গান শোনাব।

ঘাড় নেড়ে গোলাপ গাছটি বলল–আমার সব ফলই সাদা। সমুদ্রের ফেনার মতো সাদা। পাহাড়ে যে বরফ জমে থাকে এর রঙ তার চেয়েও সাদা। পুরনো সূর্য-ঘড়ির কাছে আমার ভাই রয়েছে। তুমি বরং সেইখানে যাও; তুমি যা চাইছে সে হয়তো তোমাকে তা দিতে পারে।

সূর্য-ঘড়ির কাছে গিয়ে নাইটিংগেল সেই গোলাপ গাছটিকে বলল–আমাকে একটি লাল গোলাপ দাও। প্রতিদানে আমি তোমাকে আমার সবচেয়ে মিষ্টি গান শোনাব।

গাছটি ঘাড় নেড়ে বলল–আমার ফুল হলদে-জল অপ্সরীদের কেশদামের মতো পীতবর্ণের, মাঠে-মাঠে যে ড্যাফোডিল ফুল ফোটে তাদের চেয়েও বেশি গীত। কিন্তু ওই ছাত্রটির জানালার ধারে আমার একটি ভাই থাকে। তার কাছে যাও, সে হয়তো তোমাকে লাল গোলাপ দিতে পারে।

ছাত্রটির জানালার নীচে যে গোলাপ গাছটি জন্মেছে নাইটিংগেল তার কাছে গিয়ে। বলল–আমাকে একটি লাল গোলাপ দাও। আমি তোমাকে আমার সব চেয়ে মিষ্টি গান শোনাব।

কিন্তু গাছটি ঘাড় নেড়ে বলল–আমার সব গোলাপই লাল-ঘুঘু পাখির পায়ের মতো। লাল-সমুদ্রের তলায় যে প্রবাল রয়েছে তার চেয়েও লাল। কিন্তু শীত আমার শিরাগুলিকে ঠান্ডায় জমাট বাঁধিয়ে দিয়েছে, আর ফোঁটার আগেই কুয়াশা নষ্ট করে দিয়েছে আমার

কুঁড়িগুলিকে। ঝড়ে ভেঙেছে আমার ডালা সারা বছরই আমার ডালে কোনো ফুল ফোটেনি।

নাইটিংগেল চিৎকার করেই বলল–আমি কেবল একটি লাল গোলাপই চাই–মাত্র একটি। সেটা পাওয়ার কি কোনো উপায় নেই?

গাছটি বলল–আছে। কিন্তু সেটি এত বিপজ্জনক যে বলতে আমি সাহস পাচ্ছি নে।

আমাকে বল। কোনো কিছু করতেই আমি ভয় পাব না।

গাছটি বলল–যদি তুমি লাল গোলাপ পেতে চাও তাহলে চাদর আলোয় গান গেয়ে তোমাকে তা তৈরি করতে হবেঃ রঙিন করে তুলতে হবে তোমার হৃদয়ের রক্ত দিযে। কাঁটার বুকে বুক ঠেকিয়ে আমাকে তোমার গান শোনাতে হবে। সারা রাত ধরেই গান গাইতে হবে তোমাকে সেটা প্রবেশ করবে তোমার হৃদয়ের গভীরে, তোমার হৃদয়ের রক্ত ঝরে-ঝরে আমার শিরায় প্রবেশ করে আমার নিজস্ব হয়ে উঠবে।

নাইটিংগেল চিৎকার করে বলল–একটা লাল গোলাপের জন্যে মৃত্য-দামটা বড়ো বেশি। হয়ে যাচ্ছে। জীবন সকলের কাছেই অত্যন্ত প্রিয়। সবুজ অরণ্যের মধ্যে বসে থাকা বড়ো মধুর, বসে-বসে সোনার রথে সূর্য আর মুক্তার রথে চাঁদকে ভেসে বেড়াতে দেখতে খুবই ভালো। লাগে। তবু জীবনের চেয়ে মহত্তর প্রেম; আর মানুষের হৃদয়ের কাছে পাখির হৃদযের দাম কতটুকু!

এই ভেবে তামাটে রঙের পাখা মেলে সে আকাশে উড়ে গেল।

যুবকটির ঘাসের ওপরে পড়ে কাঁদছিল;সে ফিরে এসে দেখল তার সুন্দর চোখ দুটির ওপর থেকে তখনও জলের দাগ মুছে যায়নি।

সে চিৎকার করে বলল–শান্ত হও। লাল গোলাপ তুমি পাবে। চাঁদের আলোতে বুকের রক্ত দিয়ে সারা রাত্রি গান করে তোমার জন্যে একটি লাল গোলাপ আমি সৃষ্টি করব। প্রতিদানে আমি কেবল এইটুকু চাই যে তুমি সত্যিকার প্রেমিক হবে, কারণ বিজ্ঞ দার্শনিকের চেয়েও প্রেম বি, ক্ষমতাশালীর চেয়েও প্রেমের ক্ষমতা অনেক বেশি।

মুখ তুলে তাকিয়ে ছেলেটি কথাগুলি শুনল; কিন্তু পাখিটি কী বলতে চাইছে তা সে বুঝতে পারল না; কী করে পারবে? বই-এ লেখা না থাকলে কোনো কিছুই সে বুঝতে পারে না।

কিন্তু ওক গাছ সবই বুঝতে পারল; এবং পেরে দুঃখিত হল। তার কোটরে নাইটিংগেল পাখি বাসা বেঁধেছিল। তাকে ওক গাছ সত্যিই বড়ো ভালবাসত।

ঝোঁপের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে ছেলেটি নিজের মনে-মনেই বলুল–মেয়েটির চেহারা যে নিখুঁত সে-বিষয়ে কারও কোনো সন্দেহ থাকা উচিত নয় কিন্তু অনুভূতি বলে তার কি কিছু রয়েছে? সেদিক থেকে আমার সন্দেহ যথেষ্ট। আসল কথাটা হচ্ছে অধিকাংশ আর্টিস্টের মতোই তার রয়েছে কেবল ভঙ্গিমা–আর সেটাই হল অন্তঃসারশূন্য। পরের

জন্য কোনোরকম আত্মত্যাগ সে করবে না। সে কেবল তার সঙ্গীতের কথাই চিন্তা করে আর সবাই জানে যে কলা মাত্রেই স্বার্থপর, কিন্তু তবু তার কণ্ঠস্বরটি যে বড়ো সুন্দর সেকথা স্বীকার করতেই হবে। কী দুঃখ! কণ্ঠস্বর অর্থহীন। কারও কোনো মঙ্গল তা দিয়ে হয় না।

আকাশে চাঁদ উঠতেই নাইটিংগেল পাখিটি সেই গোলাপ গাছের কাছে উড়ে এল। কাঁটার মুখে ঠেকিয়ে দিল তার বুক। সেইভাবে বুকটা রেখে সারা রাত্রি ধরেই সে গান গাইল। হেলে পড়ে সেই গান শুনতে লাগল চাঁদ। সারা রাত্রি ধরেই গান গাইতে লাগল সে। আর কাঁটাটা মুহূর্তে-মুহূর্তে তার বুকের মধ্যে ঢুকতে লাগল। একটু একটু করে ধীরে-ধীরে চুঁইয়ে-চুঁইয়ে শেষ হয়ে এল তার ধমনীর রক্ত গোলাপ গাছের ডালে একটি সুন্দর ফুল ফুটে উঠল।

কিন্তু গোলাপ গাছটির চিৎকার করে বলল–আরো জোরে, আরো জোরে? খুদে নাইটিংগেল! নতুবা, গোলাপ ফোঁটার আগেই সকাল হয়ে যাবে।

.

সুতরাং নাইটিংগেল আরো জোরে কাঁটার মুখে নিজের বুকটা চেপে ধরল, আর সেই সঙ্গে তার গান ডোরে থেকে জোরাল হয়ে উঠল।

প্রেমিকের চুম্বনে প্রেমিকার গণ্ডে যেমন লজ্জাবিধুর লাল আভা ছড়িয়ে পড়ে, গোলাপ ফুলের পাতার ওপরেও তেমনি মিষ্টি একটি লাল আভা ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু কাঁটাগুলি তখনও তার হৃদযের মধ্যে প্রবেশ করেনি। সেই জন্যে গোলাপের হৃদ্যটি তখনো সদাই রয়ে গেলঃ কারণ পাখিটির হৃদয়ের রক্ত না পেলে। গোলাপের হৃদয় রক্তবর্ণ ধারণ করবে না। একটা ভীষণ যন্ত্রণা তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। সেই যন্ত্রণা যতই বাড়তে লাগল ততই তার গান তীব্র থেকে তীব্রতর হতে লাগল; কারণ তার গান ছিল প্রেমের, যে প্রেম মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে সার্থক। কবরখানার মধ্যে তো প্রেমের বিনাশ হয় না।

এবং প্রভাতের মতো সেই অপরূপ গোলাপটি রঙিন হয়ে উঠল।

কিন্তু নাইটিংগেলের কণ্ঠস্বর স্ক্রীণ থেকে হক্কীণতর হয়ে এল; ঝপট করতে লাগল তার খুদে পাখা দুটি চোখের ওপরে নেমে এল অন্ধকারের ছায়া। তার গান অস্পষ্ট হতে লাগল; মনে হল তার গলাটা যেন আটকে আসছে।

তারপরে সে আর একবার জোরে গান গেয়ে উঠল। সাদা চাঁদ সেই গান শুনলো:প্রভাতের কথা ভুলে গিয়ে আকাশের গায়ে অপেক্ষা করতে লাগল। লাল গোলাপ সেই গান শুনল; আনন্দের আতিশয্যে হিল্লোল লাগল তার গায়ে শীতার্ত প্রভাতের বাতাসে সে তার পাপড়িগুলিকে দিল মেলে।

গোলাপ গাছ চিৎকার করে উঠল-দেখ, দেখ! গোলাপ ফোঁটা শেষ হল। কিন্তু নাইটিংগেল কোনো উত্তর দিল না। কারণ, লম্বা ঘাসের বনে, হৃদয়ে কাঁটা বিদ্ধ হয়ে সে মৃত অবস্থায় রইল পড়ে।

এবং দুপুরের দিকে ছাত্রটি তার জানালা খুলে বাইরে দিকে তাকাল। তারপরেই সে চিৎকার করে উঠল–কী ভাগ্য! এইতো এখানে একটা লাল গোলাপ! জীবনে এত সুন্দর লাল গোলাপ।

আর কখনো আমি দেখিনি। এটা এত সুন্দর যে মনে হচ্ছে এর একটি কোনো ল্যাটিন নাম রয়েচ্ছে। এই বলে ঝুঁকে পড়ে সে লাল গোলাপটি তুলে নিল। তারপরে মাথায় টুপিটা চড়িয়ে সেই গোলাপটি হাতে নিয়ে সে দৌড়ে গেল প্রফেসরের বাড়িতে।

প্রফেসরের কন্যা দরজার সামনে বসে নীল রঙের সিল্কের সুতো গুটাচ্ছিল তখন। তার বাচ্চা কুকুরটা শুয়েছিল তার পায়ের কাছে। ছাত্রটি চেঁচিয়েই বলল–তুমি বলেছিলে একটি লাল গোলাপ এনে দিলে তুমি আমার সঙ্গে নাচবে। এই সেই গোলাপ-তামাম দুনিয়ায় এর চেয়ে সুন্দর গোলাপ আর কোথাও তুমি পাবে না। এটি তুমি আজ আমার বুকের কাছে পরবে। আমরা যখন নাচবো তখন এটিই তোমাকে বলে দেবে আমি তোমাকে কত ভালবাসি।

ভ্রুকুটি করল মেয়েটি বলল–ভয় হচ্ছে আমার পোশাকের সঙ্গে এটি মানাবে না। আর তা ছাড়া চেম্বারলেন-এর ভাইপো আমাকে কয়েকটি আসল জহরৎ পাঠিয়েছেন। সবাই জানে জহরতের দাম ফুলের চেয়ে অনেক বেশি।

ছাত্রটি রাগ করে বলল–সত্যি বলতে কি বড়োই অকৃতজ্ঞ তুমি।

এই বলে ফুলটিকে সে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিল। সেইখানে গাড়ির চাকার নীচে পড়ে সে মিশে গেল মাটির সঙ্গে।

মেয়েটি বলল–অকৃতজ্ঞ! তুমি বড়ো অভদ্র তো! তাছাড়া তুমি এমন কি একটা বস্তু? মাত্র একজন ছাত্র। চেম্বারলেন-এর ভাইপোর মুক্তোর যে জুতোর লেস রয়েছে আমার বিশ্বাস তোমার সেটুকু সম্পদও নেই।

এই কথা বলে সে চেয়ার ছেড়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল।

ফিরে যেতে যেতে ছাত্রটি বলতে লাগল–ভালোবাসাটা কী বাজে জিনিস! লজিকের যা দাম রয়েছে, এর দাম তার অর্ধেকও নয়, কারণ, এ কিছুই প্রমাণ করে না। এ এমন সব কথা বলে যা কোনো দিন ঘটে না; মানুষকে এ এমন সব জিনিস বিশ্বাস করায় যা কোনো দিনই সত্যি হয়ে ওঠে না। আসল কথাটা হল প্রেম জিনিসটাই অবাস্তব; আর এ জগতে যা বাস্তব নয় তা কোনো কাজের নয়। তার চেয়ে আবার আমি দর্শন আর অধিবিদ্যা শাস্ত্রই পড়তে শুরু করি।

এই বলে নিজের ঘরে গিয়ে ধুলোমলিন বিরাট একটা বই বার করে পড়তে শুরু করল।

পরমাশ্চর্য রকেট

The Remarkable Rocket

রাজপুত্রের বিয়ে হবে। চারপাশে আনন্দের বান ডেকেছে। রাজপুত্র তাঁর কনের জন্য সারাটা বছর অপেক্ষা করেছেন। অবশেষে রাজকন্যা উপস্থিত হয়েছেন। ইনি হচ্ছেন রাশিয়ান। রাজকন্যা। ছটি বল্গা-হরিণের টানা স্লেজ গাড়িতে চেপে ফিনল্যান্ড থেকে সারা পথটা তিনি এসেছেন। গাড়িটাকে বিরাট একটা সোনালি হাঁসের মতো করে সাজানো হয়েছিল; রাজকুমারী বসেছিলেন সেই হাঁসের দুটি ডানার মধ্যে। আরমিনের লোম দিয়ে তৈরি ঢিলে জামাটা তাঁর পা পর্যন্ত ছিল ঝোলানো। তাঁর মাথার উপরে ছিল রুপোর সুতো দিয়ে তৈরি করা ছোটো একটা টুপি বরফের প্রাসাদেই চিরকাল তিনি বাস করতেন বলেই রঙটাও তাঁর ওই বরফের মতোই যেতাভ হয়ে উঠেছিল। তাকে এতই বিবর্ণ দেখাচ্ছিল যে রাস্তা দিয়ে। আসার সময় মানুষরা সব অবাক হয়ে তাকিয়ে বলছিল- আরে, ইনি যে একটি শ্বেত গোলাপ দেখছি।' এই বলে জানালা থেকে তাঁর ওপরে ফুল ছুঁড়ে দিয়েছিল।

দুর্গের প্রধান ফটকের কাছে তাঁকে স্বাগত জানানোর জন্য রাজকুমার অপেক্ষা করছিলেন। তিনি রাজকন্যার হাতে চুম্বন করে বললেন–তোমার ছবিটি বড়ো সুন্দর; কিন্তু তার চেয়েও সুন্দর তুমি।

একটি যুবক ভৃত্য তার প্রতিবেশীকে বলল–রাজকন্যা আগে শ্বেত গোলাপের মতো দেখতে ছিলেন; এখন তিনি দেখতে হয়েছেন রক্ত গোলাপের মতো। এই কথা শুনে উল্লসিত হয়ে উঠল সবাই।

পরের দিন লোকের মুখে কেবল ওই দুটি কথা–'শ্বেত গোলাপ, রক্ত গোলাপ, রক্ত গোলাপ, শ্বেত গোলাপ' রাজা খুশি হয়ে ভৃত্যের মাইনে দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিলেন। ভৃত্যটি কোনো মাইনে পেত না বলেই এই বেতন-বুদ্ধিতে তার কোনো ক্ষতি-বৃদ্ধি হল না; কিন্তু সবাই এটাকে পরম সম্মানের বস্তু বলে মন করল; রাজপুরীর গেজেটেও সেই সংবাদ প্রকাশিত হল।

তিন দিন পরে বিবাহ অনুষ্ঠিত হল। এটা অদ্ভুত একটি আনন্দোৎসব। ছোটো ছোটো মুক্তা। দিয়ে খচিত বেগুনে রঙের ভেলভেটের চাঁদোয়ার নীচে দিয়ে সদ্য বিবাহিত দম্পতি পরস্পর হাত ধরাধরি করে বেড়ালেন। তারপরে পাঁচদিন ধরে চলল স্টেট ব্যাংকোয়েটা রাজকুমার আর রাজকুমারী গ্রেট হল-এর শিখরে বসে স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ পেয়ালার একসঙ্গে মদ্যপান করলেন। কেবলমাত্র আসল প্রেমিক-প্রেমিকারাই এইরকমভাবে একই পাত্র থেকে মদ্য পান করার সৌভাগ্য রাখে। যারা তা নয় তাদের ঠোঁটের সপর্শে পাত্রটা বিবর্ণ হয়ে যায়।

সেই ছোট্ট চেহারার ভৃত্যটি বলল–এঁরা যে পরস্পরকে ভালোবাসেন সেই ভালোবাসা ওই স্ফটিকের মতোই স্বচ্ছ।

সেই শুনে মহারাজ আবার তার মাইনে দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিলেন।

সভাসদেরা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল–কী সম্মান! কী সম্মান!

ব্যাংকোয়েটের পরে শুরু হল ‘বল। দম্পতিদের সেখানে গোলাপ নৃত্য দেখানোর কথা। মহারাজ কথা দিলেন সেই নাচে তিনি বাঁশি বাজাবেন। বাজালেন তিনি খুবই জঘন্য; কিন্তু তিনি রাজা। সেকথা তাঁর মুখের ওপরে কে বলবে! সবাই তাই চিৎকার করে বলল–আহা-হা! চমৎকার!

এই কর্মসূচীর সমাপ্তি হচ্ছে বাজি দিয়ে। বিরাট আয়োজন হয়েছে তার। কাঁটায় কাঁটায় রাত্রি বারোটার সময় শুরু হবে এই বাড়ি ছোঁড়া। রাজকুমারী কোনো দিন আতশবাজির খেলা দেখেননি। তাই মহারাজ হুকুম দিলেন বিয়ের দিন আতশবাজিকর সব সময় উপস্থিত থাকবে।

রাজকুমারকে জিজ্ঞাসা করলেন রাজকুমারী–আতশবাজি কী?

যাকেই প্রশ্ন করা হোক, মহারাজ তার উত্তর দেবেনই। তিনি বললেন–ঠিক সুমেরুজ্যোতির মতো। তবে এটা হল একটু বেশি স্বাভাবিক। নক্ষত্রগুলি যখন ফুটে ওঠে তখন তাদের তুমি। দেখেছ। ব্যক্তিগতভাবে এইসব নক্ষত্রদের চেয়ে আমি আতশবাজিদের বেশি পছন্দ করি; কারণ তা আমার বাঁশি বাড়ানোর মতোই মধুর, তুমি নিশ্চয়ই তা দেখতে পাবে।

এইজন্যে রাজার উদ্যানের শেষ প্রান্তে বেশ বড়ো একটা মাচা বাঁধা হল। আর রাজা। আতশবাজির সব আয়োজন প্রস্তুত করে ফেললেন। সেই সময় বাড়িরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা শুরু করল।

বাচ্চা পটকাটা বলল–এই পৃথিবীটা সত্যিই বড়ো সুন্দর। ওই হলদে টিউলিপ ফুলগুলিকে দেখো বাহ! ওরা যদি সত্যিকারের ক্র্যাকার হত তাহলে কখনই এত সুন্দর হতে পারত না। আমি যে অনেক জায়গা ঘুরে বেড়িযোদু, সেজন্যে আমি খুশি। বিদেশ মণই মনকে অদ্ভুত ভাবে উন্নত করে, আর নষ্ট করে দেয় যাবতীয় কুসংস্কার।

বড়ো রোমান ক্যানডাল বলল–ওরে মূর্খ পটকা, রাজার বাগানটা বিশ্ব নয়। বিরাট বিশ্ব হচ্ছে–এটাকে ঘুরে-ঘুরে দেখতে তোমার তিন দিন লাগবে।

বিষণ্ন ক্যাথারিন হুইল বলল–যে-কোনো জায়গাই তোমার কাছে বিশ্ব।

এই হুইল প্রথম জীবনে একটা বাক্সের সঙ্গে জড়িত ছিল এবং হৃদযটা তার ভেঙে যাওয়ার জন্যে সে বেশ গর্বিত। সে বলল–কিন্তু আজকাল প্রেম এমন একটা প্রচলিত রীতিসম্মত নয়। কবিরাই একে জবাই করে ফেলেছে। তারা এই প্রেম নিয়ে এত কথা লিখেছে যে কেউ আর তা বিশ্বাস করতে চায় না। এবং আমি তাতে আশ্চর্যও হই না। সত্যিকার প্রেম দুঃখ পায় সে। কোনো প্রতিবাদ করতে চায় না। আমার একবার বেশ মনে রয়েছে...কিন্তু যাকগে। রোমান্স এখন আমার কাছে অতীতের বস্তু।

রোমান ক্যানডাল বলল–মূর্খ কোথাকার! রোমান্স কোনো দিন মরে না। চাঁদের মতো; চিরকাল ও বেঁচে থাকে।

কিন্তু ক্যাথারিন হুইল লিভের মতে অটুট; সে মাথা নেড়ে বলল–রোমান্স মৃত, মৃত, মৃত

যারা জানে একটা কথা বারবার বললে তা শেষ পর্যন্ত সত্যি হয়ে দাঁড়ায় এ হচ্ছে সেই জাতীয় বস্তু।

হঠাৎ একটা শুকনো তীক্ষ্ণ কাশির আওয়াজ হতেই সবাই সেই দিকে ঘুরে দাঁড়াল। কাশিটা। আসছিল একটা লম্বা উদ্ধত রকেটের কাছ থেকে। রকেটটা একটা লম্বা ছুড়ির শেষ কোণে বাঁধা ছিল। দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে কোনো কিছু বলার আগে সব সময়েই সে কাশে।

সে বলল–আহেম, আহেম–শোন।

শোনার জন্যে সবাই তার দিকে ঘুরে তাকাল–একমাত্র হতভাগ্য ক্যাথারিন হুইল ছাড়া। সে বেচারা তখনো নিজের ঝোঁকে মাথা নেড়ে নেড়ে বলছে-রোমান্স মরে গিয়েছে, মরে গিয়েছে।

চেঁচিয় উঠল ক্র্যাকার—'অর্ডার! অর্ডার!' তার মেজাজ অনেকটা রাজনীতিবিদদের মতো। স্থানীয় নির্বাচনে সে সব সময় বিশেষ অংশগ্রহণ করেছে। এই সব হেক্ষত্রে কি ধরনের পার্লামেন্টারি রীতি অনুসরণ করা যেতে পার তা সে জানে।

ক্যাথারিন হুইল ফিসফিস করে বলল—'মরে কাঠ হয়ে গিয়েছে।' এই বলেই সে ঘুমানোর আয়োজন করল।

সবাই চুপচাপ হয়ে গেল। রকেট তৃতীয়বার কেশে শুরু করল তার বক্তৃতা। তার বক্তৃতা অন্যদের ওপরে কী রকম প্রভাব বিস্তার করছে তা জানার জন্যে কথার ফাঁকে ফাঁকে সে অন্য সকলের ঘাড়ের ওপর দিযে উচিযে দেখতে লাগল। আসল কথাটা হচ্ছে তার ধরনটি। সত্যিকারের অভিভাত।

আকাশে যেদিন আমাকে ছুঁড়ে দেওযা হবে ঠিক সেইদিন রাজকুমারের বিযে। কী ভাগ্যবান তিনি!...কিন্তু রাজকুমাররা চিরকালই সৌভাগ্যবান!

পুঁচকে পটকাটা বলল–যা বাব্বা! আমি ভেবেছিলাম ব্যাপারটা ঠিক উল্টো। রাজকুমারের সম্মানে আমাদেরই ফাটানো হচ্ছে–এই ছিল আমার ধারণা।

রকেট বলল–ওটা তোমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে। হতে পারে বলছি কেন, হয়েছে; কিন্তু আমার বিষয়টা স্বতন্ত্র। আমি একটি অত্যাশ্চর্য রকেট; আমার পূর্বপুরুষরাও সত্যিকারের। অভিজাত। আমার মা ছিলেন সে-যুগের সবচেয়ে বিখ্যাত ক্যাথারিন হুইলা

সুষম নৃত্যের জন্যে তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। যেদিন তিনি প্রকাশ্যে বিরাট নাচের আসরে নামলেন সেদিন তিনি আকাশযাত্রা করার আগে উনিশ বার ঘুরে ঘুরে নেচেছিলেন, তিনি প্রতিবার বাতাসে সাতটি পাটলবর্ণের নক্ষত্র ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর কটিদেশের পরিমাণ ছিল সাড়ে তিন ফিট, আর শরীরটা ছিল সেরা গান-পাউডারে তৈরি। আমার বাবাও আমারই মতো রকেট ছিলেন; কিন্তু তাঁর ধমনীতে ছিল ফরাসি রক্ত। তিনি এত উঁচুতে উঠে যেতেন যে লোকেদের

ভয় হত আর বুঝি তিনি নামবেন না। কিন্তু তিনি নামতেন; আর নামার সময় সোনালি রঙের বৃষ্টিতে ভরিয়ে দিতেন চারপাশ। খবরের কাগজের সংবাদদাতারা তো মুহ্যমান হয়ে পড়তেন–তার সম্বন্ধে লম্বা লম্বা প্রশস্তি বার করতেন কাগজে। রাজার গেজেটেও বলা হত। পলিটেকনিক আর্টের বিজয় অভিযান ছিলেন তিনি।

বেঙ্গল লাইট বলল–কী বললে? ও; পাইরোটেকনিক বলছ বুঝি!

রকেট বেশ রুঢ় কণ্ঠে বলল–আমি বলেছি পলিটেকনিক।

এই শুনে বেঙ্গল লাইট এতই ঘাবড়ে গেল যে সে সঙ্গে সঙ্গে পুঁচকে পটকাটাতে দাঁত খিঁচোতে লাগল। নইলে, তার যে কিছু মূল্য রয়েছে তা বোঝানো যাবে কেমন করে?

রকেট শুরু করল–আমি বলছিলাম-কী বলছিলাম?

রোমান ক্যানডাল বলল–নিজের কথা বলছিলে।

নিশ্চয় নিশ্চয়। বেশ মনে পড়েছে আমি যখন একটি চিত্তাকর্ষক কাহিনি নিয়ে আলোচনা করছিলাম এমন সময় আমাকে অসভ্যের মত বাধা দেওয়া হয়েছিল। আমি এসব আদৌ পছন্দ করি নে; কারণ, বিশ্বের মধ্যে সপর্শকাতরতার দিক থেকে আমার জোড়া নেই।

রোমান ক্যানডালকে জিজ্ঞাসা করল ক্র্যাকার–স্পর্শকাতর কাকে বলে হে?

রোমান ক্যানডাল নীচু গলায় বলল–যে লোক নিজের পায়ে কড়া হয়েছে বলে ইচ্ছে করে অন্য লোকের পায়ের কড়া মাড়িয়ে দেয়।

এই শুনে আর একটু হলে ক্র্যাকার হো-হো হেসে উঠত। খুব সামলে নিল সে।

রকেট জিজ্ঞাসা করল–তুমি হাসছ কেন? আমি তো হাসছি নে।

ক্র্যাকার বলল–আমি সুখী বলেই হাসছি।

বেশ রাগ করেই রকেট বলল–আচ্ছা স্বার্থপর তো। সুখী হওয়ার কী অধিকার তোমার রয়েছে শুনি? অপরের কথা তোমার চিন্তা করা উচিত, অর্থাৎ, আমার কথাই তোমার চিন্তা করা উচিত। আমি সব সময়েই আমার কথা ভাবি: আমি আশা করি সবাই সেই কাজই করবে। এটা বড়ো সুন্দর গুণ। আমার মধ্যে এই গুণ অনেক পরিমাণে রয়েছে।

ধর, আজ রাত্রেই আমার যদি কিছু একটা হয়ে যায় তাহলে সেটাকে কি তোমরা নিজেদের দুর্ভাগ্য বলে মনে করবে না! রাজকুমার আর রাজকুমারী কেউ সুখী হবেন না। তাঁদের বিবাহিত জীবনটা নষ্ট হয়ে যাবে। মহারাডংও এই শোক ভুলতে পারবেন না। সত্যি কথা বলতে কি নিজের এই উঁচু মানের কথা আমি যখন ভাবি তখন আমারই চোখে জল আসে।

রোমান ক্যানডাল বলল–তুমি যদি অন্যদের আনন্দ দিতে চাও তাহলে নিজের পাউডার যাতে শুকনো থাকে সে বিষয়ে অবহিত হও।

এতক্ষণে বেঙ্গল লাইটের আগেকার অবস্থা ফিরে এসেছে। সে সমর্থনের স্বরে বলল–একশবার। এইটাই হচ্ছে কমনসেন।

ঘৃণার সঙ্গে রকেট বলল–তাই বটে! তুমি ভুলে যাচ্ছ যে আমি একডনি অসাধারণ আর অত্যাশ্চর্য প্রাণী। যার চিন্তা করার মতো ক্ষমতা নেই সে ছাড়া আর কারো কমনসেনস থাকবে কেন? কিন্তু আমার চিন্তা করার, কল্পনা করার শক্তি রয়েছেকারণ যা রয়েছে তার কথা আমি কোনোদিনই চিন্তা করি নো...আর শুকনো থাকার কথা যদি বল তাহলে একথা আমি বলতে পারি যে এখানে এমন কেউ নেই অনুভূতিপ্রবণতা কাকে বলে তা সে জানে। সৌভাগ্যবশত, আমি তা গ্রহ্য করি নে। আমাকে কেবল একটা জ্ঞানই সারা জীবন বাঁচিযে রেখেছে, সেটা হচ্ছে এই যে আমি ছাড়া অন্য সবাই যে নীচুস্তরের সেটা আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি তোমাদের কি হৃদয় বলে কোনো বস্তু রয়েছে! তোমরা সবাই হাসছ, আনন্দ করছ–যেন মনে হচ্ছে রাজকুমার আর রাজকুমারীর এই মাত্র বিয়ে হয়নি।

ছোটো একটা ফায়ার-বেলুন বলল–কেন নয়? আয়োজনটা তো আনন্দ করারই মতো। আমি যখন আকাশে উঠব তখন নক্ষত্রদেরও আমি এই আনন্দের কথাই তো বলব।

রকেট বলল–জীবনের সম্বন্ধে তোমার ধারণা কী তুচ্ছ! কিন্তু এছাড়া তোমার কাছে আর কীই বা আশা করব? তুমি শূন্যগর্ভ ভেতরে তোমার কিছু নেই। হয়তো একদিন রাজকুমার সস্ত্রীক কোনো গ্রামাঞ্চলে বেড়াতে যাবে। সেখানে হয়তো একটা নদী রয়েছে। নাম হয়তো তাদের একটি মাত্র পুত্রকে নিয়ে ঘুরতে বেরোবে; তারপর তাকে ছেড়ে দিয়ে গাছের তলায় ঘুমোবে; আর সেই সুযোগে ছেলেটা নদীতে ডুবে মারা যাবে! হতভাগ্যেরা তাদের একমাত্র সন্তানকে হারাবে। অহো! কী দুর্দৈব! কী ভয়ঙ্কর! আমি কোনো দিনই তা ভুলতে পারব না।

রোমন ক্যানডাল বলল–কিন্তু তারা তো তাদের কোনো সন্তানকে হারায়নি।

রকেট বলল–হারিয়েছে সেকথা বলছি নো বলছি, যদি হারায। হারালে, তার জন্যে দুঃখ করে লাভ নেই। যারা পড়ে যাওয়া দুধের জন্যে দুঃখ করে তাদের আমি ঘৃণা করি। কিন্তু তারা তাদের একমাত্র সন্তানকে হারাতে পারে এই ভেবে আমি দুঃখিত।

বেঙ্গল লাইট চিৎকার করে বলল–নিশ্চয়। আসল কথা হচ্ছে তোমার মতো চিরদুঃখী প্রাণী আমি আর কখনো দিখিনি।

রকেট বলল–তোমার মতো অভদ্র প্রাণীও আমি আর কখনো দেখিনি। আমার মধ্যে যে। বন্ধুত্বের আবেগ রয়েছে তা তুমি বুঝতে পারবে না।

রোমান ক্যানডাল দাঁত খিঁচিয়ে বলল–তুমি তো তাকে এখনো চেনই না হে।

রকেট বলল–চিনি যে সে কথা তো আমি বলিনি। চিনলে তো তার সঙ্গে আমার বন্ধুত্বই হত না। বন্ধুদের চেনা বড়ো বিপজ্জনক।

ফায়ার বেলুন বলল–তুমি বরং নিজেকে শুকনো রাখ হে। ওইটাই সবচেয়ে প্রয়োজনীয়।

রকেট বলল–ওটা নিঃসন্দেহে তোমার কাছে প্রয়োজনীয়। কিন্তু ইচ্ছে হলে আমি কাঁদব তো বটেই।

এই বলেই সে ভেউ-ভেউ করে কেঁদে ফেলল।

ক্যাথারিন হুইল বলল–লোকটা সত্যিকারের রোমান্টিক। যেখানে কাঁদার কিছু নেই সেখানেও কাঁদছে।

কিন্তু রোমান ক্যানডাল আর বেঙ্গল লাইট বিরক্তির সঙ্গে বেশ চেঁচিয়েই বলল–এ একটা হামবাগ!

এরা দুজনেই অত্যন্ত বাস্তবপন্থী। যা ওরা অপছন্দ করত তাকেই হামবাগ বলে চিহ্নিত করত।

ঠিক বারোটার সময় রাজা, রাজকুমার, রাজকুমারী, সভাসদবর্গ এবং অন্যান্য সবাই বেরিয়ে এলেন আতশবাজির খেলা দেখতে। রাজা বললেন–এবার শুরু করা

রাজার আতশবাজিকর মাথাটা নীচু করে অভিবাদন জানিয়ে বাগানের শেষ প্রান্তে চলে। গেল। তার সঙ্গে দু'জন সহকারী। তাদের প্রত্যেকেরই হাতে একটি করে জ্বলন্ত টর্চ লম্বা লাঠির ডগাঘ বাঁধা।

সত্যই বড়ো চমৎকার–বড়ো অদ্ভুত এইসব আতশবাজির খেলা।

হুইজ! উঠে গেল ক্যাথারিন হুইল। ওঠার সময় বন-বন করে ঘুরতে লাগল। বুম! বুম! করতে-করতে উড়ে গেল রোমান ক্যানডালা পুচকে পটকাটা চারপাশে ঘুরবার মতো নাচতে লাগল। বেঙ্গল লাইটগুলি চারপাশ লালচে করে দিল। ছোটো ছোটো নীল রং-এর আভা। ছড়িয়ে ফায়ার বেলুন আকাশে উড়ে যাওয়ার সময় বিদায় জানিয়ে গেল সবাইকে ব্যাও। ব্যাঙ! শব্দে ক্র্যাকাররা ফাটতে লাগল। মনে হল তাদের খুব মজা লাগছে। একমাত্র সেই অত্যাশ্চর্য রকেট ছাড়া আর সবাই বেশ সাফল্যের সঙ্গে সকলকে আনন্দ দিল। কেঁদে-কেঁদে রকেটটি এতই ভিড়ে গিয়েছিল যে তাকে কিছুতেই ওড়ানো গেল না। তার মধ্যে যেটা সবচেয়ে সেরা জিনিস ছিল সেটা হচ্ছে বারুদ। তার সব দরিদ্র বন্ধুবান্ধব যাদের সঙ্গে ঘৃণা ছাড়া আর কিছুর মাধ্যমেই সে কথা বলতে না তারা সবাই

আকাশে সোনালি ফুলের রোশনাই জ্বেলে সুন্দর ভাবে সফল হল। সভাসদেরা 'হুডা, হুজা' বলে আনন্দে চিৎকার করে উঠল। খুদে রাজকুমারী আনন্দে হাসতে লাগলেন।

রকেট বলল–আমার ধারণা আরো কোনো জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশের জন্যে ওরা আমাকে মজুত রেখেছে। নিঃসন্দেহে এর কারণটা হল তাই। এই ভেবে আগের চেয়ে সে বেশি দম্ভ অনুভব করল।

পরের দিন ভাযগাটা পরিষ্কার করার জন্যে বাগানে মজুররা হাজির হল। রকেট মনে করল। এরাই হচ্ছে প্রতিনিধি দল। আমি এদের বেশ ভারিক্কি চালে অভ্যর্থনা জানাব। এই ভেবে সে বাতাসে নাকটা উঁচিয়ে দিল; তারপর কটমট করে তাকিয়ে রইল তাদের দিকে, মনে হল সে সিরিয়াস কিছু একটা ভাবছে। চলে যাওয়ার আগে পর্যন্ত তারা তার দিকে কোনো নজরই দিল না। তারপরে একজনের চোখ তার ওপরে পড়তেই সে বলে উঠল–এটা একেবারে বাজে। এই

বলে সেটা তুলে নিয়ে দেওয়াল টপকে পাশের খানায় ফেলে দিল সে।

বাতাসের মধ্যে দিযে ঘুরতে-ঘুরতে সে বলল–বাজে-রকেট বাজে-রকেট? অসম্ভব! লোকে আমাকে আশ্চর্য রকেট বলে সম্বোধন করেছে। ও দুটো শব্দের অর্থ প্রায় একই। এই বলে সে। কাদার মধ্যে পড়ে গেল।

কাদার মধ্যে পড়ে সে মন্তব্য করল–জায়গাটা বেশ ভালো লাগছে না তো। এটা বোধ হয় উচ্চ সমাজের ভলকেলি করার জায়গা। স্বাস্থ্য উদ্ধার করার জন্যে তারা হয়তো আমাকে এখানে পাঠিয়েছে। আমার স্নায়ুগুলোও কেমন যেন দুর্বল হয়ে পড়েছে। আমারও বিশ্রামের দরকার।

তারপরে একটা বাচ্চা ব্যাঙ সাঁতরে উঠে এল। চকচক করছে তার চোখ দুটো।

ব্যাঙটা বলল–নতুন আমদানি বলে মনে হচ্ছে! যাই তোমরা বল, কাদার মতো জিনিস আর নেই। আমাকে বৃষ্টির জল আর খানা দাও। তাহলেই আমি খুশি।

রকেট বলল–'আহেম, আহেম'। তারপরেই সে কাশতে আরম্ভ করল।

চিৎকার করল ব্যাঙ-তোমার স্বরটা কী চমৎকার! ঠিক ব্যাঙের ডাকের মতো। সত্যি কথা বলতে কি ব্যাঙের ডাকের মতো মধুর সঙ্গীত পৃথিবীতে আর কিছু নেই। আমাদের ক্লাবে। আজ সন্ধেতে যে জলসা বসবে তা তুমি শুনতে পাবে। চাষীর বাড়ির পাশের যে পুরনো। ডাক-পুকুর রয়েছে সেখানে আমরা বসে থাকি আর চাঁদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে গা জুড়ে দিই। আমাদের গান এতই মধুর যে সবাই ডেগে-জেগে সেই গান শোনে। সত্যি কথা বলতে কি গতকালই আমার কানে গেল চাষীর মেয়েটা বলছে আমাদের জন্যে রাত্রে তার এ হয়নি। এইভাবে জনপ্রিয় হওয়াটা সত্যিই বড় সন্তোষজনক।

রকেট রেগে বলল–আহেম! আহেম!

তার বিরক্তির কারণ হচ্ছে কথা বলার একটুও সুযোগ সে পাচ্ছে না।

ব্যাঙ বলেই চলল-বড়ো মিষ্টি স্বর তোমার। আশা করি একদিন তুমি ডাক পুকুরে আসবে। আমার ছটা সুন্দরী মেয়ে রয়েছে। তাদের খুঁজতে যাচ্ছি। মিষ্টিজলের মাছটাকেই বড়ো ভয় করে। এও একটা দৈত্য বিশেষ। তাদের ধরে ধরে ব্রেকফাস্ট করতে ওর এতটুকু দ্বিধা হয় না। আচ্ছা, চললাম। আমি তোমাকে নিশ্চিত করে বলতে পারি আমাদের আলোচনাটা বেশ ভালোই লাগল।

রকেট বলল–আলোচনাই বটে! সারাক্ষণ তো তুমিই কথা বলে গেলো একে কি কথাবার্তা বলে?

ব্যাঙ বলল–একজনকে তো শুনতেই হবে। আমি নিজেই নিজের কথা বলতে ভালোবাসি। এতে সময় বাঁচে-তর্কের কচকচানিও শুনতে হয় না।

রকেট বলল–কিন্তু তুমি তর্ক ভালোবাসি।

ব্যাঙ সন্তুষ্ট মনে বলল–তর্কাতর্কি জিনিসটাই হচ্ছে অশালীন। কারণ ভদ্র সমাজে সকলেরই মতামত একই ধরনের। আবার বলছি বিদায। দুরে মেযেদের দেখতে পাচ্ছি।

এই বলে ব্যাঙ সাঁতার দিয়ে চলে গেল।

রকেট নিজের ভাবেই মাতোয়ারা হয়ে বলতে লাগল–তুমি একটি বিরক্তিকর অসভ্য জীব। যারা তোমার মতো নিজের কথাই বলে যখন অপরে আমার মতো নিজের কথা বলতে চায় তাদের আমি ঘৃণা করি। এইটাকেই আমি স্বার্থপরতা বলি। এটা আমার মতো লোকের কাছে খুব ঘৃণ্য কারণ আমার মনটাই হচ্ছে সংবেদনশীল। আমার কাছ থেকেই তোমার। শিক্ষালাভ করা উচিত...অবশ্য এসবের তুমি কিছুই জান না, কারণ তুমি একটি গেঁয়ো ভূত।

তামাটে রঙের লম্বা ঘাসের ওপরে একটা ফড়িং বসেছিল। সে বলল–তার সঙ্গে কথা বলে আর লাভ কী? সে তো চলে গিয়েছে।

রকেট বলল–তাতে ক্ষতি তারই হয়েছে। সে আমার কথা শুনল না বলেই আমি তার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করতে পারি নে। নিজের সঙ্গে কথা বলতে আমি সব সময়েই ভালোবাসি। মাঝে-মাঝে অনেকহ্ণ ধরে নিজের সঙ্গেই আমি নিজে কথা বলি; আর আমি এতই বুদ্ধিমান যে মাঝে-মাঝে আমি নিজে যা বলি তার একটি বর্ণও বুঝতে পারি নে।

তাহলে নিশ্চয় তোমার দর্শনশাস্ত্রের ওপর বক্তৃতা দেওয়া উচিত–এই বলে দুটি ডানা মেলে ফড়িংটা উড়ে গেল।

রকেট বলল–কী বোকা! চলে গেল। আমি নিশ্চিত যে নিজেকে উন্নত করার এরকম সুযোগ সে খুব একটা বেশি পাবে না। মরুক গে; আমার প্রতিভা একদিন না একদিন স্বীকৃত হবেই।–এই বলে কাদার মধ্যে আর একটু ডুবে গেল সে।

অনেকক্ষণ পরে সাঁতরাতে-সাঁতরাতে একটা সাদা পাতিহাঁস সেখানে এসে হাজির হল। তার পা দুটি হলদে, তার চলার বা ভাসার গতিটা বড়োই সুন্দর।

কোয়াক, কোয়াক, কোয়াক! কী অদ্ভুত চেহারা গো তোমার? জন্ম থেকেই কি তোমার এইরকম চেহারা? না, কোনো দুর্ঘটনায় পড়ে এইরকম হয়েছে?

রকেট বলল–তোমার কথা শুনে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে চিরকালই তুমি পাড়াগাঁয়ে বাস কর, তা না হলে, আমি কে তা তুমি বুঝতে পারতো যাই হোক, তোমার এই অজ্ঞতাকে আমি ক্ষমা করলাম। শুনলে তুমি খুশিই হবে যে আকাশে আমি উড়ে যেতে পারি; আর নেমে আসার সময় চারপাশে ছড়িয়ে দিই সোনালি বৃষ্টির ধারা।

পাতিহাঁস বলল–ওসব কথার খুব একটা দাম আমার কাছে নেই কারণ ওর কোনো প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে আমি মনে করি লো তুমি যদি ষাঁড়ের মতো লাঙল চষতে পারতে, অথবা ঘোড়ার মতো গাড়ি টানতে পারতে, অথবা কুকুরের মতো ভেড়ার দল পাহারা দিতে পারতে–তাহলেও তবু একটা কথা ছিল।

বেশ রাগত কণ্ঠেই রকেট বলল–বৎস, দেখতে পাচ্ছি তুমি নীচ জাতীযা। আমার মতো প্রাণীর কতকগুলি উঁচু ধরনের গুণ রয়েছে। সেগুলিই যথেষ্ট। উৎপাদক ডাতীয় কোনো জিনিসের ওপর আমার কোনো সহানুভূতি নেই; বিশেষ করে যে সব জিনিসের কথা তুমি। এইমাত্র বললে। আমার ধারণা, কঠোর পরিশ্রমের আড়ালে তারাই আশ্রয় নেয় যাদের আর কিছু করার নেই।

পাতিহাঁসের কারও সঙ্গেই কোনো বিরোধ নেই। সে বড়ো শান্তিপ্রিয় জীব। সে বলল–ঠিক আছে, বিভিন্ন মানুষের রুচি বিভিন্ন। যাই হোক, আশা করি এখানেই তুমি থেকে যাচ্ছ?

রকেট বলল–না, না। আমি এখানে একটি সম্মানিত অতিথিমাত্রা সত্যি কথা বলতে কি জায়গাটা আমার মোটেই ভালো লাগছে না। এখানে সমাড বা নিউলতা কোনোটাই নেই। সম্ভবত আমি রাজসভাতেই ফিরে যাব। কারণ আমি জানি বিরাট একটা আলোড়ন সৃষ্টি করতেই আমার জন্ম হয়েছে

পাতিহাঁস বলল আমি নিজে একবার পাবলিক লাইফ-এ ঢোকার চেষ্টা করেছিলাম। দেখলাম সেখানে অনেক কিছু সংস্কার করার প্রযোজনীয়তা রয়েছে। একবার একটা সভায়। সভাপতি হয়েছিলাম। আমরা যা পছন্দ করিনে সে সব বিষয়কে নিন্দা করে সেখানে আমরা অনেকগুলি প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলাম। তাতে কিছু লাভ হয়নি। এখন আমি গৃহকর্মে চললাম।

রকেট বলল–আমার জীবন কিন্তু জনসেবায় উৎসর্গীকৃত। আমার আত্মীয়-স্বজনরাও তাই–এমন কি তাদের মধ্যে সবচেয়ে যে দরিদ্র সে-ও। আমরা প্রকাশ্যে এসে দাঁড়ালেই সকলের দৃষ্টি আমাদের ওপরে গিয়ে পড়ে। আমি অবশ্য এখনো প্রকাশ্যে আবির্ভূত হয়নি। হলে একখানা দারুণ আলোড়ন পড়ে যাবো আর ঘর-সংসারের কাজ? ওর মধ্যে মাথা গলালেই বুড়িয়ে যায় মানুষ। উঁচু আদর্শ থেকে বিচ্যুত হতে হয়।

পাতিহাঁস বলল–উঁচ আদর্শই বটে। আর এই আদর্শের জন্য কত অনাহাবেই না থাকতে হয়েছে–এই বলে 'কোযাক-কোয়াক'করে ডাকতে-ডাকতে সে মাঝ দরিযার দিকে সাঁতার কেটে বেরিয়ে গেল। রকেট প্রায় কেঁদে ফেলে আর কি। চেঁচাতে লাগল সে-ফিরে এস, ফিরে এস তোমাকে আজ একটা বড়ো আদর্শের কথা শোনাব।

আর বড়ো আদর্শ! সে তখন অনেক দূরে।

রকেট তখন নিজের মনে-মনেই বলল–যাকগে। ভালোই হয়েছে। ওর মনটা যে মধ্যবিত্ত সেদিক থেকে আমি নিশ্চিত।

এই বলে সে কাদার আর একটু নীচে ডুবে গোল; ভাবতে লাগল এ-দুনিয়ায় প্রতিভার নিঃসঙ্গতার কথা। ঠিক এমনি সময় কয়েকটা সাদা ঢিলে জামা পরে, একটা কেতলি আর কিছু জ্বালানি কাঠ নিযে কয়েকটা বাচ্চা ছেলে সেই দিকে ছুটে এল।

রকেট ভাবল-এরা বোধ হয় একদল প্রতিনিধি।

এই ভেবে নিজেকে সে সম্ভ্রান্ত করে তোলার চেষ্টা করল।

একটা ছেলে চিৎকার করে উঠল-দেখ, দেখ, এটা একটা ওলড়স্টিক। এ এখানে এল কি ক'রে বল তো?

এই বলে গর্তের ভেতর থেকে রকেটটাকে টেনে বার করল।

রকেট ভাবল—'ও-ল-ড'! অসম্ভব! ওরা নিশ্চয় বলেছে 'গো-ল-ড স্টিক'। 'গোলড' শব্দটা বড়োই প্রশংসাসূচক!

আর একটা ছেলে বলল–ওটাকে পুড়িয়ে ফেলি আয়। কেতলিটা ফুটবে ভালো।

এই কথা বলে জ্বালানি কাঠগুলো একসঙ্গে ভড় করে রকেটটাকে তাদের ওপরে বসাল; তারপরে আগুন ধরিয়ে দিল।

রকেট বেশ উল্লসিত হয়ে বলল–চমৎকার, চমৎকার। যাতে সবাই আমাকে দেখতে পায় এই উন্যে এরা আমাকে দিনের বেলাতেই ফাটাচ্ছে।

ছেলেরা বলল–এখন ঘুমিয়ে পড়ি আয়। ঘুম থেকে উঠে দেখবি ডল গরম হয়ে গিয়েছে।

এই বলে তারা সটান ঘাসের ওপরে শুয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলল।

রকেটটা ভিজে থাকায় শুকনো হতে একটু সময় নিল। তারপরে পুড়তে শুরু করল।

সে চিৎকার করে বলল–এখন আমি উড়ছি। আমি জানি নক্ষত্র বা চাঁদের চেয়েও উঁচুতে উঠব আমি সত্যি কথা বলতে কি আমি এত উঁচুতে উঠব যে–

ফিড-ফিজ-ফিজ! তারপরেই সে আকাশে উড়ে গেল।

নিজের মনেই সে চিৎকার করে উঠল-সুন্দর, সুন্দর! চিরকাল আমি এইভাবে উড়ব।

কিন্তু কেউ তাকে দেখল না।

তারপরেই সে সারা শরীরে একটা তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করল।

সে চিৎকার করে উঠল–এখন আমি ফেটে যাব। সমস্ত পৃথিবীর ওপরে আগুন জ্বালিয়ে দেব আমি। এমন সাড়া জাগাব যে একটা বছর মানুষ আর কোনো কথা নিয়ে আলোচনা করবে না। আর সত্যিই সে ফাটল। ব্যাঙ, ব্যাঙ, ব্যাঙ। বারুদ ফাটছে।

কিন্তু কেউ সেই শব্দ শুনতে পেল না। এমনকি সেই বাচ্চা ছেলেদেরও ঘুম ভাঙল না।

বাকি রইল কেবল একখানা ছড়ি। সেটা গিয়ে পড়ল একটা হাঁসের পিঠে হাঁসটা তখন খানার ধারে ধীরে ধীরে বেড়াচ্ছিল।

হাঁসটা চিৎকার করে উঠল-হা ঈশ্বর! আজ কি ছড়ি বৃষ্টি হবে?

এই বলে সে দৌড়ে জলের ওপরে নেমে গেল।

রকেটটা হাঁপাতে হাঁপাতে বলল–'আমি জানতাম, আমি একটা বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করব।'

এই কথা বলেই সে শেষবারের মতো নিবে গেল।

যুবক রাজা

The Young Prince

রাজ-অভিষেকের আগের রাত্রি যুবক রাজা তাঁর সুন্দর ঘরে একা বসে রয়েছে। যুগের প্রথা অনুযায়ী সভাসদেরা তাঁকে আভূমি প্রণাম করে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গিয়েছেন। সেখান থেকে রাজপ্রাসাদের 'গ্রেটহল'-এ তাঁরা জমায়েত হয়েছেন-রীতি শিক্ষার বিখ্যাত অধ্যাপকের কাছ থেকে রীতি সম্বন্ধে কিছু বক্তৃতা শোনার জন্যে। সভাসদদের মধ্যে এমন কিছু মানুষ ছিলেন সভার আদব-কায়দাটাকে তখনো যাঁরা রপ্ত করতে পারেননি এবং আমার ধারণা, যে কোনো সভাসদের কাছে এটি একটি অমার্জনীয় অপরাধ।

সভাসদেরা চলে যাওয়ার ফলে বালকটির–সত্যিই বালক ছাড়া আর কিছু নন তিনি–ষোল বছরের যুবককে আর কী বলা যেতে পারে– কোনো দুঃখ হল না। একটি নরম সোফার ওপরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে গা এলিয়ে দিলেন তিনি। অরণ্যবাসী কোনো দেবতার মতো খুলে দিলেন তাঁর বিস্মিত দুটো চোখ আর ঠোঁট; শিকারির জালে আটকে পড়া নতুন কোনো জন্তুর মতো অবাক বিস্ময়ে তিনি তখন তাকিয়েছিলেন।

আর সত্যি কথাই তো! তিনি যখন বাঁশি হাতে নিয়ে একটি মেষপালকের যাকে তিনি নিজের বাবা বলেই জানতেন–মেষের পাল নিয়ে চরাতে বেরিয়েছিলেন ঠিক সেই সময় হঠাৎ শিকারিরা তাঁকে ধরে নিয়ে আসে। শোনা যায়, একদিন একটি যুবক-অনেকের

মতে বিদেশি-বাঁশি বাজিয়ে বৃদ্ধ রাজার কন্যাকে মুগ্ধ করেছিল। আবার কেউ কেউ বলে যুবকটি বিমিনি থেকে এসেছিল। পেশায় সে ছিল চিত্রকর। তার সাংসারিক অবস্থা সাধারণ হলেও, রাজকুমারী তাকে যথেষ্ট সম্মান দিয়েছিলেন-ততটা সম্মান তার নাকি পাওয়ার কথা ছিল। না। তারপরে গোপনে সে রাজকুমারীকে বিয়ে করে। এই যুবকটি তাদেরই পুত্র। তারপরে হঠাৎ একদিন গির্জার কাজ অসমাপ্ত রেখেই চিত্রকরটি কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়। শিশুটির বয়স তখন সাত দিনও হয়নি। তার মা তখন ঘুমোচ্ছিলেন। সেই সময় বৃদ্ধ রাজার বিশ্বস্ত একটি অনুচর তাকে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে পাহাড়ের নীচে একটি অপুত্রক কৃষক দম্পতির বাড়িতে পোঁছে দিয়ে আসে। দুঃখে জর্জরিত হয়ে, না, তীব্র এক পেয়ালা ইতালিয়ান বিষপান করার জন্যে-খবরটা কেউ জানে না–ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে রাজকুমারীর মৃত্যু হয়। যে সময়ে রাজার বিশ্বস্ত অনুচর তাঁর শিশুপুত্রটিকে নিয়ে দূরে পাহাড়তলীতে কৃষক দম্পতির দরজায় ধাক্কা দিচ্ছিল ঠিক সেই সময়ে আজ একদল লোক রাজকুমারীর মৃতদেহটি নিয়ে একটি পরিত্যক্ত সমাধি ক্ষেত্রে উপস্থিত হল। সেখানে আগে থেকে কবর একটা খোলাই ছিল। সেইখানেই তাঁকে কবর দেওয়া হল। লোকমুখে শোনা যায় ওরই মধ্যে আর একটি যুবককে কবরস্থ করা হয়েছিল। যুবকটি বিদেশি কিন্তু অপরূপ সুন্দর। তার দুটি হাত পিঠমোড়া করে বাঁধা; আর বুকের ওপরে অনেকগুলি রক্তাক্ত ক্ষতচিহ্ন।

অন্তত এই রকমই একটা কাহিনি ওই অঞ্চলে লোকের মুখে প্রচলিত ছিল; তবে তারা এই নিয়ে কোনোদিনই একটা হইচই করেনি। তারপরে এটাও নিশ্চিত বৃদ্ধ রাজা মৃত্যুশয্যায় তাঁর মত পরিবর্তন করেছিলেন। হয় নিজের পাপ কাজের জন্যে তিনি অনুতপ্ত হয়েছিলেন অথবা রাজসিংহাসন বাইরের কারও হাতে চলে যায় তা তিনি

চাননি। সেইজন্যেই অনুচরদের পাঠিয়ে এই যুবকটিকে ধরে এনে পাত্রমিত্র সভাসদদের সামনে এঁকে রাজার পদে অভিষিক্ত করেছিলেন।

তাঁকে দেখে মনে হয় রাজার স্বীকৃতি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মধ্যে সৌন্দর্যের প্রতি যে অপূর্ব একটা স্পৃহা ছিল—আর যেটা ভবিষ্যতে তাঁর ওপরে অভাবিত প্রভাব বিস্তার করার সম্ভাবনা নিয়েছিল—সেই আশঙ্কা তাঁর দেহের অণুতে-অণুতে প্রতিবিম্বিত হয়ে উঠেছিল। যারা তাঁর সঙ্গে থাকত তাদের মুখে শোনা যায় কী এক অপূর্ব আনন্দে দিশেহারা হয়ে তিনি সুসজ্জিত। একটি প্রকোষ্ঠ থেকে আর এক প্রকোষ্ঠে ছুটে বেড়াতেন। অরণ্যজীবনের স্বাধীনতা থেকে তিনি বঞ্চিত হয়েছিলেন বটে, রাজসভার অজস্র কৃত্রিমতা তাঁকে যে মাঝে-মাঝে ব্যথা দিত সেকথাও মিথ্যে নয় কিন্তু রাজসভার দায় থেকে মুক্তি পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে বিপুল আনন্দে তিনি প্রাসাদের মধ্যে ছোটাছুটি করতেন। এই রাজপ্রাসাদটি তাঁর কাছে নব-আবিষ্কৃত সাম্রাজ্যের মতো মনে হয়েছিল।

এই সময়ে যদিও রঙদার পোশাক পরা চাপরাশির দল তাঁর পেছনে-পেছনে ঘুরে বেড়াত, তবুও অনেকটা সময়ই তিনি একা থাকতেন। এই সময়েই তিনি স্বর্গীয় আনন্দ পেতেন, এ থেকে এইটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে সমস্ত কলা গোপনে শিক্ষা করাই প্রশস্ত; আর সমস্ত জ্ঞানের মতো সৌন্দর্যকেও নিঃসঙ্গ পূজারীরাই ভালোবাসে বেশি।

যা কিছু দুষ্প্রাপ্য, আর যা কিছু মূল্যবান সে সব জিনিসের ওপরেই নিশ্চয় তাঁর একটা তীব্র আকর্ষণ ছিল। সেই সব জিনিস সংগ্রহ করার জন্যে তিনি চারপাশে লোক পাঠাতে লাগলেন। কাউকে পাঠালেন উত্তর সাগরের জেলেদের কাছে; রাজাদের কবরের তলায়

যে সমস্ত অদ্ভুত–অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন সবুজ রঙের মূল্যবান পাথর থাকে সেগুলি তুলে আনতে কাউকে পাঠালেন ইজিপ্টে, কাউকে পাঠালেন সিল্কের কার্পেট আনতে পারস্যে, আবার চন্দন কাঠ আর সুন্দর পশমের তৈরি শাল সংগ্রহ করতে পাঠালেন ভারতবর্ষে।

কিন্তু যে পোশাকটি পরে তাঁর রাজ্যাভিষেক হবে সেইটি নিয়েই তিনি চিন্তা করছিলেন সবচেয়ে বেশি। সেই সঙ্গে ছিল রুবি দিয়ে গাঁথা মুকুট আর মুক্তোর বুটি দিয়ে তৈরি করা লম্বা রাজদণ্ডটি। খোলা চুল্লির ভেতরে যে পাইন কাঠের গুঁড়ি জ্বলছিল সেদিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে বেশ আরামপ্রদ সোফার ওপরে শরীরটা এলিয়ে দিয়ে বিশেষ করে সেদিন তিনি তাদের কথাই ভাবছিলেন। সে যুগের দেশ-বিখ্যাত চিত্রকরদের নক্সা কয়েক মাস আগেই অনুমোদনের জন্যে তাঁর কাছে দেওয়া হয়েছিল; তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন যে নক্সা মতো কাজ শেষ করার জন্যে চিত্রকররা যেন দিনরাত্রি পরিশ্রম করে, আর এদের উপযুক্ত মণিমুক্তা আহরণের জন্যে আহরকেরা যেন সারা বিশ্বের ভাঁড়ার তন্নতন্ন করে অনুসন্ধান করে। কল্পনায় তিনি দেখতে পেলেন রাজার সুন্দর পোশাক পরে তিনি যেন গির্জার বিরাট বেদীর কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাঁর সেই শিশুর ঠোঁটে হাসি উঠেছে ফুটে আর তাঁর সেই অরণ্যক দৃষ্টির ওপরে ঝলকে পড়েছে একটি উজ্জ্বল জ্যোতি।

একটু পরেই সোফা থেকে উঠে চিমনির গায়ে হেলান দিয়ে সেই ঘরের দিকে তাকালেন তিনি। ঘরের ভেতরে আলোর বেশি জেল্লা ছিল না। দেওয়ালগুলি মূল্যবান পর্দায় ছিল ঢাকা; তাদের ওপরে আঁকা ছিল ট্রায়াম্প অফ বিউটির ছবি। বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলেন গির্জার বিরাট গম্বুজটি অন্ধকারাচ্ছন্ন বাড়িগুলির ওপর দিয়ে বুদ্বুদের মতো

দাঁড়িয়ে রয়েছে। কুয়াশায় ঢাকা নদীর চরে প্রহরীদের টহল দেওয়ার পদধ্বনি তাঁর কানে এল। অনেক দূরে বাগানে কোথায় একটা নাইটিংগেল পাখি গান করছিল। সে-সুরও তিনি শুনতে পেলেন। খোলা জানালার ভেতর দিয়ে যুঁইফুলের অস্পষ্ট একটা গন্ধ ভেসে আসছিল। তাঁর চোখ দুটি ভারী হয়ে এল; অদ্ভুত একটা আলস্য গ্রাস করে ফেলল তাঁকে। গম্বুজের ঘড়ি থেকে মধ্যরাত্রি ঘোষিত হল। তিনি একটি বেল বাজালেন। চাকররা এসে কেতাদুরস্ত-ভাবে তাঁর পোশাক পরিবর্তন করল, গোলাপজল দিয়ে ধুইয়ে দিল তাঁর হাত, তাঁর বালিশের ওপরে ছড়িয়ে দিল ফুল। চাকররা চলে যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লেন তিনি।

তারপরেই তিনি স্বপ্ন দেখতে লাগলেন এবং এটি তাঁর নিজেরই স্বপ্ন।

মনে হল তিনি যেন একটি নীচু লম্বা চিলেকোঠার ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। সেই ঘরের ভেতরে অনেকগুলি তাঁত চলছে। তাদেরই শব্দে গমগম করছে ঘরটা। ঝাঁঝরি-দেওয়া জানালার ভেতর দিয়ে সামান্য আলো ঢুকছে ভেতরে। সেই আলোতেই তিনি দেখতে পেলেন রোগাটে চেহারার কিছু রুগ্ন মানুষ তাঁতের ওপরে ঝুঁকে কাজ করছে। বিবর্ণ রুগ্ন কতগুলি শিশু কড়িকাঠের গায়ে বসে রয়েছে জড়াজড়ি হয়ে। তাঁতযন্ত্রের ভেতরে দিয়ে মাকুগুলো যখন তীব্রভাবে ধাক্কা দিচ্ছে, লোকগুলি সেই সব ভারী কাঠের পাটাগুলি নীচু করে সুতোগুলিকে জড়িয়ে দিচ্ছে এক সঙ্গে। তাদের মুখগুলি অনাহারে রুগ্ন; তাদের রোগা হাতগুলি কাঁপছিল; কয়েকটি অভুক্ত চেহারার মেয়েমানুষ টেবিলের ধারে বসে-বসে সেলাই করছিল। একটা বিশ্রী দুর্গন্ধে ঘরটা ভারাক্রান্ত বাতাস দুর্গন্ধময়, দেওয়াল ভিজে জ্যাবজেবে, অস্বাস্থ্যকর।

যুবক রাজা একটি তাঁতির কাছে দাঁড়িয়ে তার কাজ দেখতে লাগলেন।

লোকটা রেগে তাঁর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল–তুমি আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে কেন? আমাদের মনিব কি গোপনে আমাদের দিকে লক্ষ রাখতে তোমাকে পাঠিয়েছে?

তোমাদের মনিব কে?-জিজ্ঞাসা করলেন তিনি।

তিক্তভাবে চিৎকার করে উঠল তাঁতি-আমাদের মনিব! চেহারায় আমারই মতো দেখতে–কিন্তু তফাৎ অনেক। সে সুন্দর-সুন্দর পোশাক পরে; আর আমি পরি ছেঁড়া পোশাক। আমি না খেতে পেয়ে দুর্বল হচ্ছি–আর সে দুর্বল হচ্ছে ভূরিভোজন করে।

রাজা বললেন–এটা স্বাধীন দেশ। এখানে তুমি কারও ক্রীতদাস নও।

তাঁতিটি বলল–যুদ্ধের সময় শক্তিমানেরা দুর্বলদের ক্রীতদাস বানায়; আর শান্তির সময় দরিদ্রদের ক্রীতদাস বানায় ধনীরা। বেঁচে থাকার জন্যে কাজ করতে হয় আমাদের। আর তারা আমাদের মাইনে এত কম দেয় যে আমরা না খেয়ে মারা যাই। তাদের জন্যেই সারাদিন আমরা পরিশ্রম করি। তারা তাদের সিন্দুক ভরিয়ে তোলে সোনায়। আমাদের ছেলেমেয়েরা খেতে না পেয়ে অকালেই মারা যায়। যাদের আমরা ভালোবাসি তাদের মুখ শক্ত আর নোংরা হয়ে ওঠে। আমরা আঙুল ফল মাড়াই, আর তারা খায় মদ। শস্য বুনি

আমরা, ফসল তোলে তারা। আমাদের জন্যে রয়েছে শেকল–অথচ, কেউ তা লক্ষ করে না; আমরা ক্রীতদাস–যদিও সবাই বলে আমরা স্বাধীন।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন–তোমাদের সবারই কি এই অবস্থা?

তাঁতিটি বলল–সবার, সবার–যুবক, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, শিশুসকলের অবস্থাই এই এক। ব্যবসাদার আমাদের পিষে মারে; তাদের নির্দেশ আমাদের মেনে চলতে হয়। পুরাহিতরাও মালা জপ করে আমাদের মাথায় কাঁটাল ভেঙে খায়। আমাদের অন্ধকার গলির ভেতর ক্ষুধাতুর দারিদ্র্য গুঁড়ি দিয়ে ঢোকে; পাপ আসে তারি পিছু পিছু। দুঃখের মধ্যে দিয়ে সকালে আমাদের ঘুম ভাঙে, রাত্রিতে অপমান আর লাঞ্ছনা আমাদের পাশে বসে থাকে। কিন্তু তোমার সঙ্গে এদের সম্পর্ক কী? তোমাকে তো বেশ সুখী মানুষ বলেই মনে হচ্ছে।

তাঁর বেশ ভয় হল। তাঁতিটিকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন-এই পোশাকটা তোমরা তৈরি করছ কার জন্যে?

সে বলল–রাজার অভিষেকের জন্যে এই পোশাক তিনি পরবেন। কিন্তু সে সংবাদে তোমার দরকারটা কী?

যুবক রাজা চিৎকার করে উঠলেন। সেই আর্তনাদেই ঘুম ভেঙে গেল তাঁর। চেয়ে দেখলেন তিনি ঘরের ভেতরেই শুয়ে রয়েছেন; জানালা দিয়ে মধুরঙা চাঁদ দেখা যাচ্ছে ধূলিমলিন বাতাসের ওপরে ঝুলতে।

আবার ঘুমিয়ে পড়লেন তিনি। আবার একটা স্বপ্ন দেখলেন।

মনে হল বিরাট একটা পালের জাহাজের নীচু পাটাতনের ওপরে তিনি শুয়ে রয়েছেন। জাহাজের দাঁড়ে বসেছিল একশটি ক্রীতদাস। তাঁর পাশে কার্পেটের ওপরে বসেছিল জাহাজের ক্যাপটেন। কালো কুচকুচ করছে তার দেহ; মাথার ওপরে তার লাল সিল্কের একটা পাগড়ি; কানে বড়ো মোটা মোটা রুপোর গোল দুল; হাতে তার একজোড়া হাতির দাঁতের দড়িপাল্লা।

একটুকরো ন্যাকড়া ছাড়া ক্রীতদাসরা সবাই উলঙ্গ। তারা সবাই শেকল দিয়ে একসঙ্গে বাঁধা। প্রচণ্ড সূর্যের আগুন তাদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। নিগ্রোরা ডেকের ওপরে ছোটাছুটি করে তাদের পিঠে কেবল চাবুক মারছে। তারা তাদের দুর্বল হাতগুলি দিয়ে প্রাণপণে দাঁড় টেনে যাচ্ছে।

অবশেষে একটা উপসাগরের ধারে এসে তারা জল মাপতে শুরু করল। তাই দেখে তিনটি আরব গাধার পিঠে চড়ে সেইখানে এসে তাদের দিকে বর্শা ছুঁড়ল। ক্যাপটেন তার সেই চিত্রিত ধনুকটি তুলে নিয়ে একটি আরবের গলা লক্ষ করে তীর ছুঁড়ল। দেহটি ধপাস করে পড়ে গেল মাটিতে; আর দুটি আরব পালিয়ে গেল। তারপরে উটের পিঠে

চড়ে সেই দিকে এল বেগুনে রঙের ঘোমটা ঢাকা একটি মেয়ে। সেই মৃতদেহটির দিকে মাঝে-মাঝে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

তারপরে নোঙর ফেলা হল; খুলে দেওয়া হল পাল। নিগ্রোরা নীচে ছুটে গিয়ে একটা দড়ির সিঁড়ি বয়ে নিয়ে এল। তার তলায় বেশ ভারী সীসের একটা বস্তা বাঁধা। ক্যাপটেন দুটো লোহার ডাণ্ডার সঙ্গে ভালো করে বেঁধে সেটাকে জলে ফেলে দিল তারপরে নিগ্রোরা সবচেয়ে বাচ্চা ক্রীতদাসটার শেকল খুলে ধরে নিয়ে এল। তার নাক আর কান দুটো মোম দিয়ে দিল বন্ধ করে; কোমরে তার বাঁধল ভারী একটা পাথর। ছেলেটা ক্লান্তভাবে সিঁড়ি দিয়ে জলের তলায় অদৃশ্য হয়ে গেল। হালের সামনে বসে একটা যাদুকর একঘেয়ে সুরে ঢাকের উপরে কাঠি ঠুকতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে হাঁপাতে-হাঁপাতে একটা মুক্তো হাতে নিয়ে ডুবুরি ওপরে উঠে এল। সেই মুক্তোটা ছিনিয়ে নিয়ে আবার তাকে জলের ওপরে ফেলে দিল নিগ্রোরা। এইভাবে বারবার সে উঠে এল মুক্তো নিয়ে; আর বারবার তাকে জলে ঠেলে দিল নিগ্রোরা। সেই সব মুক্তো নিয়ে ওজন করতে লাগল ক্যাপ্টেন। রাজা কী যেন বলতে চাইলেন; কিন্তু পারলেন না। জিব তাঁর জড়িয়ে গেল। তারপরে শেষবারের মতো ডুবুরি উঠে এল তার হাতে একটা মুক্তো। পূর্ণ চাঁদের মতো তার চেহারা। ওরমুজ-এর মুক্তোর চেয়েও সুন্দর। কিন্তু তার মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে তখন। সে ডেকের ওপরে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল, নাক আর কালের ভেতর থেকে ভকভক করে রক্ত বেরিয়ে আসতে লাগল, একটু ছটফট করেই সে স্থির হয়ে গেল। নিগ্রোরা তাদের কাঁধ কোঁচকাল একটু তারপরে, তার দেহটা ছুঁড়ে ফেলে দিল সমুদ্রের ওপরে।

কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করেই ক্যাপ্টেন হাসতে-হাসতে হাত বাড়িয়ে সেই বড়ো মুক্তোটা নিয়ে কপালে ঠেকিয়ে কাকে উদ্দেশ্য করে যেন মাথাটা নোয়াল। এটা রাজার রাজগণ্ডের জন্যে। এই কথা বলে নোঙর তুলে ফেলতে সে নিগ্রোদের নির্দেশ দিল।

এই কথা শুনে রাজা বিরাট একটা আর্তনাদ করে জেগে উঠলেন। জানালার ভেতর দিয়ে দেখলেন প্রভাতের লম্বা ধূসর আঙুলগুলি বিবর্ণ নক্ষত্রগুলির গলা টিপে ধরেছে।

আবার তিনি ঘুমিয়ে পড়ে স্বপ্ন দেখলেন। এ স্বপ্নটাও দেখলেন তাঁর নিজের সম্বন্ধেই।

তাঁর মনে হল আবছায়া একটি বনপ্রদেশ দিয়ে তিনি হাঁটছেন। সেই বনে গাছের ডালে অদ্ভুত ফল ধরেছে, ফুটেছে সুন্দর বিষাক্ত ফুল আর পাশ দিয়ে হিস-হিস শব্দ করে সাপ চলে যাচ্ছে; চকচকে টিয়াগুলি উড়ে গেল চিৎকার করতে-করতে; গরম কাদার ওপরে বিরাট বিরাট কচ্ছপের দল পড়ে-পড়ে ঘুমোচ্ছে। তাদের ওপরে হনুমান আর ময়ূরে বোঝাই হয়ে রয়েছে।

হাঁটতে-হাঁটতে তিনি বনের শেষ প্রান্তে হাজির হলেন। সেখানে তিনি দেখলেন অসংখ্য লোক শুকনো নদীতে কাজ করছে। পিঁপড়ের মতো সার বেঁধে তারা এবড়ো-খেবড়ো তীরে উঠছে। মাটিতে বিরাট বিরাট গর্ত খুঁড়ছে; পাহাড় কাটছে বুড়ো-বুড়ো কুড়ল দিয়ে। অন্য সবাই বালি কাঁটছে। কেউ অলস হয়ে বসে নেই।

একটা গুহার অন্ধকার থেকে মৃত্যু আর লোভ লক্ষ করছিল তাদের।

মৃত্যু বলল–বড়ো ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এই লোকদের এক তৃতীয়াংশ আমাকে দাও। আমি চলে যাচ্ছি।

কিন্তু লোভ মাথা নেড়ে বলল–ওরা চাকর।

তোমার হাতে ওগুলি কী?

তিনটি শস্যের দানা। তাতে তোমার কী?

মৃত্যু বলল–একটা আমাকে দাও–আমার বাগানে বুনবো–মাত্র একটা দাও-আমি চলে যাচ্ছি ।

লোভ বলল–কিছুই দেব না। এই বলে সে তার পোশাকে হাতটা ঢেকে ফেলল।

মৃত্যু হেসে একটা কাপ তুলে নিল; তারপরে জলের মধ্যে সেটা দিল ডুবিয়ে। তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল কাঁপুনি জ্বর। সেই জ্বরে জনতার ভিতর দিয়ে হেঁটে গেল। এক তৃতীয়াংশ লোক মরে মাটিতে পড়ল লুটিয়ে।

এই দেখে লোভ বুক চাপড়াতে-চাপড়াতে কাঁদতে লাগল; তারপরে সে বলল–তুমি আমার তিন ভাগের একভাগ চাকরকে মেরে ফেলেছ। তুমি এখান থেকে বিদেয় হও। টার্টারির পাহাড়ে যুদ্ধ বেধেছে। প্রত্যেক দলের রাজা তোমাকে ডাকছে। আফগানেরা কালো ষাঁড় মেরে যুদ্ধের জন্যে এগিয়ে যাচ্ছে। সেইখানে যাও। আমার রাজত্বে তোমার কী দরকার যে তুমি এখানে অপেক্ষা করছ? চলে যাও। এখানে আর এস না।

মৃত্যু বলল–যতক্ষণ না তুমি আমাকে একটি শস্যকণা দিচ্ছ ততক্ষণ আমি যাচ্ছি নে।

লোভ মুঠি বন্ধ করে দাঁতে দাঁত চিপে বলল–তোমাকে আমি কিচ্ছু দেব না।

মৃত্যু হেসে একটা কালো পাথর নিয়ে বনের মধ্যে ছুঁড়ে দিল। বুনো হেমলকের বন থেকে আগুনের পোশাক পরে বেরিয়ে এল জ্বর। তারপর সে জনতার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গেল। যেতে যেতে স্পর্শ করল তাদের। যাদেরই স্পর্শ করল তারাই মারা গেল। যে পথ দিয়ে সে গেল সেই পথের সব ঘাস শুকিয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

লোভ বলল–তুমি নিষ্ঠুর, নিষ্ঠুর। ভারতের ঘেরা-শহরে দুর্ভিক্ষ লেগেছে, সমরকন্দরে কুয়োগুলি সব শুকিয়ে গিয়েছে, ইজিপ্টের ঘেরা-শহরে দুর্ভিক্ষ শুরু হয়েছে, মরুভূমি থেকে উড়ে আসছে পঙ্গপালেরা। কূলগুলিকে ডুবিয়ে দিয়েছে নীল নদ। পুরোহিতরা সব ইশিস আর ওসিরিসের পুজো করছে সেখানে যাও। তারা তোমাকে ডাকছে। আমার চাকরদের ছেড়ে দাও।

মৃত্যু বলল–না। যতক্ষণ না আমাকে একটা শস্যকণা দিচ্ছ।

আমি তোমাকে কিছুই দেব না।

মৃত্য আবার হাসল, হেসে শিস দিল একটা। আকাশের উপর দিয়ে একটি মহিলা উড়ে গেল, তার কপালে প্লেগের নিশানা। অভুক্ত কতকগুলি শকুন তার পেছনে এল উড়তে-উড়তে। সারা অঞ্চলটা সে তার ডানায় ঢেকে দিল। মরে গেল সবাই।

চিৎকার করতে করতে লোভ বনের ভেতর দিয়ে ছুটে পালাল। মৃত্যু ছুটল তার লাল ঘোড়ার পিঠে চড়ে। ঝড়ের চেয়েও তীব্রতর তার গতি। বনের ভেতর থেকে নাক ফোলাতে-ফোলাতে ছুটে এল ড্রাগন আর শেয়ালের দল।

যুবক রাজা কাঁদতে কাঁদতে জিজ্ঞাসা করল–এরা কারা? কী খুঁজে বেড়াচ্ছে?

তাঁর পেছনে একদল লোক দাঁড়িয়েছিল; সে বলল–রাজার মুকুটের জন্য রুবি খুঁজছে।

রাজা চলে আসতে-আসতে সাধুর মতো একজনকে দেখলেন; তাঁর হাতে একটা আয়না।

বিবর্ণ হয়ে রাজকুমার জিজ্ঞাসা করলেন-কোন্ রাজা?

সাধু বললেন–আয়নার ভেতরে দেখ। তাহলেই তাকে তুমি দেখতে পাবে।

রাজা আয়নার দিকে তাকিয়ে নিজের চেহারা দেখে চিৎকার করে ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। তখন সূর্যকিরণ ঘরের ভেতরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

সকালে রাজপুরুষরা এসে তাঁকে অভিবাদন জানালেন; রত্নখচিত চকচকে পোশাক আর মুকুট তাঁর সামনে রেখে সেগুলি পরার জন্য অনুরোধ করলেন। সেগুলির দিকে তাকিয়ে রইলেন রাজা। যতটা সুন্দর তিনি ভেবেছিলেন তার চেয়ে অনেক অনেক সুন্দর সেগুলি। কিন্তু তিনি বললেন–এগুলি নিয়ে যাও–এসব আমি পরব না।

সবাই হাসল, কারণ, তারা ভাবল রাজা বোধ হয় ঠাট্টা করছেন।

কিন্তু তিনি বেশ কঠোর ভাবেই বললেন–এগুলি আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও-লুকিয়ে রাখ। আজ আমার অভিষেক হলেও ওগুলি আমি পরব না। কারণ দুঃখের তাঁতে আর যন্ত্রণার সাদা হাতে তৈরি হয়েছে আমার এই পোশাক। রুবির মধ্যে রয়েছে রক্ত, মুক্তোর মধ্যে রয়েছে মৃত্যু!

এই বলে সবাইকে তিনি তিনটি স্বপ্নের কথা বললেন।

সভাসদেরা এই কথা শুনে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল-নিশ্চয় উনি উন্মাদ হয়ে গিয়েছেন। কারণ, স্বপ্নটা স্বপ্ন ছাড়া আক কী? তারা মোটেই সত্য নয়; তাদের গ্রাহ্য

করার কোনো প্রয়োজন নেই। আমাদের জন্যে যারা পরিশ্রম করে তাদের কথা চিন্তা করে আমরা করবটা কী?

চ্যামবারলেন যুবক রাজাকে বললেন–মহারাজ, ওই সব কুচিন্তাগুলিকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে এই রাজপোশাকগুলি পরুন, মাথার ওপরে চড়ান এই সোনার মুকুট। কারণ রাজার পোশাক না পরলে আপনি যে রাজা সেকথা লোকে বুঝবে কেমন করে?

তাঁর দিকে রাজা তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন-তাই বুঝি? রাজার পোশাক অঙ্গে ধারণ না করলে তারা কি আমাকে রাজা বলে চিনতে পারবে না?

পারবে না মহারাজ।

আমার ধারণা ছিল এমন কিছু মানুষ রয়েছেন যাঁদের দেখতে রাজার মতো। কিন্তু তুমি যা বললে তাই হয়তো সত্যি। কিন্তু তবু আমি এই পোশাক আর মুকুট কোনোটাই পরব না। বরং যে পোশাকে আমি এই প্রাসাদে এসেছিলাম সেই পোশাকেই এখান থেকে বেরিয়ে যেতে রাজি রয়েছি।

এই বলে তাঁকে বিদায় দিয়ে তাঁর চেয়ে বছর খানেকের ছোটো একটি চাকরকে তাঁর কাছে রাখলেন। পরিষ্কার জলে স্নান করে তিনি তাঁর নক্সাকাটা বড়ো বাক্সটা খুললেন; বার করলেন তাঁর চামড়ার পোশাক–এই পোশাক পরেই তিনি পাহাড়ের ওপরে মেষের পাল চরাতেন।

বাচ্চা চাকরটা অবাক হয়ে তার দুটো নীল চোখ তুলে চাইল তাঁর দিকে; তারপরে হেসে বলল–মহারাজ, আমি আপনার রাজপোশাক আর রাজদণ্ড দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু মুকুটটা কোথায়?

জানালার ধারে যে বুলো কাঠগোলাপ ছিল সেটা তুলে যুবক রাজা বাঁকিয়ে গোল করে মাথার ওপরে পরলেন।

এইভাবে সাজ-পোশাক করে তিনি রাজসভায় হাজির হলেন। সেখানে তাঁকে অভিবাদন জানানোর জন্যে সভাসদেরা অপেক্ষা করছিলেন।

এই পোশাকে দেখে সভাসদেরা রসিকতা করতে লাগলেন; কয়েকজন চিৎকার করে বললেন–মহারাজ, প্রজারা তাদের রাজাকে দেখতে এসেছে; আর আপনি আজ ভিক্ষুকের পোশাক পরেছেন?

কেউ কেউ বললেন–ও লোকটা আমাদের দেশের দুর্নাম করছে; আমাদের প্রভু হওয়ার যোগ্যতা ওর নেই।

কিন্তু তিনি একটা কথাও বললেন না–ব্রোঞ্জের ফটক পেরিয়ে বাইরে এলেন তিনি; তারপরে ঘোড়ায় চড়ে গির্জার দিকে এগিয়ে গেলেন। তাঁর বাচ্চা চাকরটা তাঁর পাশে-পাশে ছুটতে লাগল।

সেই দেখে লোকেরা সব হাসতে লাগল; ঠাট্টা করে বলল–দেখ, দেখ; রাজার ভাঁড় ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে। তিনি ঘোড়ার রাশ থামিয়ে বললেন– না। আমি রাজা।

ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন বেরিয়ে এসে বলল–স্যার, ধনীদের বিলাস-বৈভব থেকেই যে দরিদ্ররা বেঁচে থাকার রসদ সংগ্রহ করে তা কি আপনি জানেন না? আপনার প্রাচুর্যই আমাদের বাঁচিয়ে রাখে; আপনারা যে পাপ করেন তাই আমাদের রুটি সংগ্রহে সাহায্য করে। প্রভুর জন্যে পরিশ্রম করা কষ্টকর। কিন্তু কষ্ট করার জন্যে, কোনো প্রভু না থাকাটা আরও কষ্টকর। আপনি কি কোনো ক্রেতাকে বলতে পারবেন-তুমি একটা কেনো, অথবা কোনো বিক্রেতাকে বলতে পারবেন-তুমি এই দামে জিনিস বিক্রি কর। আমি তা বিশ্বাস করি না। অতএব আপনি প্রাসাদে ফিরে গিয়ে রাজার পোশাক পরিধান করুন। আমাদের জীবন আর দুঃখ নিয়ে আপনার কী করার রয়েছে?

রাজা প্রশ্ন করলেন-ধনী আর দরিদ্র কি পরস্পরের ভাই নয়?

লোকটা বলল–তাই বটে। ধনী ভাই-এর নাম ‘কেইন’।

যুবক রাজার চোখ দুটি জলে ভরে উঠল। জনতার গুঞ্জন-ধ্বনির মধ্যে দিয়ে তিনি এগিয়ে গেলেন। বাচ্চা চাকরটা ভয় পেয়ে তাঁর পাশ থেকে পালিয়ে গেল।

যখন তিনি গির্জার সেই বিরাট ফটকের কাছে হাজির হলেন, সৈন্যবাহিনীর লোকেরা তরোয়াল উঁচিয়ে বলল–কী চাও হেথা? রাজা ছাড়া আর কারও এ-দরজা দিয়ে প্রবেশ করার অনুমতি নেই।

রাজার মুখ রেগে লাল হয়ে গেল। তিনি বললেন–আমিই রাজা।

এই বলে তিনি ভেতরে ঢুকে গেলেন।

মেষপালকের পোশাকে তাঁকে ভেতরে ঢুকতে দেখে বৃদ্ধ বিশপ অবাক হয়ে তাঁর সিংহাসন থেকে উঠে তাঁর কাছে এসে বললেন–পুত্র, এটা কি রাজার পোশাক? কোন মুকুট আমি তোমার মাথায় পরাব, কোন রাজদণ্ড হতে দেব তোমার! আজ নিশ্চয় তোমার আনন্দের দিন, দুঃখের নয়।

যুবক রাজা প্রশ্ন করলেন–দুঃখ দিয়ে যে পোশাক তৈরি হয়েছে, সুখ কি তা পরতে পারে?

এই বলে তাঁর তিনটি স্বপ্নের কথা তিনি বর্ণনা করলেন।

সমস্ত শুনে ভ্রূ কুঞ্চিত করে বিশপ বললেন–পুত্র, আমি বৃদ্ধ হয়েছি, দিন আমার শেষ হয়ে আসছে। আমি জানি পৃথিবীতে অনেক অন্যায় আর অবিচার হচ্ছে। পাহাড় থেকে নেমে এসে দুর্দান্ত দস্যুরা বাচ্চাদের ধরে নিয়ে মুরদের কাছে বিক্রি করে দেয়। সিংহ ওৎ

পেতে বসে থাকে উটের পিঠে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে। জলদস্যুরা সমুদ্রোপকূলকে ধ্বংস করে জেলেদের জাহাজ পুড়িয়ে দেয়। নোনা জলায় কুষ্ঠ রোগীরা বাস করে। কঞ্চির বেড়া দিয়ে ঘর তৈরি করে তারা। তাদের পাড়ায় কেউ যেতে পারে না। ভিক্ষুকরা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়-কুকুরদের সঙ্গে বসে তারা খায়। ওই সব কাজ না করতে তুমি কি তাদের বাধ্য করত পার? তুমি কি কুষ্ঠ রোগীদের সঙ্গে নিয়ে এক বিছানায় শুতে পার, না, ভিক্ষুকদের নিয়ে এক টেবিলে পার খেতে? সিংহ কি তোমার নির্দেশ মতো কাজ করবে, না, বন্যারা পালন করবে তোমার নির্দেশ? যিনি এই দুঃখের সৃষ্টি করেছেন তিনি কি তোমার চেয়েও বিজ্ঞ নন? সেই জন্যে তুমি যা করেছ তার জন্যে তোমাকে আমি প্রশংসা করছি নো তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছি প্রাসাদে ফিরে গিয়ে রাজপোশাক পরে এস। তোমার মাথায় আমি স্বর্ণ মুকুট পরিয়ে অভিষেক করব; তোমার হাতে দেব মুক্তাখচিত রাজদণ্ড। আর তোমার স্বপ্ন! ভুলে যাও ও-সব। এই বিশ্বের ভার অতীব বিশাল। একজনের পক্ষে তা বয়ে বেড়ানো কষ্টকর। বিশ্বের দুঃখ এত বেশি যে একজনের পক্ষে তা সহ্য করা সম্ভব নয়।

রাজা বললেন–ঈশ্বরের স্থানে বসে আপনি এই সব কথা বলছেন?

এই কথা বলে বিশপের পাশ দিয়ে উঠে গেলেন তিনি, যে বেদীর ওপরে যীশুখৃস্টের মূর্তি রয়েছে সেইখান গিয়ে দাঁড়ালেন। দু'পাশে তাঁর ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য-অদ্ভুত অদ্ভুত স্বর্ণ পাত্র, যীশুর শেষ নৈশ ভোজনের সবুজ মদে বোঝাই কার স্মরণ পাত্র-ইত্যাদি। যীশুর মূর্তির কাছে তিনি হাঁটু মুড়ে বসলেন-বিরাট-বিরাট বাতিগুলি জ্বলতে লাগল; ধূপের ধোঁয়া

পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে উঠতে লাগল; তাঁর চারপাশে প্রার্থনার জন্যে মাথা নীচু করলেন তিনি, ধোপদুরস্ত পোশাক পরা পাদরিয়া তাঁর কাছ থেকে পালিয়ে গেল।

হঠাৎ বাইরে একটা গণ্ডগোল উঠল; তার সঙ্গে সঙ্গে অভিজাত সম্প্রদায় তাদের তরোয়াল খুলে মাথার মুকুট নাড়িয়ে চেঁচাতে লাগল–সেই উন্মাদ লোকটা কোথায়? ভিক্ষুকের পোশাকধারী সে রাজা কোথায় গেল? সেই ছোকরা কোথায় যে আমাদের রাজত্বে কলঙ্ক লেপন করেছে? আমরা তাকে হত্যা করব। আমাদের শাসন করার যোগ্যতা তার নেই।

এই সব কথা শোনার পরেও রাজা প্রার্থনা করার জন্যে মাথা নোয়ালেন; প্রার্থনা শেষ করে উঠলেন তিনি; ঘুরে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন তাদের দিকে।

আর সেই সঙ্গে চিত্রিত ডানালার ভেতর দিয়ে সূর্যের কিরণ ঝরে পড়ল তাঁর ওপরে। সেই সূর্যকিরণমালা তাঁর দেহে এমন একটি স্বর্গীয় পোশাক পরিয়ে দিল যার কাছে তাঁর রাজকীয় পোশাক ম্লান বলে মনে হল। শুকনো ফুল আবার ফুটল; লিলি ফুল মুক্তোর চেয়ে সাদা হয়ে দেখা দিল। শুকনো কাঁটা উঠল ফুটে; নিরাভরণ গোলাপ ফুলি রুবির চেয়েও লাল হয়ে গেল।

রাজার সেই পোশাকেই তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। মুক্তামন্দিরের দ্বার গেল খুলে–এই রহস্যময় আলোর দ্যুতিতে ভরে গেল চারপাশে। ঈশ্বরের মহিমা ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশে-সেন্টরাও যেন জীবন্ত হয়ে উঠলেন। সঙ্গীতের সুর উঠল, ঢাকের শব্দ পড়ল ছড়িয়ে। ভজন গাইতে লাগল ছেলেরা।

ভয়ে আর বিস্ময়ে সবাই তাঁর কাছে নতজানু হলেন; সভাসদেরা খাপের মধ্যে তাদের তরোয়াল রাখল ঢুকিয়ে-অভিবাদন জানাল তাঁকে। বিশপের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল-হাত কাঁপতে লাগল তাঁর। তিনি বললেন–যাকে আমি অভিষিক্ত করছি তার চেয়েও তুমি অনেক বড়ো। এই কথা বলে তিনি রাজার কাছে তার মাথাটা নীচু করলেন।

রহস্যহীনা মহিলা

The Sphinx Without a Secret

কোনো এক অপরাহ্নে কাফে দি লা পেইক-এর বাইরে বসে পারস্যের বিলাসবহুল আর দুঃখভারাক্রান্ত জীবনযাত্রার মিছিল দেখছিলাম, আর মদের গ্লাস মুখে নিয়ে অবাক হয়ে। ভেবেছিলাম কেমন করে দম্ভ আর দারিদ্র্য এভাবে পাশাপাশি নিজেদের অস্তিত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে বজায় রাখতে পারে। এমন সময় কে যেন আমার নাম ধরে ডাকল। পেছন ফিরে দেখি লর্ড মাচিশন। কলেজ ছাড়ার পরে আর আমাদের দেখা হয়নি; সেও প্রায় বছর দশেক হবে। তার সঙ্গে দেখা হতেই আমি খুব খুশি হয়ে উঠলাম; করমর্দন করলাম দুজনে। অক্সফোর্ডে আমাদের মধ্যে বেশ একটা বন্ধুত্ব ছিল। মানুষটি দেখতে সুন্দর, সাহসী, আর সম্ভ্রান্ত। তাকে আমার খুবই ভালো লাগত। আমরা সবাই বলাবলি করতাম সব সময় সত্যি কথা না বললে সে যশের শিখরে উঠতে পারবে। আমার ধারণা তাকে যে আমরা অত প্রশংসা করতাম তার একমাত্র কারণ হচ্ছে সে সব খোলাখুলিই বলত। সেদিন দেখলাম তার মধ্যে কিছু পরিবর্তন। দেখা দিয়েছে। কেমন যেন উদ্বিগ্ন হতচকিত দেখাচ্ছে তাকে। কোনো একটা বিষয়ে তার যেন একটা সন্দেহ জেগেছে। আমার মনে হল এর পেছনে আধুনিক নৈরাশ্যবাদ নেই। সেই জন্যেই আমি নিশ্চিন্ত হলাম যে নিশ্চয় কোনো নারীঘটিত ব্যাপারে সে জড়িয়ে পড়েছে। তাই তাকে জিজ্ঞাসা করলাম–তুমি বিয়ে করেছ?

সে বলল–মেয়েদের আমি ভালোভাবে বুঝতেই পারি নে।

বললাম–বৎস জিরাল্ড, মেয়েদের জন্মই হয়েছে ভালোবাসা পাওয়ার জন্যে, বোঝার জন্যে নয়।

যাকে আমি বিশ্বাস করতে পারি নে তাকে আমি ভালোবাসতে পারি নে।

বললাম-তোমার জীবনে নিশ্চয় কোনো রহস্য রয়েছে, জিরান্ড। আমাকে সব খুলে বল।

সে বলল–চল, মোটরে করে একটু বেরিয়ে পড়ি। এই জায়গাটি বড়োই জনবহুল। নানা ওই গাড়িটা নয়–অন্য রঙের কোনো গাড়ি নাও-ওই ওখানে যে ঘন সবুজ একটা গাড়ি রয়েছে–ওতেই হবে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা বুলেভার্ডের পাশ দিয়ে মেদেলিনের দিকে ছুটতে লাগলাম।

কোথায় যাবে?

সে বলল–যেদিকে তোমার ইচ্ছে। বয়-এর কোনো রেস্তোরাঁয় চল। সেখানে ডিনার খেযে তোমার কাহিনি বলবে।

বললাম-তোমার কাহিনি আমি প্রথম শুনতে চাই। তোমার গোপন কথাটা কি বল।

রুপোর ঢাকনি দেওয়া একটা মরক্কো চামড়ার ব্যাগ বার করে সেটি সে আমার হাতে দিল। খুলে দেখলাম তার ভেতরে একটি মহিলার ফটো রয়েছে। মহিলাটি দীর্ঘাজিলী, ক্ষীণতন্বী: তাঁর সেই ভাষা-ভাষা চোখ আর খোলা চুলে অপরূপা দেখাচ্ছিল তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল তিনি অতীন্দ্রিয় জগতের; দামি পশমে ঢাকা ছিল তাঁর দেহ।

সে বলল–মুখটা দেখে কী মনে হয় তোমার? সত্যবাদিনী?

বেশ ভালোভাবেই পরীক্ষা করলাম আমি। মনে হল এ মহিলার মধ্যে কোনো গাপন রহস্য রয়েছে, কিন্তু সেটা ভালো কি মন্দ তা আমি বুঝতে পারলাম না তাঁর সৌন্দর্য অনেক রহস্য মিশিয়ে অনেকটা মনস্তাত্ত্বিক বাস্তব নয়; এবং তাঁর ঠোঁটের ওপরে হাসির যে মৃদু রশ্মিটি ছড়িয়ে পড়েছে সেটি অনেক গভীর, সত্যিকার মিষ্টি বলে চিহ্নিত হওয়ার পথে যথেষ্ট বাধা। রয়েছে তার।

সে একটু অস্থির হয়ে প্রশ্ন করল–কী দেখছ বল?

বললাম-রহস্যময়ী রমণী। এঁর সম্বন্ধে সব কথা আমাকে বল।

সে বলল–ডিনারের পরে।

ডিনার শেষ হলে হোটেলের চাকর যখন কফি আর সিগারেট দিয়ে গেল তখনই আমি জিরাকে তার প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়ে দিলাম। চেয়ার থেকে উঠে ঘরময় দু'চার বার পায়চারি করে একটা চেয়ারের ওপরে বসে পড়ল সে; তারপরে বলে গেল তার কাহিনি

একদিন বিকেলে পাঁচটার সময় বন্ড স্ট্রিটের দিকে আমি হেঁটে যাচ্ছিলাম। রাস্তার ওপরে একটা দুর্ঘটনা ঘটার ফলে চারপাশের সব গাড়িই জটলা পাকিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। ফুটপাতের একেবারে ধারে হলদে রঙের একটা ব্রোহাম দাঁড়িয়েছিল। কী জানি কেন তার দিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। সেই গাড়িটার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় একটি মুখ তার ভেতর থেকে কিছুটা বাইরে বেরিয়ে এল। যে মুখটি এইমাত্র তুমি দেখলে সেটি হচ্ছে সেই মুখ। দেখামাত্র আমি চমকে উঠলাম। সারা রাত্রি আর তার পরের সারাটা দিনই সেই মুখটির কথা আমি ভাবতে লাগলাম। সেই পথের ধারে ধারে আমি অনেকবার আসা-যাওয়া করলাম, প্রতিটি গাড়ির ভেতরে দেখলাম, সেই হলদে রঙের ব্রোহামটি দেখতে পাব আশা করলাম; কিন্তু আমার সেই অজ্ঞাতনামা সুন্দরীর দেখা আর পেলাম না। ভাবতে লাগলাম তাঁকে আমি স্বপ্নেই দেখেছি প্রায় সপ্তাহ খানেক পরে মাদাম দি রাসটেল-এর সঙ্গে ডিনার খাওযার আমার একদিন আমন্ত্রণ দিল। সময় ছিল রাত্রি আটটা, কিন্তু সাড়ে আটটা বেজে গেল। তখনো আমরা বসার ঘরে বসে রয়েছি এমন সময় দরজা খুলে দিযে চাকরটি জানাল যে। লেডি অ্যালবয় উপস্থিত হয়েছেন। এই মহিলাটিকেই আমি খুঁজে বেডিচ্ছিলাম। ধীরে ধীরে ভেতরে ঢুকে এলেন তিনি। আমার সরচেয়ে আনন্দ হল যখন তাঁকে ডিনারে নিয়ে যাওয়ার জন্যে মাদাম আমাকেই নির্দেশ দিলেন। খেতে বসার পরে নিরপরাধ মন্তব্য করলাম আমি–লেডি অ্যালবয়, মনে হচ্ছে দিন কয়েক আগে বনড স্ট্রিটে আপনাকে একবার আমি দেখেছিলাম। হঠাৎ কেমন যেন

ম্লান হয়ে গেলেন তিনি আমাকে নীচু গলায় বললেন–অনুগ্রহ করে এত জোর কথা বলবেন না। অন্য কেউ শুনতে পেতে পারে। শুরুতেই এই ধরনের মন্তব্য শুনে আমি একটু দুঃখিত হলাম। তারপরেই মরিয়া হয়ে ফরাসি নাটকের আলোচনায় মেতে উঠলাম। তিনি কথা বললেন কমই যেটুকু বললেন তাও শুনতে লাগল মৃদু গুঞ্জনের মতো মনে হল, কেউ পাছে তাঁর কথা শুনতে পায় এই ভয়ে তিনি সন্ত্রস্ত। সত্যি কথা বলতে কি নিতান্ত মুখের মতোই আমি তাঁর প্রেমে পড়ে গেলাম। তাঁর চারপাশের রহস্য আমার কৌতূহলকে আরো বাড়িয়ে দিল। ডিনার শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি যখন উঠে পড়লেন তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম আমি কি তাঁর বাড়ি গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারি? তিনি একটু ইতস্তত করলেন, তাঁর কথা কেউ শুনছে নাকি চারপাশে একবার তাকিয়ে। দেখলেন; তারপরে বললেন–আসুন, কাল বিকেল পৌনে পাঁচটার সময়।

তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলার জন্য মাদামকে আমি অনুরোধ করলাম। কিন্তু যেটুকু সংবাদ পেলাম তা হচ্ছে এই যে ভদ্রমহিলা বিধবা, এবং পার্কলেনের একটি সুন্দর বাড়িতে তিনি বাস করেন। এই শুনে বাড়ি ফিরে এলাম আমি।

পরের দিন যথাসময়ে আমি তাঁর বাড়িতে হাজির হলাম; কিন্তু তাঁর বাটলার আমাকে জানাল যে তিনি সেইমাত্র বেরিয়ে গিয়েছেন। খুব দুঃখ আর বিভ্রান্তির সঙ্গে আমি ক্লাবে চলে গেলাম; তারপরে অনেক ভেবেচিন্তে একটা চিঠি দিয়ে জানতে চাইলাম অন্য কোনো বিকালে তাঁর ওখানে আমি যেতে পারি কিনা। কয়েক দিন তার কোনো উত্তর এল না। তারপরে ছোটো একটা চিরকুট এল একদিন। তাতে লেখা ছিল যে রবিবার বেলা চারটের সময় তিনি বাড়িতে থাকবেন। সেই সঙ্গে ছিল অদ্ভুত একটি পুনশ্চ–অনুগ্রহ করে

এই ঠিকানায় আর আমাকে চিঠি পাঠাবেন না। দেখা হলে এর কারণটা আমি আপনাকে জানাব। রবিবার দিন তাঁর সঙ্গে দেখা হল। তিনি আমাকে সাদরেই অভ্যর্থনা জানালেন। কিন্তু আমি যখন উঠে আসছি সেই সময় তিনি বিনীতভাবে আমাকে বললেন–যদি কোনোদিন আমাকে চিঠি দেওয়ার প্রযোজন ইয তাহলে আমার এই ঠিকানা দেবেন-মিসেস নকস, কেয়ার অফ দুইটাকার লাইব্রেরি, গ্রিন স্ট্রিট। আমার বাড়িতে আমার নামে কোনো চিঠিপত্র আসতে দিতে যে আমি চাইলে তার পেছনে অনেক কারণ রয়েছে।

তারপরে অনেক দিনই তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, কিন্তু কোনো দিনই তাঁর রহস্য আমার কাছে উন্মোচিত হয়নি। মাঝে-মাঝে আমার মনে হয়েছে অন্য কোনো পুরুষের কবলে পড়েছেন তিনি। কিন্তু তাঁর সান্নিধ্যে আসা যে কোনো মানুষের পহেই এতই কষ্টসাধ্য ছিল যে সেরকম কোনো সম্ভাবনাকে আমি আমল দিতে পারিনি। তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কোনো সমাধানে আসা আমার পক্ষে কষ্টকর হয়ে পড়েছিল–কখনো তাঁকে মনে হত পরিষ্কার ঝরঝরে, আবার কখনো মনে হত দারুণ অস্পষ্ট। শেষকালে একদিন আমি মনস্থির করে ফেললাম–তাঁকে আমার স্ত্রী হওয়ার প্রস্তাব দেব। লাইব্রেরির ঠিকানায় তাঁকে একটি পত্র দিলাম আমি–পরের সোমবার ছ'টায় সময় তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হতে পারে কিনা। জানতে চাইলাম। রাজি হলেন তিনি। চিঠি পেয়ে আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলাম। আমি তাঁকে দেখে পাগল হয়েছিলাম। রহস্যময়ী তখনকার তাঁকে দেখে তো বটেই–এবং এখনো। ওই রহস্যটাই আমাকে অস্থির করে তুলেছিল, উন্মত্ত করেছিল আমাকে। হঠাৎ তাঁর চলার পথে আমি এসে দাঁড়ালাম কেন?

জিজ্ঞাসা করলাম-তাহলে তুমি তা আবিষ্কার করতে পেরেছিলে?

সে বলল–মনে হচ্ছে যেন। তুমিই তা বিচার করে দেখা

সোমবার দিন কাকার সাথে আমি লাঞ্চ খেতে গিয়েছিলাম। চারটে নাগাদ আমি মেরিলিবোন স্ট্রিটে এসে দাঁড়ালাম। তুমি বোধ হয় ভান আমার কাকার বাড়ি হচ্ছে রিজেন্ট। পার্কে। আমার যাওয়ার কথা পিকাডেলিতে। অনেক নোংরা ছোটো রাস্তা দিয়ে পথটা সংহেপ। করার জন্যে আমি হাঁটতে শুরু করলাম। হঠাৎ দেখলাম কালো ঘোমটার মুখ ঢেকে আমার। সামনে দিয়ে লেডি অ্যালবয় হনহন করে এগিয়ে যাচ্ছেন। রাস্তাটার শেষ বাড়ির কাছে এসে তিনি সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলেন। একটা ল্যাচ-কী বার করে ভেতরে ঢুকে গেলেন। দেখে মনে হল বাড়িটা হচ্ছে ভাড়াটেদের। মনে-মনে বললাম-রহস্যটা এইখানে। দরজার কাছে দেখি তাঁর রুমালটা পড়ে রয়েছে। আমি সেটা তুলে নিযে পকেটে রেখে দিলাম। তারপরে কী করা উচিত সেইটাই ভাবতে লাগলাম আমি। পরিশেষে আমি এই সমাধালে এলাম যে তাঁর ওপরে। গোয়ান্দাগিরি করার কোনো অধিকার আমার নেই। এই ভেবে ক্লাবে গেলাম। সেখান থেকে ছ'টার সময় আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম সোফার ওপরে বসেছিলেন তিনি। সুন্দর দেখাচ্ছিল তাঁকে। তিনি বললেন–আপনাকে দেখে আমি খুশি হয়েছি। সারাদিনই আমি বাড়ি থেকে বেরোইনি।

কথাটা শুনে অবাক হয়ে তাঁর দিকে আমি তাকিয়ে রইলাম। তারপরে, পকেট থেকে রুমালটা বার করে তাঁর হাতে দিয়ে বললাম–আজ বিকালে কুমনর স্ট্রিটে আপনি এটা ফেলে। গিয়েছিলেন।

শান্তভাবেই কথাটা বললাম আমি। আমার দিকে বিহ্বল ভাবে তাকিয়ে রইলেন তিনি। কিন্তু রুমালটা নেওয়ার কোনো চেষ্টাই করলেন না। জিজ্ঞাসা করলাম-ওখানে গিয়েছিলে কেন? তিনি জিজ্ঞাসা করলেন–ওই প্রশ্ন করার আপনার অধিকার কী? আমি বললাম–তোমাকে আমি ভালোবাসি–আমার অধিকার সেইটুকু। আমাকে তুমি বিয়ে কর এই প্রস্তাব নিয়েই আমি আজ এসেছি। এই শুলে দু'হাতে মুখ ঢেকে তিনি হু-হুঁ করে কেঁদে ফেললেন।

আমি বললাম-আমাকে বলতেই হবে সব কথা।

তিনি দাঁড়িয়ে উঠে বললেন–লর্ড মার্টিশন, আপনাকে বলার মতো কিছুই আমার নেই।

আমি চিৎকার করে উঠলাম–নিশ্চয় তুমি কারও সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলো এইটাই তোমার রহস্য।

হঠাৎ কেমন যেন সাদা হয়ে গেলেন তিনি; বললেন–কারো সঙ্গে দেখা করতে আমি যাইনি।

তুমি কি সত্যি কথা বলতে পার না?

আমি সত্যি কথাই বলছি।

উন্মত্ত হয়ে উঠলাম আমি। সেদিন কী যে বলেছিলাম তা আমার মনে নেই। তবে নিশ্চয় কিছু। ভয়ঙ্কর কথা। শেষকালে ঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এসেছিলাম। পরের দিনই তিনি আমাকে একটা চিঠি দিয়েছিলেন। সে চিঠি না খুলেই আমি ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছি। তারপরেই আমি। অ্যালেন কোলভিলের সঙ্গে নরওয়ের দিকে চলে গেলাম। মাসখানেক পরে ফিরে এসেই মর্নিং পোস্ট-এ পড়লাম যে লেডি অ্যালবয় মারা গিয়েছেন। অপেরায় যাওয়ার ফলে তাঁর ঠান্ডা লেগেছিল; তারই ফলে ফুসফুস বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তাঁর। খবরটা পেয়েই ঘরের মধ্যে নিজেকে আমি পুরে রাখলাম। কারো সঙ্গে দেখা করলাম না। আমি তাঁকে খুব ভালোবাসতাম। হ ইশ্বর! তাঁকে আমি এত ভালোবাসলাম কেমন করে?

জিজ্ঞাসা করলাম-তুমি সেই রাস্তায়, সেই বাড়িতে আর গিয়েছিলে?

সে বলল–হ্যাঁ। একদিন আমি কুমনর স্ট্রিটে গিয়েছিলাম। না গিয়ে পারিনি। একটা সন্দেহ আমাকে কেবলই পীড়া দিচ্ছিল। দরজার ধাক্কা দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে একটি সম্ভ্রান্ত মহিলা দরজা খুলে দিলেন। ভাড়া দেওয়ার জন্যে তাঁর কোনো ঘর খালি রয়েছে কিনা আমি তা জানতে। চাইলাম। তিনি বললেন–সম্ভবত ড্রয়িং রুমটা ভাড়া দেওযা চলতে পারে। যে ভদ্রমহিলা। ওইটা ভাড়া নিয়েছিলেন তাঁকে তিন মাস আমি দেখতে পাইনি। তাঁর কাছে তিন মাসের ভাড়া আমার বাকি রয়েছে। সেটা আপনি নিতে পারেন।

তাঁর ফটোটা দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম-ইনিই কি তিনি?

তিনি চিৎকার করে বললেন–ঠিক, ঠিক। তিনি কবে ফিরছেন স্যার?

বললাম–তিনি মারা গিয়েছেন।

ভদ্রমহিলা অবাক হয়ে বললেন–কী বলছেন? তিনি ছিলেন আমার সেরা ভাড়াটে। মাঝে-মাঝে এখানে এসে বসার জন্যে তিনি আমাকে সপ্তাহ তিন গিনি করে দিতেন।

জিজ্ঞাসা করলাম–আর কেউ কি এখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসত?

তিনি আমাকে নিশ্চিত করে বললেন–কেউ আসত না–একটি প্রাণীও নয়।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম-তাহলে তিনি এখানে এসে করতেন কী?

তিনি বললেন–চুপচাপ বসে বই পড়তেন। মাঝে-মাঝে চা খেতেন।

কী যে বলব তা আমি বুঝতে পারলাম না। একটা ভারেল তাঁর হাতে দিয়ে আমি মি এলাম। এখন বল তো, এসবের অর্থ কী? ম নিশ্চয় বিশ্বাস কর না যে মহিলাটি আমাকে সত্যি কথা বলেছেন?

বিশ্বাস করি।

তাহলে লেডি অ্যালবয় সেখানে যেতেন কেন?

প্রিয় জিরালড, লেডি অ্যালবয়-এর রহস্যের ওপরে একটা ঝোঁক ছিল, ওই যাকে তোমরা বল বাতিক। মাথায় ঘোমটা দিয়ে তিনি ওখানে যেতেন–নিজেকে সেই রহস্যের একটি নায়িকা বলে মনে করতেন। গোপন রহস্যের প্রতি তাঁর একটা উদ্দাম কৌতূহল ছিল; কিন্তু নিজের রহস্য বলতে কিছু ছিল না।

তুমি কি সত্যিই তা মনে কর?

সত্যই মনে করি।

মরোক্কোর ব্যাগটা খুলে সেই ফটোটার দিকে সে চেয়ে রইল-তারপর শেষকালে বলল–অবাক কাণ্ড!

লর্ড আর্থার সেভাইল-এর অপরাধ

Lord Arthur Savile's crime

০১.

ইস্টারের আগে লেডি উইনডারমিয়ারের এইটাই হচ্ছে শেষ ভোজের আয়োজন। বেনটি হাউস-এ এইসব আসরের সাধারণত যত অতিথি আসেন এবারে এসেছেন তার চেয়ে অনেক বেশি। সরকারি তকমা এঁটে আর জাঁকজমক পোশাক পরে এসেছেন ছ'জন কেবিনেট মন্ত্রী। সুব সুন্দরী মহিলাই তাঁদের সেরা পোশাক পরেছন। আর পিকচার গ্যালারির শেষ প্রান্তে প্রিনসেস সোফিযা দাঁড়িয়ে রয়েছেন। চার্লসরুহীর রাজকুমারী তিনি। দেখতে বেশ মোটা ভারী তাতার রমণীর মতো ছোটো ছোটো কালো চোখ; তিনি বেশ জোরে ডোরে বিকৃত উচ্চারণে ফরাসী ভাষায় কথা বলছিলেন। তাঁকে লক্ষ করে যাই বলা হোক না কেন তাই শুনে তিনি অশালীন ভাবে হাসছিলেন। কত বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষেরই না সমাবেশ হয়েছিল এখানে। শৌখিন পোশাক পরে পিয়ারসরা অমায়িকভাবে উগ্রপন্থী ব্র্যাডিক্যালদের সঙ্গে গল্প। করছিলেন, জনপ্রিয় ধর্মপ্রচারকরা প্রথিতযশা নাস্তিকদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী হয়ে বসেছিলেন, নিয়মনিষ্ঠ রুচিশীলা মহিলা পাদরির দল বেশ স্বাস্থ্যবতী নর্তকীদের সঙ্গে ঢলাঢলি করছিলেন। কলাবিদের বেশ ধরে কয়েকজন রয়্যাল অ্যাকাডেমিসিয়েনরা সিড়িঁর ওপরে দাঁড়িয়েছিলেন। শোনা যায় একসময় খাবার ঘর প্রথম শ্রেণির জিনিযাসে একেবারে গিজগিজ করত। সত্যি কথা

বলতে লেড উইনডারমিয়ারের এটি হচ্ছে একটি উৎকৃষ্ট ভোজসভা। প্রিনসেস প্রায় রাত্রি সাড়ে এগারটা পর্যন্ত সেখানে ছিলেন।

তিনি প্রস্থান করার পরেই লেডি উইনডারমিয়ার পিকচার গ্যালারিতে ফিরে এলেন। সেইখানে একজন বিদগ্ধ রাজনৈতিক অর্থনীতিবিশারদ পণ্ডিত হাঙ্গেরি থেকে আগত সূক্ষ চারুকলার সমঝদারের কাছে সঙ্গীতের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বেশ সমারোহের সঙ্গেই। করছিলেন। তাঁর সেই বিদগ্ধ আলোচনা শুনে চারুকলার সমঝদার বিষম বিতৃষ্ণায় তাঁর। নাসিকা আর ভুরুযুগল কুঞ্চিত করছিলেন। এই দেখে অর্থনীতিবিশারদ সেইসলের ডাচেসের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলেন। ডাচেসের গলার রঙ হাতির দাঁতের মতো সাদা; আমাকে-ভুলোনা গোছের সুন্দর নীল চোখ, আর এক গোছা সোনালি কেশের স্তবক। সব জড়িয়ে তাঁর দেহ-সৌষ্ঠভটি বড়োই মনোরম দেখাচ্ছিল। তাঁর মুখের ওপরে যুগপৎ একজন সাধুর শান্ত সমাহিত মুখভঙ্গিমার সঙ্গে পাপীর মুখের আকর্ষণ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। মনস্তাত্ত্বিক গবেষণার প্রশস্ত ক্ষেত্র বলে মনে হয়েছিল তাঁকে। প্রথম জীবনে একটি মূল্যবান সত্য তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। সেটি হচ্ছে এই যে অস্থিরচিত্ততার মতো নিরপরাধ জিনিস আর কিউ নেই এবং অজস্র হঠকারী উচ্ছৃংখল আচরণের মাধ্যমে, যাদের অর্ধেকগুলিই নিরপরাধ বলে বিবেচিত হয়েছিল, ব্যক্তিত্ব অর্জনের সমস্ত সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন। তিনি একবারের বেশি স্বামী পরিবর্তন করেছিলেন, সত্যি কথা বলতে কি দেব্রেত সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন তিনটি বিয়ের। কিন্তু প্রেমিককে তিনি কোনোদিনই বর্জন করেননি। ফলে, তাঁর কলঙ্কের কথা সমাজ আর এখন আলোচনা করে না। মাত্র চল্লিশ বছর তাঁর বয়স, কোনো সন্তান নেই তাঁর।

রয়েছে কেবল আনন্দ করার অসম্ভব মাদকতা। যৌবনকে বজায় রাখার এইটিই হল প্রধান উপায়।

হঠাৎ তিনি ঘরের চারপাশে একবার তাকিয়ে নিলেন; তারপরে জিজ্ঞাসা করলেন–আমার ‘চিরোম্যানটিস্ট’ কোথায়?

হঠাৎ চমকে ডাচেস চিৎকার করে উঠলেন-তোমার কী, গ্ল্যাডিস?

আমার ‘চিরম্যানটিস্ট’, ডাচেস। বর্তমানে ওঁকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারি নে।

ডাচেস বুঝতে পারলেন আসল শব্দটা হল ‘চিরোপোডিস্ট’ (যে চিকিৎসক পা, পায়ের নখ, কড়া ইত্যাদির চিকিৎসা করে); বুঝতে পেরেই বললেন–না গ্ল্যাডিস; তুমি একটি অদ্বিতীয়া।

লেডি উইনডারমিয়ার বললেন–প্রতিটি সপ্তাহে দু’বার করে নিয়মিত ভাবে তিনি আমার হাত দেখে যান, এবং তিনি নিজেই এবিষয়ে অত্যন্ত কৌতূহলী।

ডাচেস নিজের মনে-মনেই বললেন–হা ঈশ্বর! লোকটা চিরোপোডিস্ট ছাড়া আর কিছু নয়। কী ভয়ঙ্কর! আশা করি, লোকটি বিদেশি। তাহলে, ব্যাপারটা নিয়ে ভাবনার কিছু নেই।

আমি নিশ্চয় তোমার সঙ্গে তাঁর আলাপ করিয়ে দেব।

ডাচেস প্রায় চিৎকার করে উঠলেন–আলাপ! তুমি নিশ্চয় বলতে চাও না যে তিনি এখানেই রয়েছেন।এই বলে তিনি কচ্ছপের খোলার ছোটো পাখা আর 'লেস' দেওয়া শালটা নেওয়ার জন্যে চারপাশে একবার তাকালেন। মনে হল, তিনি এখনই ওখান থেকে চলে যাবেন।

নিশ্চয়। তিনি তো এখানেই রয়েছেন'–বললেন লেডিউইলডারমিযারা তাঁকে বাদ দিয়ে পার্টি দেওয়ার কথা আমি ভাবতেই পারিনি। তিনি বলেন আমার হাতটা নাকি একেবারে। আধ্যাত্মিক, আর আমার বুড়ো আঙুলটা যদি আর একটু ছোটো হত তাহলে আমি একবার পুরোপুরি নাস্তিক হয়ে সোজা মঠে চলে যেতাম।

বেশ কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে ডাচেস বললেন–তাই বুঝি! মনে হচ্ছে তিনি ভাগ্য গণনা করেন তাই না?

লেডি উইনডারমিয়ার বললেন–এবং দুর্ভাগ্যও; অনেক অনেক দুর্ভাগ্য। ধরুন, দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, আগামী বছর জল আর স্থল দু'জায়গাতেই আমার বিপদ ঘটতে পারে। তাই আমি ঠিক করেছি ওই সময়টা আমি বেলুনে বাস করব; আর প্রতিদিন একটা বাক্স করে আমার ডিনার। নিয়ে যাব। এ-সব কথা আমার বুড়ো আঙুলে লেখা রয়েছে। হাতের চেটোতেও থাকতে পারে। ঠিক কোথায় লেখা রয়েছে তা আমার মনে নেই।

বল কী গ্ল্যাডিস? এতে ঈশ্বরও প্রলুব্ধ হবেন যে দেখছি।

প্রিয় ডাচেস, এর মধ্যে ঈশ্বর নিশ্চয় প্রলোভনকে এড়াতে পারবেন। আমার বিশ্বাস প্রত্যেকেরই মাসে অন্তত একবার করে হাত দেখানো উচিত। কী তার করা উচিত নয় সেটা তাহলে সে বুঝতে পারবে। তবে তা জেনেও মানুষ সব কাজই করে। কিন্তু আগে থাকতে বিপদের সঙ্কেত পাওয়াটা খুবই মনোরম। এখন কেউ যদি গিয়ে মিঃ পডগারসকে এক্ষুনি এখানে ডেকে না আনেন তাহলে আমাকেই যেতে হবে।

একটি দীর্ঘকায় সুন্দর যুবক এতক্ষণ দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সব শুনছিলেন। শুনতে-শুনতে একটু হাসছিলেনও। তিনি বললেন–আমি যাচ্ছি, লেডি উইনডারমিয়ার।

ধন্যবাদ, লর্ড আর্থার। কিন্তু ভয় হচ্ছে আপনি হয়তো তাঁকে চিনতে পারবেন না।

তিনি যদি আপনার মতোই অনবদ্য হন তাহলে চিনতে অবশ্য আমার ভুল হবে না। কেমন দেখতে বলুন তো। আমি এখন তাঁকে আপনার কাছে নিয়ে আসছি।

মানে, চিরোম্যানটিস্টের মতো আদৌ তিনি দেখতে নন। অর্থাৎ, তিনি অদ্ভুত চেহারার মানুষ নন, অথবা, রোমান্টিকও মনে হবে না তাঁকে। বেশ শক্তসমর্থ চেহারা তাঁর, বেশ রসিক-মাথায় টাক চোখে সোনার পাতে মোড়া চশমা। অনেকটা গৃহচিকিৎসক আর গ্রামের উকিলের মাঝামাঝি চেহারা তাঁর। আমি সত্যিই খুব দুঃখিত; কিন্তু তার জন্যে আমি দায়ী নই, মানুষরা সত্যিকার বড়োই বিরক্তিকর। আবার যাঁরা পিয়ানো বাজান

তাঁদের সকলের চেহারা কবিদের মতো। আর আমার পরিচিত সব কবিরাই পিয়ানো বাজিয়েদের মতো। দেখতে। আমার বেশ মনে রয়েছে গত বছর আমি একজন ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রকারীকে ডিনারে নিমন্ত্রণ করেছিলাম। লোকটি সব সময় সাঁজোয়ার কোট পরত; তার শার্টের ভেতরে লুকানো থাকত একটা ছোরা। আপনি কি জানেন লোকটি যখন আসত তখন তাকে একটি চমৎকার বৃদ্ধ পাদরি বলে মনে হত; আর সারা সন্ধেটাই রসিকতা করে তিনি আসর জমিয়ে রাখতেন? কিন্তু তা সত্ত্বেও, আমি খু বই নিরাশ হয়েছিলাম। আমি যখন তাকে ও সাঁজোয়ার কোটের কথা জিজ্ঞাসা করলাম তখন তিনি কী বললেন জানেন? কেবল হেসে বললেন ইংলন্ডে ঠান্ডা এত বেশি যে ওই কোট এখানে পরা যায় না। আরে, ঐ তো মিঃ পডগারস, সেইসলের ডাচেসের হাতটা দেখতে আমি আপনাকে অনুরোধ করছি। ডাচেস, তোমার দস্তানাগুলো খুলে ফেলা না, না-বাঁ হাত নয়; না, না-বাঁ হাত নয়; ডান হাত।

ভিজে ‘কিড’ দস্তানা আস্তে-আস্তে খুলে ডাচেস বললেন–প্রিয় গ্ল্যাডিস, না না–ঠিক হচ্ছে না...

লেডি উইনডারমিয়ার বললেন–দুনিয়াটাই এমনি। এখানে কিছুই কৌতূহলোদ্দীপক নয়। কিন্তু তোমার সঙ্গে পরিচয় আমাকে করিয়ে দিতে হবে। ডাচেস, ইনি হচ্ছেন, আমার প্রিয় চিরোম্যাটিস্টি, মিঃ পডগারস; ইনি হচ্ছেন সেইসলের ডাচেস। আপনি যদি বলেন ওঁর হাতে যে চাঁদের পাহাড় রয়েছে সেটা আমর চেয়ে বড়ো তাহলে আর কোনোদিনই আমি আপনাকে বিশ্বাস করব না।

ডাচেস গম্ভীরভাবেই বললেন–আমার হাতে নিশ্চয় ওসব কোনো বস্তু নেই।

তাঁর ছোট চ্যাপ্টা চতুর্ভুজ আঙুলগুলি দিয়ে ডাচেসের মোটা ছোটো হাতের দিকে তাকিয়ে। মিঃ পডগারস বললেন–ডাচেস সত্যি কথাই বলেছেন। চাঁদের পাহাড় এখনও বেড়ে ওঠেনি; কিন্তু জীবনের রেখাঁটি সত্যিই বড়ো ভালো। দয়া করে কলিটা একটু বাঁকাল। ধন্যবাদ। তিনটি রেখা আপনার হাতে এডোএড়ি হয়ে রয়েছে। আপনি অনেক দিন বেশ সুখেই বাঁচবেন।

উচ্চাকাঙ্খা-মোটামুটি বুদ্ধির রেখাটা খুব একটা মারাত্মক রকমের নয়, হৃদয়রেখা–

লেডি উইনডারমিয়ার একটু চেঁচিয়েই বললেন–এবারে কিন্তু সাবধান।

মিঃ পডগারস মাথাটা নুইয়ে বললেন–ডাচেস যদি বিচক্ষণ হতেন সেকথা বলতে আমি খুব খুশিই হতাম, কিন্তু একথা বলতে আমি খুবই দুঃখিত যে ওঁর হাতের ওপরে যেসব চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি তা থেকে বোঝা যাচ্ছে উনি হৃদযবতী মহিলা; এবং ওঁর কর্তব্যজ্ঞান বড়ো টনটনে।

বেশ সন্তুষ্ট হয়ে ডাচেস বললেন–অনুগ্রহ করে বলে যান মিঃ পডগারস।

মিঃ পডগারস বললেন–ডাচেস, মিতব্যয়িতার কোনো লক্ষণ আপনার হাতে প্রতীয়মান হচ্ছে না।

এই কথা শুনে লেডি উইনডারমিয়ার হেসে কুটিকুটি হয়ে গেলেন।

ডাচেস সন্তুষ্ট হয়ে বললেন–মিতব্যয়িতা বড়ো ভালো জিনিস। আমি যখন পেইসলকে বিয়ে করেছিলাম তখন তার সাতটি দুর্গ ছিল; বাস করার মতো বাড়ি ছিল না একটাও।

লেডি উইনডারমিয়ার বললেন–এখন তাঁর বারোটা বাড়ি রয়েছে; একটাও দুর্গ নেই।

ডাচেস বললেন–আসল কথাটা কী ডান? আমি চাই

শেষ করলেন মিঃ পডগারস–সুখ, আর চান প্রতিটি ঘরে আধুনিক সাজসজ্জা এবং প্রতিটি যার ঘরে গরম জল। আপনি ঠিকই বলেছেন। সুখ আর স্বাচ্ছন্দ্যই একমাত্র জিনিস বর্তমান সভ্যতা আমাদের যা দিতে পারো।

ডাচেসের চরিত্রের সম্বন্ধে আপনি চমৎকার বলেছেন, মিঃ পডগারস। এবার আপনি লেড ফ্লোরার হাত দেখে বলুন।

হাস্যমানা গৃহস্বামিনীর ইঙ্গিতে সোফা থেকে উঠে দাঁড়ালেন একটি দীর্ঘাঙ্গিনী বালিকা। তাঁর চুলগুলি স্কটল্যান্ডের বালির মতো কটা, চওড়া কাঁধ। জড-ভরতের মতো সামনের দিকে। এগিয়ে এসে তিনি তাঁর ছুঁচোল আঙুলগুলি বাড়িয়ে দিলেন।

মিঃ পডগারস বললেন–আপনি তো দেখছি পিয়ানো বাজিয়ে, চমৎকার পিয়ানো বাজান আপনি। কিন্তু গায়িকা আপনি নন। খুব সংযত, অতিরিক্ত ন্যায়বাদিনী; আর জীবদের ওপরে আপনার স্নেহ অগাধা।

লেডি উইনডারমিয়ারের দিকে তাকিয়ে ডাচেস বললেন–খাঁটি কথা; একেবারে খাঁটি কথা! ম্যাক্রোসকিতে ফ্লোরার দু'ডজন নেড়ি কুত্তা রয়েছে; ওর বাবা রাজি হলেও ওদের বাড়িটাকে একটি পশ্বাগারে পরিণত করে ফেলতা।

লেডি উইনডারমিয়ার হেসে বললেন–প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আমার বাড়িটা যা হয়। তবে নেড়ি কুত্তার চেয়ে আমি বেশি পছন্দ করি সিংহকে।

খুব আড়ম্বরের সঙ্গে মিঃ পডগার মাথাটা নুইয়ে বললেন–লেডি উইনডারমিয়ার, আপনার একটি ভুল হচ্ছে

লেডি উইলডারমিযার বললেন–যদি কোনো মহিলা তার ভুলগুলিকে মনোরম করে তুলতে পারে তা হলে সে নিছক নারী ছাড়া আর কিছু নয়। আরও কয়েকজনের হাত আপনাকে আজ দেখতে হবে। স্যার টমাস, আপনি হাত দেখান।

সাদা ওয়েস্ট কোটপরা একটি শান্ত চেহারার বৃদ্ধ ভদ্রলোক এগিয়ে এস তাঁর পুরুষ্ট লম্বা তৃতীয় আঙুলটি বাড়িয়ে দিলেন।

আপনার চরিত্রটি দুঃসাহসিক। অতীত আপনি চারবার দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রা করেছেন। আর একবার করবেন। আপনার জাহাজ তিনবার দুর্ঘটনায় পড়েছিল। না, দু'বার। কিন্তু ভবিষ্যতে আর একবার দুর্ঘটনায় পড়ার সম্ভবনা রয়েছে। আপনি খুব শক্ত কারভেটিভ, সময়ের জ্ঞান আপনার টনটনে; আর অদ্ভুত-অদ্ভুত জিনিস সংগ্রহ করার দিকে ঝোঁক রয়েছে আপনার। ষোল থেকে আঠারো বছর বয়সের মধ্যে আপনার একবার কঠিন অসুখ করেছিল। তিরিশ বছর বয়সে আপনি অনেক সম্পত্তি পেয়েছিলেন। বিড়াল আর র‍্যাডিকেলদের ওপরে আপনার বিতৃষ্ণা অগাধা

স্যার টমাস বললেন–অদ্ভুত, অদ্ভুত! আপনি আমার স্ত্রীর হাতটাও দেখুন।

স্যার টমাসের হাতটা নিজের হাতের ওপরে রেখে তিনি বললেন–আপনার দ্বিতীয়া স্ত্রীর। খুশি হয়েই দেখব।

লেডি মার্ভেলের চেহারাটি বিষণ্ণ, কটা চুল, চোখ দুটো ভাবপ্রবণ। তাঁর অতীত আর ভবিষ্যৎ প্রকাশ হয়ে পড়ুক তা তিনি ঠিক চাচ্ছিলেন না। লেডি উইনডারমিয়ার যাই চান, রাশিয়ার রাষ্ট্রদূতও তাঁর দস্তানা খুলতে রাজি হলেন না। সত্যি কথা বলতে কি অনেকেই এই অদ্ভুত। হাসির খুদে লোকটির মুখোমুখি পড়তে রাজি হচ্ছিলেন না। তারপরে তিনি যখন লেডি ফারমারকে মুখের ওপরে বলে দিলেন যে সঙ্গীতের ওপর তাঁর বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নেই তখনই সবাই বুঝতে পারলেন এক খোশ গল্প ছাড়া হাত দেখা ব্যাপারটাকে বেশি প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়।

লেডি ফারমোরের দুর্ভাগ্যজনক কাহিনি লর্ড আর্থার সেভাইল জানতেন না। তিনি বিরাট একটি কৌতূহল নিয়ে মিঃ পডারস-এর দিক তাকিয়ে রইলেন। নিজের হাতটা দেখানোর। খুব ইচ্ছা হল তাঁর। কিন্তু হাত দেখাতে তাঁর বেশ লজ্জা হচ্ছিল। লেডি উইনডারমিয়ার যেখানে বসেছিলেন সেইখানে গিয়ে একটু মিষ্টি হেসে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন:হাত দেখালে কি মিঃ পডগারস কিছু মনে করবেন?

লেডি উইনডারমিয়ার বললেন–নিশ্চয় না। সেইজন্যেই তো তিনি এখানে এসেছেন। লর্ড আর্থার, আমার সমস্ত সিংহই সিংহের মত খেলা করেন; যখনই আমি বলব তখনই তাঁরা। সার্কাসের ঘেরাটোপের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বেন। কিন্তু আপনাকে আমি প্রথমেই সাবধান করে দিচ্ছি যে সব কথা আমি সাইবিলকে বলে দেব। আগামী কাল সে আমার সঙ্গে লাঞ্চ খেতে আসবে, সেই সঙ্গে বোনেট' (মহিলাদের মস্তকাবরণ) নিয়ে কিছউ আলোচনাও করবে আমার সঙ্গে। যদ মি: পডগারস আপনার সম্বন্ধে এমন কিছু কথা বলেন–এই ধরুন, আপনার হয়তো বাতের লক্ষণ রয়েছে, আপনার মেভাডটা বেশ রুক্ষ, অথবা, আপনার একটা স্ত্রী 'বেযেসওয়াটারে' থাকে তাহলে সেসব কথা নিশ্চয় আমি তাকে জানিয়ে দেব।

একটু হেসে লর্ড আর্থার মাথা নেড়ে বললেন–ওকে আমার ভয় নেই। দুজনেই আমরা দুজনকে ভালভাবে চিনি।

তাই বুঝি! একথা শুনে আমি কিঞ্চিৎ দুঃখিত হচ্ছি। কারণ, বিয়ের আসল কথাই হচ্ছে স্বামী আর স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস না, না, বিবাহের সতোকে আমি অবিশ্বাস

করছি নে; ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই আমি এই কথা বললাম। দুটোর মধ্যে ফারাক অবশ্য বিশেষ কিছু একটা নেই। মিঃ পডগারস, লর্ড আর্থার সেভাইল তাঁর হাত দুটি দেখানোর জন্যে একেবারে উন্মাদ হয়ে উঠেছেন। লনডনের সবচেয়ে সুন্দরী একট যুবতীর সঙ্গে ওঁর যে বিয়ের ব্যবস্থা পাকা হয়ে গিয়েছে সেকথা আপনি যেন বলবেন না; কারণ মাসখানেক আগে 'মর্নিং পোস্ট' কাগজেই সে-সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

জেডবার্ডের মার্কুইস-পত্নী চিৎকার করে বললেন—প্রিয় লেডি উইনডারমিয়ার, মিঃ। পডগারসকে এখানে আর একটু থাকতে বলুন। তিনি এইমাত্র বললেন যে আমি একজন অভিনেত্রী হব, কথাটা শুনে আমার বড়ো কৌতূহল হয়েছে। লেড জেডবার্ড, মিঃ পডগারস যদি ওই কথা বলে থাকেন তাহলে তাঁকে আমি নিশ্চয় সরিয়ে নেব। মিঃ পডগারস, আপনি এখানে লর্ড আর্থারের হাতটা দেখুন তো? লেড জেডবার্ড একটু নড়ে-চড়ে বললেন—স্টেডে নামাটা যদি সম্ভব না হয় তাহলে অন্তত, দর্শকবৃন্দের একজন হতে পারি।

লেডি উইনডারমিয়ার বললেন—অবশ্যই আমরা সবাই দর্শকবৃন্দের অংশ হতে যাচ্ছি। এখন মিঃ পডগারস আমুল; এর সম্বন্ধে কিছু ভালো কথা বলুন; ইনি আমার বিশেষ অনুগৃহীত।

কিন্তু মিঃ পডগারস লর্ড আর্থারের হাত দেখেই কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে গেলেন। মনে তিনি যেন শিউরে উঠলেন। তাঁর লোমশ ভ্রুযুগল কুঁচকে উঠল। কিছুটা বিভ্রান্ত মনে হল তাঁকে। তারপরে কয়েকটি মোটা মোটা ঘামের ফোঁটা জমে উঠল তাঁর কপালের উপরে।

লর্ড আর্থারও তাঁর এই পরিবর্তন লক্ত করলেন। জীবনে এই প্রথম বোধ হয় তিনি একটু ভয় পেলেন। একবার মনে হয়েছিল ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে যাবেন তিনি। কিন্তু তারপরেই তিনি নিজেকে সামলে নিলেন। তিনি ভাবলেন ভবিষ্যৎ যত ভয়ঙ্করই হোক অনিশ্চয়তার মধ্যে না থেকে বরং তা আগে থাকতে জানাই ভালো।

তিনি বললেন মিঃ পডগারস, আমি অপেক্ষা করছি

অস্থিরভাবে লেডি উইনডারমিয়ার-ও বললেন–আমরা সবাই অপেক্ষা করে রয়েছি।

কিন্তু তিনি কোনো উত্তর দিলেন না।

হঠাৎ তিনি আর্থারের ডান হাতটা ছেড়ে দিয়ে বাঁ হাতটা তুলে নিলেন। তারপরে সেই হাতটা চোখের একেবারে সামনে তুলে এনে গভীরভাব দেখতে লাগলেন। এক মুহূর্তের জন্যে তাঁর মুখটা কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেল; কিন্তু তারপরে নিজেকে সামলে নিয়ে লেডি উইনডারমিয়ারের দিকে তাকিয়ে কষ্ট করে হেসে বললেন–হাত তো ভালোই অর্থাৎ মনোমুগ্ধকর যুবকের হাত যেমন হওয়া উচিত।

লেডি উইলডারমিযার বললেন–সে তো বটেই। সে তো বটেই। কিন্তু উনি কি মনোমুগ্ধকর স্বামী হতে পারবেন? সেইটাই আমি সেইটাই আমি জানতে চাই।

লেড জেডবার্ড আস্তে-আস্তে বললেন–আমার মনে হয় না কোনো স্বামীরই বেশিমাত্রায় আকর্ষণী শক্তি থাকা উচিত। থাকলে, সেটা বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াবে।

লেডি উইনডারমিয়ার বললেন–বৎসে, স্বামীদের কোনোদিনই স্ত্রীকে আকর্ষণ করার শক্তি থাকে না। কিন্তু আমি চাই খুঁটিনাটি বিষয়ে জানতে। মানুষের আগ্রহ-ই তো খুঁটিনাটি জানার। লর্ড আর্থারের ভবিষ্যৎটা কী রকম তাই বলুন।

কয়েক মাসের মধ্যেই লর্ড আর্থার সমুদ্রযাত্রা করবেন

নিশ্চয়। হনিমুনে যাবে বইকি।

এবং একটি আত্মীয়কে হারাবেন।

করুণ সুরে লেডি জেডবার্ড বললেন–আশা করি সেই আত্মীয়টি বোন নয়। একটি বিরক্তির ভঙ্গিতে মিঃ পডগারস বললেন–নিশ্চয় না। একটি দূর সম্পর্কের আত্মীয়।

লেডি উইনডারমিয়ার বললেন–কথাটা শুনে আমি বেশ হতাশ হলাম। আগামী কাল সাইবিলকে বলার মতো কিছুই রইল না আমার। আজকাল দূর সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে কেউ বিশেষ ব্যস্ত নয়। অনেকদিন আগেই ওটা চলনের বাইরে চলে গিয়েছে। যাই হোক, সাইবিলের সিল্কের কালো একটা ঘোমটা রাখা উচিত। এখন খেতে যাই চলুন। মনে হচ্ছে, ওরা সব খেয়ে শেষ করে ফেলেছে। কিছু গরম 'সুপ' ছাড়া আর

কিছুই পড়ে নেই আমাদের জন্যে। একসময় ফ্র্যাঙ্কোয় বড়ো সুন্দর 'সুপ' তৈরি করতে পারত, কিন্তু অধুনা রাজনীতি নিয়ে সে এতই উত্তেজিত হয়ে থাকে যে 'সুপের' দিকে নজর রাখা তার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছে। জেনারেল বোলাঙ্গার কথা বলাটা কমালেই আমি খুশি হতাম। ডাচেস, তুমি নিশ্চয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছ?

দরজার দিকে এগিয়ে ডাচেস বললেন—না, না। খুবই ভালো লাগল। সবচেয়ে ভালো লাগল 'চিরোপোডিস্ট', অর্থাৎ, 'চিরোম্যানিস্ট'কো ফ্লোরা, আমার কচ্ছপের খোলা দিয়ে তৈরি হাতপাখাটা কোথায় থাকতে পারে বল তো? ওঃ, ধন্যবাদ, স্যার টমাস। আমার লেস দেওয়া শালটা কোথায় ফ্লোরা? ওঃ, ধন্যবাদ স্যার টমাস।

এই বলে সেই সম্মানিতা প্রাণীটি কোনোরকমে শেষ পর্যন্ত নিচে নেমে এলেন। আসার পথে দু'বারের বেশি তিনি সেন্ট-এর শিশিটা হারাননি—এটাই সৌভাগ্যের বিষয় বলতে হবে।

সারা সময়টা লর্ড আর্থার আগুনে চুল্লির পাশে সমানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সারা সত্তার ওপরে তাঁর কেমন যেন একটা আতঙ্কের ছায়া পড়েছিল। কোন জাতীয় দুর্ভাগ্য তাঁর আসতে পারে। সেই কথাই ভাবছিলেন তিনি। তাঁর বোন লর্ড প্রিমডেলের হাত ধরে ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় বিমর্ষ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে তিনি একটু হাসলেন। মুক্তা আর ব্রোকেড-এ তাঁকে বেশ সুন্দরী দেখাচ্ছিল। লেডি উইনডারমিয়ার যখন তাঁকে তাঁর পিছু পিছু আসার কথা বললেন তখন সেকথাও তাঁর কালে ঢুকল বলে মনে হল না। সাইবিল মার্টনের কথাই তিনি তখন ভাবছিলেন। তাঁদের মধ্যে কিছু ঘটতে পারে

এই কথাই ভেবেই তিনি বেশ কষ্ট পাচ্ছিলেন। তাঁর চোখ দুটি জলে ভিজে আসছিল যেন। এতদিন পর্যন্ত একটানা সুখ আর প্রাচুর্যের মধ্যে তিনি জীবন কাটিয়ে এসেছেন। দুঃখের বিন্দুবিসর্গও তিনি জানতেন না। এই প্রথম তিনি রহস্যময় ভবিষ্যতের ভয়ে আঁৎকে উঠলেন। অনাগত দুর্ভাগ্যের একট ভয়ঙ্কর কালো ছায়া ধীরে ধীরে তাঁর রৌদ্রজ্জ্বল যৌবনের সামনে এসে দাঁড়াল।

সমস্ত জিনিসটাই তাঁর কাছে কেমন যেন একটা অর্থহীন ভয়ঙ্কর বলে মনে হল। তাঁর হাতে এমন কী লেখা থাকতে পারে যা পড়ার ক্ষমতা তাঁর নিজের নেই, যা অন্য লোকে বুঝতে পারে–সেই ভয়ঙ্কর গোপন পাপ অথবা অপরাধের রক্তাক্ত অদৃশ্য চিহ্নটি কী? এ থেকে কি মুক্তি নেই মানুষের? সেই অদৃশ্য ক্ষমতা নিজের ইচ্ছেমতো আমাদের জন্যে যা সাডিযে রেখেছেন তাকে ওলোট-পালোট করার মতো বুদ্ধি আর শক্তি কি আমাদের নেই? সমস্ত ব্যাপারটার বিরুদ্ধেই তাঁর জ্ঞান আর বুদ্ধি বিদ্রোহ ঘোষণা করল। তবু তাঁর মনে হল অনাগত এটি দুর্ভাগ্য তাঁর সামনে ঝুলছে; আর সেই দুর্ভাগ্যেই তাঁর মনের ওপরে একটি নিদারুণ চাপ সৃষ্টি করেছে। সে-চাপটিকে তিনি সহ্য করতে পারছেন না। মঞ্চের অভিনেতাদের কপাল ভালো। তাঁর হাসুন আর কাঁদুন, দুঃখ করুন বা আনন্দই করুন-ট্র্যাজেডি অথবা কমেডি-কিসে অভিনয় করবেন সেটা তাঁরা নিজেরাই ঠিক করে নেন। কিন্তু বাস্তব জীবনে সমস্তটাই আলাদা। অধিকাংশ নর-নারীকেই এমন সব অভিনয় করতে হয় যা করার দক্ষতা। তাদের থাকে না। সমস্ত পৃথিবীটাই একটা রঙ্গমঞ্চ; কিন্তু অভিনয়ের পালা এখানে বড়ো বিসদৃশ।

হঠাৎ মিঃ পডগারস ঘরে ঢুকলেন। লর্ড আর্থারকে দেখেই একটু চমকে উঠলেন তিনি, তাঁর সেই স্থূল মুখের ওপরে একটা হলদে আভা নেমে এল। দুজনে চোখাচোখি হল। মুহূর্তের জন্যে কেউ কোনো কথা বললেন না।

শেষকালে মিঃ পডগারস বললেন–ডাচেস তাঁর একট দস্তানা এখানে ফেলে গিয়েছেন। সেইটা আমাকে তিনি নিয়ে যেতে বললেন। এইতো; সোফার ওপরে পড়ে রয়েছে। নমস্কার। মিঃ পডগারস, আমি আপনাকে একটি প্রশ্ন করছি। আমি চাই আপনি তার সোজা উত্তর দেবেন।

অন্য সময়, লর্ড আর্থার। ডাচেস বড়োই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন। আমাকে এখনই যেতে হবে।

না। ডাচেসের কোনো তাড়া নেই।

একটু বিষণ্ণ হাসি হেসে মিঃ পডগারস বললেন–মহিলাদের বসিয়ে রাখা উচিত নয়। ওঁরা স্বভাবতই তাতে ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন।

লর্ড আর্থারের সুন্দর ঠোঁট দুটি একটা অশিষ্ট ব্যঙ্গে কুঞ্চিত হয়ে উঠল। ঠিক সেই মুহূর্তে হতভাগিনী ডাচেসের দাম তাঁর কাছে সামান্য বলেই মনে হল। তিনি মিঃ পডগারস-এর কাছে এগিয়ে গিয়ে তাঁর হাত ধরলেন।

আমার হাতে কী দেখলেন সত্যি করে বলুন। আমার তা জানতেই হবে। আমি শিশু নই।

সোনার পাত দিয়ে চশমার পেছনে মিঃ পডগারস-এর চোখ দুটি মিটমিট করে উঠল। এক পা থেকে আর এক পায়ের ওপরে তিনি অস্থিরভাবে সরে দাঁড়ালেন।

আমি আপনাকে যা বলেছি তার চেয়ে যে আপনার হাতে আমি বেশ কিছু দেখেছি এইরকম

একটা ধারণা আপনার হল কেন, লর্ড আর্থার?

আমি তা জানি। আমি চাই সেই কথাটা আপনি আমাকে বলবেন। তার জন্যে আমি আপনাকে একশ পাউন্ড-এর একটা চেক দেব–আপনার পারিশ্রমিক হিসাবে।

সেই সবুজ চোখ দুটি একবার চকচক করেই আবার ঝিমিয়ে পড়ল। আস্তে করে তিনি শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করলেন-গিনি?

নিশ্চয়। কালই আপনাকে একটা চেক পাঠিয়ে দেব। আপনার ক্লাবের নাম কী?

আমার কোনো ক্লাব নেই–অর্থাৎ বর্তনামে আমার ঠিকানা হচ্ছে, কিন্তু আমার একখানা কার্ড আপনাকে দিচ্ছি।

এই বলে পকেট থেকে একটা কার্ড বার করে ছোট্ট একটা অভিবাদন জানিয়ে তিনি সেটা লর্ড আর্থারের হাতে দিলেন। কার্ডের ওপরে লেখা ছিল-মিঃ সেপটিমাস আর পডগারস-হস্ত-পরীক্ষক–১০30 ওয়েস্ট মুন স্ট্রিট।

যান্ত্রিকভাবে ফিস ফিস করে বললেন–আমার সময় হচ্ছে দশটা থেকে চারটে। পরিবারের উল্যে ফিস আমার কিছু কম হয়।

বিবর্ণ মুখে নিজের হাতটাকে প্রসারিত করে লর্ড আর্থার বললেন–তাড়াতাড়ি করুন।

ভয়ে ভয়ে চারপাশে একবার তাকিয়ে মিঃ পডগারস ভারী পর্দাটাকে টেনে দিয়ে বললেন–একটু সময় লাগবে, লর্ড আর্থার। আপনি বরং বসুন।

সেই মসৃণ মেঝের ওপরে রেগে পা ঠুকে লর্ড আর্থার বললেন–তাড়াতাড়ি স্যার।

মিঃ পডগারস হাসলেন; তারপরে বুকপকেট থেকে ছোটো একটা ম্যাগনফাইং গ্লাস বার করে সেটাকে ভালো করে রুমাল দিয়ে মুছে তিনি বললেন–আমি প্রস্তুত।

.

০২.

মিনিট দশেক পরে বেনটিক হাউস থেকে হুড়মুড় করে বেরিয়ে গেলেন লর্ড আর্থার সেভাইল। প্রচণ্ড আতংকে তাঁর মুখ তখন থমথম করছে। দুঃখে বিভ্রান্ত হয়েছে তাঁর দুটি চোখ। দ্রুত বেরিয়ে যাওয়ার সময় কোনো কিছু দেখলেন না, কারও কথা শুনলেন না তিনি। ঠাণ্ডা কনকল। করছে রাত্রি, তীক্ষ্ণ বাতাসে পার্কের গ্যাসের আলোগুলি মিটমিটি করছে। কিন্তু তাঁর হাত দুটি মনে হচ্ছিল জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে, কপালটা পুড়ছে আগুনে। মাতালের মতো টলতে টলতে তিনি চলতে লাগলেন। একটি পুলিশম্যান তাঁর দিকে কৌতূহলী হয়ে তাকিয়ে রইল। খিলানের তলা থেকে একটি ভিক্ষুক ভিহে চাইবার চেষ্টা করে থেমে গেল। তার মনে হল, তার চেয়েও দুঃখী তিনি। একবার একটা বাতির সামনে দাঁড়িয়ে তিনি নিজের হাত দুটো দেখলেন। তাঁর। মনে হল তাঁর হাতে যে রক্তের দাগ লেগে রয়েছে তা তিনি দেখতে পাবেন। তাঁর কম্পমন ঠোঁট দুটি থেকে একটা অস্পষ্ট আর্তনাদ বেরিয়ে এল।

হত্যা! এই চিহ্নই গণৎকার তাঁর হাতের মধ্যে দেখেছেন। সেই হত্যার ধ্বনি আকাশে-বাতাসে পথে-প্রান্তরে সর্বত্র ধ্বনিত আর প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। অন্ধকারাচ্ছন্ন রাস্তাগুলি সেই শব্দ মুখরিত হয়ে উঠেছে। বাড়ির ছাদ থেকে তারা যেন তাঁকে ব্যঙ্গ করছে।

প্রথমে তিনি একটি পার্কে এলেন। এর শান্ত গম্ভীর পরিবেশ তাঁকে মুগ্ধ করত। ভিজে ধাতুর বেড়ার গায়ে হেলান দিয়ে নিজেকে তিনি ঠান্ডা করার চেষ্টা করলেন। বৃদের মুখর স্তব্ধতার দিকে রইলেন কান পেতো বার বার তিনি বিড় বিড় করে উচ্চারণ করতে লাগলেন-হত্যা, হত্যা! মনে হল ঐ শব্দটা বার বার উচ্চারণ করলেই হয়তো তাঁর তীব্রতা

কমে যাবে। নিজের শব্দেই তিনি চমকে উঠতে লাগলেন। মনে হল নিঃসঙ্গ পথচারীদের থামিয়ে তাদের কাছে সব তিনি খুলে বলবেন।

অক্সফোর্ড স্ট্রিটে ছাড়িয়ে তিনি নোংরা গলির মধ্যে ঢুকলেন। রঙ করা মুখে দুটি মেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল রাস্তায়। পাশ দিয়ে পেরিয়ে যেতে দেখে তারা তাঁকে বিদ্রূপ করতে লাগল। একটা অন্ধকার উঠোনের উপর থেকে মারামারি আর গালাগালির শব্দ ভেসে এল। সেই দুঃস্থ-দারিদ্র্য দেখে তাঁর মনে কপার সঞ্চার হল। এই যে পাপ আর দারিদ্র্যের সন্তান–এরাও কি সেই ভাগ্যের হাতে বাঁধা?

কিন্তু তবু রহস্য নয়; যা তাঁকে আঘাত করল সেটা হচ্ছে দুঃখের কমেডি-যার সত্যিই কোন প্রয়োজনীয়তা নেই–যার অর্থ বলতে কোনো কিছু নেই। সবটাই যেন অদ্ভুত, কিম্ভুতকিমাকার। সামঞ্জস্য বা সমতা বলতে কোথাও যেন কিছু নেই এর বাস্তব আর দিনের আলোতে আমরা যে ভুযো রঙিন আশার ছবি দেখি–এ দুযের মাঝখানে কোনো মিল তাঁর চোখে পড়ল না। তিনি এখনো যুবক।

এইভাবে হাঁটতে-হাঁটতে তিনি মেরিলিবোন চিগড়ার কাছে হাজির হলেন। সেই নির্জন পথটিকে দেখে তাঁর মনে হল পালিশকরা রুপোর সুতোর মতো; মাঝে-মাঝে ছায়ারা এসে কেবল তার ছলটিকে ব্যাহত করছে। অনেক দূরে গ্যাসের বাতিগুলি কেঁপে-কেঁপে উঠছে। বাইরে ছোটো একটি ঘরে একটা ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। সহিস তার ভেতরে ঘুমোচ্ছে। এদিকে-ওদিকে তাকাতে তাকাতে–মন হচ্ছিল কেউ যেন তাঁর পিছু নিয়েছে–তাড়াতাড়ি তিনি পোর্টল্যান্ড প্লেসের দিকে এগোতে লাগলেন। রিচ স্ট্রিটের কোণে তিনি

দেখলেন দুটি লোক দেওয়ালের ওপরে আটা একটা বিজ্ঞাপন পড়ছে। বিজ্ঞাপনে ছিল, যে লোক একটি হত্যাকারীর সন্ধান দিতে পারবে তাকে পুরস্কার দেওয়া হবে। লোকটির বয়স তিরিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে তার মাথার ওপরে সুঁচলো একটা টুপি, পরনে চেকের ট্রাউডার, গায়ে কালো কোট, ডান গালে একটা দাগ। বিজ্ঞাপনটা বার বার পড়লেন তিনি। সেই হতভাগ্য লোকটি ধরা পড়বে কি না এবং সে যে কতটা সন্ত্রস্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এই কথা ভেবে তিনি অবাক হয়ে গেলেন। একদিন হয়তো লনডনের দেওয়ালে-দেওয়ালে তাঁর নামের এইরকম বিজ্ঞাপন বেরোবে। তাঁকে ধরে দেওয়ার জন্যেও পুরস্কার ঘোষিত হবে এইভাবে। এই ভেবে তিনি আরো ভয় পেয়ে অন্ধকারের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দিলেন।

কোথায যে যাচ্ছেন সে বিষয়ে কোনো সপষ্ট ধারণা তার ছিল না। মনে হল অনেক পথে-বিপথে ঘুরছিলেন তিনি। শেষকালে ভোরের দিকে পিকাডেল সার্কাসে হাজির হলেন । তিনি। বাড়ির পথে যখন তিনি বেলগ্রেভ স্কোয়ারের দিকে এগোচ্ছিলেন এমন সময় দেখলেন কনভেন্ট গার্ডেন-এর দিকে সজির গাড়ি চলেছে সাদা পোশাক-পরা পসারীদের দল ঘোড়ার পিঠে চাবুক মারছে আর নিজেদের মধ্যে খুশমেজাজে গল্প করছো কী জানি কেন তিনি। অদ্ভুতভাবে শান্ত হয়ে গেলেন। ঊষার কোমল সৌন্দর্যের মধ্যে এমন একটা কারুণ্য রয়েছে যাকে বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। সেই সব দেহাত রুক্ষ বেপরোয় রহস্যপ্রিয় লোকগুলি নিয়ে কী অদ্ভুত লনডনকেই না তিনি দেখলেন। এই লনডন রাত্রির পাপ থেকে মুক্ত, দিনের ধোঁয়ায় কলঙ্কিত নয়। এ লনডন পরিত্যক্ত কবরখানার শহর নয়। এর চাকচিক্য আর লজ্জা, এর ভীষণ আনন্দের উচ্ছ্বাস আর ভয়ঙ্কর হস্কৃধার ব্যভিচার, সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত যারা। এখানে টগবগ করে ফুটছে তাদের সঙ্গে

এদের যে কোনো সপষ্ট সম্বন্ধ রয়েছে সেকথা ভেবেই তিনি অবাক হয়ে গেলেন। সম্ভবত এটা তাদের কাছে ফল বিক্রি করার বাডার ছাড়া আর কিছু নয়। এখানে তারা আসে, বেচাকেনা করে। বিশ্রাম করে কিছুক্ষণ, তারপরে আবার যে যার জায়গায় ফিরে যায়। তাঁর মনে হল, তারা প্রকৃতির কোলেই বাস করে; আর প্রকৃতিই তাদের মনে শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দিয়েছে। তাদের দেখে তাঁর হিংসে হতে লাগল।

বেলগ্রেভ স্কোয়ারে যখন তিনি পৌঁছলেন তখন সকাল হয়েছে। একটা মৃদু রক্তাভা ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশে। বাগালে পাখিরা শুরু করেছে কিচমিচ করতে।

.

০৩.

লর্ড আর্থারের যখন ঘুম ভাঙল তখন বেলা বারোটা। দুপুরের রোদে ভরে উঠেছে চারপাশ। ঘুম থেকে উঠে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলেন তিনি। বাড়ির নীচে যে পার্কে সেখানে সাদা প্রজাপতির মতো কয়েকটি শিশু ছুটাছুটি করছে। ফুটপাথে অনেক লোক; তারা পার্কের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সব। জীবন যে এত সুন্দর তা তিনি আগে জানতেন না। জীবনের সব কিছু অমঙ্গল তাঁর কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেল।

তাঁর চাকর এল একটা ট্রেতে করে এক কাপ চকোলেট নিয়ে সেটা পান করে তিনি স্নানের ঘরে ঢুকলেন। বেশ ভালো করে স্নান করলেন। মনে হল তাঁর সমস্ত লজ্জাকর

স্মৃতি যেন ধুযে মুছে শেষ হয়ে গিয়েছে। স্নানের ঘর থেকে বেরিয়ে আসার পরে তাঁর মন শান্তিতে ভরে উঠল। ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁর যে চমৎকার শারীরিক অবস্থা দাঁড়িয়েছিল তাতে তিনি খুশিই হয়েছিলেন। যাদের স্বভাব সূম ভাবানুভূতির ডাল দিয়ে তৈরি তাদের প্রায় এইরকমই হয়। প্রবৃত্তির উচ্ছ্বাস তাদের যেমন পবিত্র করে, তেমনি আবার কখনো-কখনো তাকে পুড়িয়েও মারে।

প্রাতঃরাশ শেষ করে তিনি একটি ডিভানের ওপরে গা এলিয়ে দিয়ে সিগারেট ধরালেন কুলুঙ্গির ওপরে সাইবিল মার্টনের বেশ বড়ো একটি ফটোগ্রাফ বসানো ছিল। লেডি নোয়েন-এর নাচের আসরেই তাঁকে তিনি প্রথম দেখেছিলেন। ছোটো খুদে মাথাটি তাঁর একদিকে একটু হেলে পড়েছে, মনে হচ্ছে সেই শর গাছের মতো সরু গলাটি তাঁর মাথার। বোঝা যেন আর বইতে পারছে না। ঠোঁট দুটি সামান্য ফাঁক হয়ে রয়েছে।মনে হবে, এই দুটি ঠোঁট মিষ্টি গান গাইবার জন্যেই যেন বিধাতা পুরুষ সৃষ্টি করেছেন। তাঁর অনুঢ়া কৈশোরের সমস্ত পেলব শুচিতা তাঁর সেই স্বপ্নলু চোখ দুটির মধ্যে থেকে যেন অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রয়েছে।

সেই ছবিটির দিকে তাকিয়ে লর্ড আর্থারের মনটা করুণায় টনটন করে উঠল। এই করুণার উৎস হচ্ছে তাঁর ভালোবাসা। তাঁর মাথার ওপরে আসন্ন হত্যার অভিশাপ ঝুলছে। এ অবস্থা সাইবিলকে বিয়ে করার অর্থই হচ্ছে তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা। সেই বিশ্বাসঘাকতায় জুডাসের বিশ্বাসঘাতকতার চেয়েও জঘন্য। তাঁর হস্তলিপির সেই ভয়ঙ্কর ভবিষ্যৎবাণীকে সফল করার জন্যে যে-কোনো মুহূর্তে তাঁর তলব আসেত পারে। সেই কাজ যতক্ষণ না সম্পন্ন হচ্ছে ততক্ষণ তাঁদের জীবনে কী সুখ আসতে পারে?

সুতরাং যেমন করেই হোক এ-বিয়ে বন্ধ করতেই হবে। সেদিক থেকে তাঁর মনে কোনো দ্বিধা নেই, যদিও মেয়েটিকে তিনি খুবই ভালোবাসতেন এবং মেয়েটির সামান্য সপর্শ তাঁর শরীরে আনন্দ আর উত্তেজনার ঢল বইয়ে দিত তবু তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে আগে হত্যা না করে কিছুতেই তিনি তাঁকে বিয়ে করতে পারেন না। একবার সেই কাজটা সুসম্পন্ন হলেই তিনি গির্জায় গিয়ে সাইবিলকে বিয়ে করতে পারবেন। তখন আর তাঁকে কর্তব্যকর্ম শেষ না করার অপরাধে জর্জরিত হতে হবে না। একবার সেই কাজটা শেষ হলেই তিনি তাঁর প্রিয়তমাকে বুকের ওপরে জড়িয়ে ধরতে পারবেন। তার জন্যে সাইবিলকে কোনো দিন লজ্জায় মাথা নীচু করে হবে না। তাই হত্যাটাই তাঁকে তাড়াতাড়ি করতে হবে। যতটা তাড়াতাড করা যায় ততই তাঁর পক্ষে মঙ্গল।

তাঁর অবস্থায় অনেকেই কর্তব্যের খাড়াই পাহাড়ে ওঠার চেষ্টা না করে দ্বিধা বা অপেক্ষা করত। কিন্তু আর্থারের চরিত্র সে-ধাতুতে গড়া ছিল না। নীতিটা ছিল তাঁর সকলের ওপরে। বিশ্বের যা কিছু সৎ আর উন্নত সাইবিল তাঁর কাছে ছিলেন সেইরকম। যে কাজটা করার জন্যে ভাগ্য তাঁকে নিযুক্ত করেছিল সেই কাজটার কথা চিন্তা করতেই তাঁর মনট বিতৃষ্ণায় কেমন যেন সঙ্কুচিত হয়ে উঠল। কিন্তু সেটা হণিকের জন্যে তাঁর হৃদয় তাঁকে বলল–এটা কোনো অপরাধ নয়, আত্মদান। তাঁর মস্তিষ্ক তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিল যে এ ছাড়া অন্য কোন পথ তাঁর কাছে খোলা নেই, তাঁর কাছে একট পথই খোলা ছিল–হয় তাঁকে নিজের জন্যে বাঁচতে হবে; আর না হয়, বাঁচতে হবে পরের জন্য। এবং যদিও কাজটি তাঁর কাছে নিঃসন্দেহে ভয়ঙ্কর তবু তিনি প্রেমের অসম্মান করে স্বার্থপরতাকে প্রশ্রয় দিলেন না। আজ হোক আর কাল হোক, এ-জাতীয় সমস্যায় আমাদের সবাইকে একদিন না একদিন পড়তে হয়; তবে আর্থারের। জীবনে সেই সমস্যাটা করার সময়

পাযলি। সৌভাগ্যের বিষয় তিনি অলস স্বপ্ন ছিলেন না; থাকলে, হ্যামলেটের মতোই তিনি আরব্ধ কর্ম সম্পাদন করার জন্যে দ্বিধা বা সংশয় প্রকাশ করতেন। যা অনেকেরই থাকে না–তাঁর সেইটি ছিল। সেটি হচ্ছে 'কমনসেনস'।

গত রাত্রিতে উন্মত্তের মতো ভ্রমণের কথা বিরক্তই হলেন। যে কাজ তাঁকে করতেই হবে তা। নিয়ে এতটা দুর্ভাবনার কারণ কী রয়েছে? কারণ, তিনি জানতেন হত্যার জন্যে চাই একটি মানুষ আর একজন পাদরি। কিন্তু জিনিস না হওয়ার ফলে তাঁর কোনো শত্রু ছিল না। তবু একটি দেবাদিষ্ট মহান কর্তব্য তাঁর সামনে থাকার পরে নিজেকে অজাশত্রু ভেবে তিনি কোনোরকম আত্মপ্রসাদ লাভ করলেন না। সেইজন্যে একটা কাগজের ওপরে বন্ধু আর। আত্মীয়-ভাবনা করে শেষ পর্যন্ত একটা নামই তিনি সাব্যস্ত করলেন। তাঁর নাম হচ্ছে লেডি ক্লিমেনটিনা বিক্যাম্প। বৃদ্ধাটিকে কার্ডল স্ট্রিটে। সম্বন্ধটা ছিল তাঁর মায়ের দিক থেকে সবাই তাঁকে লেডি ক্লেম বলে ডাকত। আর্থার নিজেও তাঁকে বেশ ভালোবাসতেন। তাছাড়া, লর্ড বাগরির সমস্ত সম্পত্তি পাওয়ার ফলে তাঁকে হত্যা করে আর্থারের যে কিছু আর্থিক সুবিধে হত তা নয়। সত্যি কথা বলতে কি বিষয়টা নিয়ে যতই ভাবতে লাগলেন ততই তাঁর মনে হল। হত্যা করার পক্ষে লেডি ক্লেমই একমাত্র মানুষ। দেরি করলে পাছে সাইবিলের ওপরে অবিচার করা হয় এই আশংকায় তিনি অনতিবিলম্বে সমস্ত পরিকল্পনা পাকা করে ফেললেন।

তার আগেও একটা কাজ ছিল তাঁর। সেটি হচ্ছে গণৎকারকে তাঁর কথামতো টাকা পাঠানো। মিঃ সেপটিমাস পডগারস-এর নামে ১০৫ পাউন্ডের একটা চেক লিখে সেটিকে তিনি একটা খামে মুড়লেন; তারপরে ওয়েস্ট মুন স্ট্রিটে চাকরের হাত দিয়ে সেটি

পাঠিয়ে দিলেন। তারপরে গাড়ি ঠিক করার জন্যে আস্তাবলে টেলিফোন করে তিনি পোশাক পরার জন্যে উঠে গেলেন। যাওয়ার সময় সাইবিলের ফটোর দিকে তাকিয়ে শপথ নিলেন যে তাঁর কপালে যাই থাকুক তিনি যে তাঁর জন্যে কী করছেন সেকথা তাঁকে তিনি কোনোদিনই জানতে দেবেন না; সমস্ত জিনিসটাকেই আত্মদান হিসেবে তিনি নিজের হৃদয়ের মণিকোঠায় লুকিয়ে রাখবেন।

বাকিংহাম যাওয়ার পথে ফুলের দোকান থেকে এক ঝুড়িনারসিসি ফুল কিনে তিনি সাইবিলের কাছে পাঠি লন; তারপরে হাজির হয়ে লাইব্রেরিতে গিয়ে দাঁড়ালেন। চাকরকে বললেন বিষবিজ্ঞানের ওপরে একটা বই আনতে। তিনি স্থির করে ফেললেন এই কষ্টকর আর কঠিন কাজে বিষ প্রয়োগই প্রশস্ত উপায়। সুলপ্রয়োগে হত্যা করাটা তাঁর কাছে কেমন যেন ঘৃণ্য বলে মনে হল। তাছাড়া জনসাধারণ জানতে পারে এমনভাবে কোনো কাজই তিনি করতে রাজি হলেন না। হত্যাকারীদের নামের তালিকার পাশে নোংরা খবরের কাগড়ে তাঁর নামটাও ছাপা হবে এটা ভাবতেও তাঁর মনটা কেমন সঙ্কুচিত হয়ে উঠল। তাছাড়া, আইবিলের বাবা-মাও হচ্ছেন সেই পুরনো আমলের। তাঁর নামে যদি হত্যাকারীর কলঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে তাহলে হয়তো এই বিয়েতে তাঁরাও আপত্তি করে বসবেন। যদিও একথা সত্যি যে কেন তিনি এই হত্যা করেছেন তার ইতিহাস আনুপূর্বিক জানলে সবাই তাঁকে প্রশংসাই করবে। সব দিক ভেবে সেই জন্যে বিষকেই তিনি নির্বাচন করলেন। এইটাই সবচেয়ে নিরাপদ, শান্ত আর নিশ্চিত উপায। মরার সময় মানুষ যেরকম যন্ত্রণা আর বেদনাদায়ক ক্রিয়াকলাপ দেখায়, এই বিষক্রিয়ায় মরণোন্মুখ মানুষের দেহে সে রকম কোনো বিকার দেখা যায় না। অধিকাংশ ইংরেজদের মতো এই দৃশ্য দেখতে তিনিও চান না।

কিন্তু বিষবিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর কোনো জ্ঞানই ছিল না। যে চাকরটিকে তিনি বিষের বই আনতে বলেছিলেন তার জ্ঞানও ছিল সেই রকমই অকিঞ্চিৎকর। সুতরাং তাঁকেই ঘুরে ঘুরে দেখতে হল। দু'চারটে বই-ও তিনি ওলটালেন কিন্তু সেগুলি এমন ভাবে আর ভাষায় লেখা যে তাদের কোনো অর্থই তিনি উদ্ধার করতে পারলেন না। তাঁর দুঃখ হল যে অক্সফোর্ডে পড়ার সময় ক্লাসিকগুলি তিনি মন দিয়ে পড়েননি। ঘাঁটতে-ঘাঁটতে হঠাৎ তিনি একটি বই পেযে গেলেন। বইটি আর্কক্সিন সাহেবের লেখা। পাতা ওলটাতে ওলটাতে তিনি হঠাৎ একটি ওষুধের নাম দেখতে পেলেন–ওষুধটির নাম হচ্ছে অ্যাকোনিটিন-তার গুণাবলী পরিষ্কার ঝরঝরে ইংরিজিতে লেখা পড়তে লাগলেন তিনি। এই বিষটির ক্রিয়া অত্যন্ত দ্রুত, বলা যায় একেবারে সঙ্গে সঙ্গে খাওয়ার অপেক্ষা মাত্র। এই বিষে কোনো যন্ত্রণা নেই। ভিলেটিনের সঙ্গে খেলে স্যার ম্যাথুর মতে খুব একটা খারাপ নয়। ভামার হাতায নামটা আর কতটা পরিমাণ খেলে মানুষ মরতো পারে সেইটা লিখে নিয়ে তিনি ডেমস স্ট্রিটের দিকে এগিয়ে গেলেন। সেখানে বেশ একটা বড়ো ওষুধের দোকান ছিল। তার নাম হচ্ছে পেমল অ্যান্ড হামবী। ধনী অভিজাত খদ্দেরদের মিঃ পেসল নিজেই অভ্যর্থনা করতেন। লর্ড আর্থারের কথা শুনে তিনি অবাক হয়ে বললেন ওই ওষুধ তিনি কী জন্যে চাইছেন, আর তার জন্যে চাই ডাক্তারের সার্টিফিকেট। আর্থার বললেন তাঁর বিরাট সে তাঁর কোচোয়ানকে কামড়ে দিয়েছে। তাকে মারার জন্যেই তাঁর ওই বিষ দরকার। কথাটা শুনে ভদ্রলোক সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর বিদ্যাবুদ্ধির তারিফ করে একটা প্রেসক্রিপশন লিখে ওষুধটা দিয়ে দিলেন।

লর্ড আর্থার ক্যাপসুলটিকে একটা ছোট্ট রুপোর কৌটোতে ঢুকিয়ে ‘পেসল আর হামবী’ কোম্পানির বিশ্রী কৌটোটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন; তারপরে, লেডি ক্লেমেনটিনার বাড়ির দিকে গাড়ি চালিয়ে দিলেন।

বৃদ্ধা মহিলাটির ঘরে ঢোকার সঙ্গে-সঙ্গে তিনি আনন্দের আতিশয্যে চিৎকার করে উঠলেন: দুষ্টু ছেলে কোথাকার! এতদিন আমাকে দেখতে আসনি কেন?

লর্ড আর্থার হেসে বললেন–প্রিয় লেডি ক্লেম; এতটুকু সময় পাইনি।

অর্থাৎ, সারা দিনই বুঝি তুমি সাইবিল মার্টনের সঙ্গে কেনাকাটা করার জন্যে দৌড়ে বেড়াচ্ছে আর রাতদিন আবোল-তাবোল বকছো? বিয়ে নিয়ে মানুষ এত হইচই করে কেন তা বাপু আমার মাথায় ঢোকে না। আমাদের দিনে প্রকাশ্যে বা ঘরের ভেতরে এই রকম প্রেমালাপ করার কথা আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারতাম না।

লেডি ক্লেম, আপনি নিশ্চিন্ত হল, গত চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে সাইবিলের সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। আমার বিশ্বাস সে এখন দডিদের নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে।

তাই বুঝি আমার মতো কুৎসিত বৃদ্ধা মহিলার সঙ্গে দেখা করবার সময় হল তোমার? পুরুষ মানুষেরা কেন যে সময় থেকে সাবধান হয় না তাই আমি অবাক হয়ে ভাবি। এই আমার কথাই ধর। আমার জন্যে পুরুষরা কত বোকামিই না করেছিল। কিন্তু আজ সেই আমি বেতো রোগীতে পরিণত হয়েছি, আমার দাঁত সব বাঁধানো; মেজাজটা তিরিক্তি; প্রিয়

লেডি জ্যানসেন যদি আমার রদ্দি ফরাসি উপন্যাস না পাঠাতেন তাহলে আমার দিন যে কী করে কাটত তা এক ঈশ্বরই জানেন। এক ফি নেওয়া ছাড়া ডাক্তাররা কোনো কাজের নয়। আমার হৃদয়ের জ্বালাটাও তারা সারাতে পারে না।

লর্ড আর্থর বেশ গম্ভীর হয়ে বললেন–সেই অসুখ সারানোর জন্যে আমি একটা ওষুধ নিয়ে এসেছি। ওষুধটা খুব ভালো। অ্যামেরিকাতেই এটা বেরিয়েছে। অ্যা

মেরিকার ওষুধ ভালো নয় আর্থার। না, না-মোটেই ভালো নয়। সম্প্রতি আমি কয়েকটা অ্যামেরিকান নভেল পড়লাম–যাচ্ছেতাই, যাচ্ছেতাই।

কিন্তু এ ওষুধটা যাচ্ছেতাই নয়, লেডি ক্লেম–আমি আপনাকে নিশ্চয় করে বলছি এটা একেবারে ধন্বন্তরি। আপনাকে আজকেই পরীক্ষা করতে হবে-প্রতিজ্ঞা করুন।

এই বলে পকেট থেকে ছোটো বাক্সটা বার করে আর্থার তাঁর হাতে দিলেন।

বাঃ, বাক্সটি তো বড়ো চমৎকার, আর্থার! সত্যি কি এটা উপহার? বাঃবাঃ! এইটি বুঝি সেই অদ্ভুত ওষুধ? আরে, দেখতে যে চিনির মেঠাই-এর মতো! আমি এখনই খাব।

তাঁর হাতটা ধরে লর্ড আর্থার ঝাঁঝিয়ে উঠলেন প্রায়-হা ঈশ্বর! না-না; লেডি ক্লেম ও কাজটা মোটেই করবেন না। এটা হচ্ছে একটা হোমিওপ্যাথি ওষুধ। বুকে যন্ত্রণা শুরু না

হলে এই ওষুধটা যদি খান তাহলে আপনার ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি বুকে যন্ত্রণা হলে তবেই এটা খাবেন। এর আশ্চর্য ফল দেখে আপনি অবাক হয়ে যাবেন।

সেই স্বচ্ছ ক্যাপসুলটি লেডি ক্লেম আলোর দিকে তুলে ধরে দেখলেন।

ক্যাপসুলের ভেতরে জলীয় অ্যাকোনিটিন টলটল করছিল। তাই দেখে তিনি। বললেন– এখনই আমার খেতে ইচ্ছে করছে। এটি যে সুস্বাদু সে দিক থেকে আমার কোলো। সন্দেহ নেই। আসল কথাটা কী জান? ডাক্তারদের আমি ঘৃণা করি, কিন্তু ওষুধ আমি বড়ো ভালোবাসি। যাই হোক, বুকে যন্ত্রণা না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব।

লর্ড আর্থার আগ্রহভরেই জিজ্ঞাসা করলেন-কবে নাগাদ হতে পারে মনে হচ্ছে? তাড়াতাড়ি হওয়ার কোনো সম্ভাবনা রয়েছে?

আশা করি, এক সপ্তাহের আগে নয়। গতকাল সকালেই ওটাকে নিয়ে বেশ ঝঞ্ঝাটে পড়েছিলাম। কিন্তু কখন যে দেখা দেবে কেউ তা জানে না।

লেডি ক্লেম, তাহলে এ মাসের শেষ নাগাদ নিশ্চয় একবার আসবনা, কী বলেন?

আমারও সেইরকমই ভয় হচ্ছে যেন। সত্যিই আর্থার, আজ তোমাকে বড়ো সহানুভূতিশীল দেখাচ্ছে! সাইবিল সত্যিই তোমার বড়ো উপকার করেছে। এখন আমাকে উঠতে হচ্ছে বাপু। যাদের সঙ্গে আমার আজ ডিনার খাওয়ার কথা তারা বড়ো অরসিক।

অপরের কলঙ্ক নিয়ে তারা আলোচনা করে না। আমি জানি এখন যদি একটু না ঘুমিয়ে নিই তাহলে ডিনারের সময় জেগে থাকা আমার পক্ষে কষ্টকর হবে। এখন এস আর্থার। সাইবিলকে আমার ভালোবাসা জানিযো। অ্যামেরিকান এই ওষুধটির জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ।

চলে আসার জন্যে দাঁড়িয়ে লর্ড আর্থার বললেন–তাহলে এটা খেতে ভুলবেন না, কেমন?

না, না, নিশ্চয় না। আমার কথা যে তোমার মনে রয়েছে তাতে আমি খুব খুশি হয়েছি। এই

ওষুধ আরো দরকার হলে তোমাকে আমি লিখে জানাব।

খুব আশ্বস্ত হয়ে বেশ খুশ মেজাজে লর্ড আর্থার বেরিয়ে এলেন।

সেই রাত্রিতেই সাইবিলের সঙ্গে তাঁর দেখা হল। তিনি তাঁকে জানালেন এমন একটি ভয়ঙ্কর জটিলতার মধ্যে তিনি জড়িয়ে যা ছিঁড়ে বেরিয়ে আসাটা তাঁর যে কেবল সম্মানের দিক। থেকেই হানিকর হবে, তা-ই নয়, কর্তব্যের দিক থেকেও এটি রয়ে যাবে। সেই জন্যে যত দিন না এই সমস্যার একটা সমাধান তিনি করতে পারছেন ততদিন বিয়েটা তিনি পিছিয়ে দিচ্ছেন। এই বিয়ের ব্যাপারে সাইবিলের মনে যাতে কোনো সন্দেহ না উল্লায় সেই জন্যে। তিনি তাঁকে অনেক বোঝালেন। সবই ঠিক হয়ে যাবে, তবে দরকার একটু ধৈর্যের।

সাইবিলও খুব খুশি হল। একবার আর্থারের মনে হল কাপুরুষের মতো লেডি ক্লেমকে সেই ওষুধ খাওয়ার কথাটা আর একবার স্মরণ করিয়ে দিয়েই তিনি বিয়ের ব্যাপারে এগিয়ে যাবেন, একবার তিনি পডগারস-এর কথা মন থেকে মুছে ফেলতে চাইলেন; কিন্তু বিবেক আর কর্তব্য শীঘই তাঁর ফিরে এল এবং কাঁদতে-কাঁদতে সাইবিল তাঁর বুকের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেও, স্বীয়। প্রতিজ্ঞা থেকে বিচ্যুত হলেন না তিনি। কয়েকটি মাসের আনন্দের জন্যে অমন সুন্দর একটি জীবনকে ধ্বংস করাটা অন্যায় হবে বলেই মনে হল তাঁর।

তিনি অনেক সান্ত্বনা দিনেল সাইবিলকে। সাইবিল-ও তাঁকে কম সান্ত্বনা দিল না। এইভাবে মাঝরাতে পর্যন্ত কাটিয়ে ভোরের দিকে তিনি ভেনিস যাত্রা করলেন। বিয়েটা স্থগিত রাখা যে অবশ্য প্রযোজনীয় সে-সম্বন্ধে একটা পুরুষোজনিত চিঠি লিখে তিনি মিঃ মার্টনকে পাঠিয়ে দিলেন।

.

০৪.

তাঁর ভাই, লর্ড সার্বিটোন তাঁর ছোটো জাহাজে করে কর্ফু থেকে তখন ভেনিসে এসে। পৌচেছেন। সেইখানেই তিনি উঠলেন। দুটি যুবক দিন পনেরো সেখানে বেশ আনন্দের সঙ্গেই কাটালেন। তবু লর্ড আর্থার কেমন যেন আনন্দ পাচ্ছিলেন না। প্রতিদিনই টাইমস

পত্রিকার শোকবার্তা জ্ঞাপক অংশটি তিনি পড়তে লাগলেন। প্রতিদিনই তিনি আশা করেছিলেন। ওইখানে লেডি ক্লেমেন্টিনার মৃত্যুর সংবাদ পাবেন। কিন্তু প্রতিদিনই হতাশ হচ্ছিলেন। তাঁর ভয় হল হয়তো তাঁর কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে। যখন তিনি সেই ওষুধটা পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন তখন যে তিনি তাঁকে বাধা দিয়েছিলেন একথা ভেবেই তাঁর বেশ অনুশোচনা হচ্ছিল।

দিন পনেরো কাটানোর পরেই লর্ড সার্বিটোনের ভেনিস আর ভালো লাগল না। তিনি ঠিক করলেন ব্র্যাভেলার উপকূল তিনি বন-মুরগি শিকার করে বেড়াবেন। লর্ড আর্থার প্রথমে তাঁর সঙ্গে যেতে রাজি হলেন। মাসের পনেরো তারিখে যাত্রা করলেন তাঁরা। কয়েক দিন বেশ। আনন্দেই কাটালেন কিন্তু হঠাৎ বাইশ তারিখে লেডি ক্লেমেন্টিনার কথা ভেবে তিনি অস্থির। হয়ে উঠলেন। ভাই-এর অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি ভেনিসে ট্রেনে চেপে ফিরে এলেন।

হোটেলে ঢুকতেই হোটেলের মালিক একখানা টেলিগ্রাম নিয়ে এগিয়ে এল। লর্ড আর্থার টেলিগ্রামটি তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে দেখলেন তাঁর পরিকল্পনা সার্থক হয়েছে। সতেরোই রাত্রিতে লেডি ক্লেমেন্টিনা হঠাৎ মারা গিয়েছেন।

প্রথমেই যাঁর কথা তাঁর মনে হল তিনি হচ্ছেন সাইবিল। তিনি তাঁকে একটা টেলিগ্রাম করে দিলেন যে এখনই তিনি লন্ডনে ফিরে আসছেন। তাড়াতাড়ি জিনিসপত্র গোছানোর জন্যে নির্দেশ দিলেন চাকরকে। তারপরে হোটেলে ফিরে এসেই দেখলেন তিনটি চিঠি তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছে একটি এসেছে সাইবিলের কাছ থেকে। চিঠিটিতে রয়েছে

সহানুভূতি আর শোক প্রকাশ। দ্বিতীয়টি এসেছে মায়ের কাছ থেকে তৃতীয়টি এসেছে লেডি ক্লেমেন্টিনার সলিসিটরের কাছ থেকে চিঠিটি পড়ে বোঝা গেল ভদ্রমহিলা সেদিন ডাচেসের সঙ্গে ডিনার খেয়েছেন। তাঁকে সেদিন বেশ প্রফুল্লই দেখা যায়; কিন্তু বুকে ব্যথা লাগছে এই বলে একটু তাড়াতাড়িই তিনি বাড়ি ফিরে যান। পরের দিন সকালে বিছানার ওপরে মৃত অবস্থায় তাঁকে দেখা যায়। মনে হচ্ছে মৃত্যুর সময় কোনো যন্ত্রণাই তিনি ভোগ করেননি। স্যার ম্যাথু বিড়কে তখনই ডেকে পাঠানো হয়। তবে তখন আর করার কিছু ছিল না। বাইশ তারিখে বিক্যাম্প। ক্যালকোটিতে তাঁকে কবরস্থ করা হবে। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে তিনি একটি উইল করেছেন। সেই উইলে তিনি আর্থারকে তাঁর কার্জন স্ট্রিটের বাড়ি-আসবাবপত্র, ব্যক্তিগত জিনিসপত্র, ছবি-সবই দিয়ে গিয়েছেন। কেবল ছোটো ছোটো কতগুলি ছবি দিয়েছেন তাঁর বোনকে; আর পদ্মরাগমণির হারটা দিয়ে গিয়েছেন সাইবিলকে। সম্পত্তির মূল্য এমন কিছু বেশি ছিল না। তবে সম্ভব হলে লর্ড আর্থার যাতে অনতিবিলম্বে ফিরে আসেন সেই জন্যে সলিসিটর মিঃ স্যালফিলড বিশেষ উদ্বিগ্ন রয়েছেন। কারণ অনেকগুলি পাওনাদারদের টাকা মেটাতে হবে; আর লেডি ক্লেমেন্টিনা কোনোদিনই বিশেষ হিসাবপত্র রাখতেন না।

লেডি ক্লেমেন্টিনা যে তাঁকে মনে রেখেছেন এই কথা ভেবে তিনি বেশ অভিভূত হয়েই পড়লেন। তাঁর মনে হল এই মৃত্যুর জন্যে মিঃ পডগারসকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে। কিন্তু সাইবিলের ওপরে ভালোবাসা তাঁর অন্য সব অনুভূতিগুলিকে ছাপিয়ে গেল এবং তিনি যে তাঁর কর্তব্য করেছেন এই ভেবে তিনি একটা শান্তি আর আত্মপ্রসাদত লাভ করলেন। তিনি যখন চারিংক্রশে হাজির হলেন তখন তাঁকে বেশ খুশি খুশি দেখা গেল।

মার্টনরা তাঁকে বেশ হৃদ্যতার সঙ্গেই অভ্যর্থনা জানালেন। সাইবিল তাঁকে প্রতিজ্ঞা করালেন যে তার কিছুই তাঁদের বিয়েতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবে না। সাতই জুন বিয়ের দিন ঠিক হল। হঠাৎ তাঁর মনে হল জীবনটা বড়ো সুন্দর, বড়ো উজ্জ্বল। পুরনো আনন্দ আবার ফিরে এল তাঁর জীবনে।

এরই মধ্যে একদিন সলিসিটর আর সাইবিলকে সঙ্গে নিয়ে তিনি কার্ডন স্ট্রিটের বাড়িতে হাজির হলেন। তারপরে সেখানে কাগজপত্র ঘাঁটতে লাগলেন। ঠিক এমনি সময় সাইবিল আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন।

মুখ তুলে হেসে লর্ড আর্থার জিজ্ঞাসা করলেন-ব্যাপার কী সাইবিল!

সাইবিল বলল–আর্থার, এই ছোটো চকোলেটের বাক্সটা কী সুন্দর দেখা এটা আমাকে দাও। আমি জানি আশি বছর বয়স হওয়ার আগে পদ্মরাগমণি আমাকে মানাবে না।

এটা সেই বাক্স যার ভেতরে অ্যাকোনিটিন ছিল।

চমকে উঠলেন লর্ড আর্থার। গালের ওপরে লজ্জার সামান্য একটা আভাও দেখা গেল। এসব কথা তিনি একেবারে ভুলেই গিয়েছিলেন, আর যার জন্যে তিনি সেই ভয়ঙ্কর অস্থিরতার মধ্যে দিয়ে দিন কাটিয়েছিলেন–এমনই ভাগ্যের পরিহাস যে–সেই সাইবিল-ই সেই কথাটা তাঁকে প্রথণ স্মরণ করিয়ে দিল।

বেশ তো, নাও না। লেডি ক্লেমকে আমিই এটা দিয়েছিলাম।

ধন্যবাদ আর্থার। চিনির মেঠাইটাও নিই? লেডি ক্লেম যে মিষ্টি এত ভালোবাসতেন তা আমি জানতাম না। আমার ধারণা ছিল তিনি একটু বেশি মাত্রায় বুদ্ধিজীবিনী ছিলেন।

হঠাৎ কেমন ভয়ঙ্কর রকমের বিবর্ণ হয়ে গেলেন লর্ড আর্থার, কী বললে-চিনির মেঠাই?

হা এর ভেতরে একটা রয়েছে দেখছি। বেশ পরনো বলেই মনে হচ্ছে এটা খাবার এতটক ইচ্ছেও অবশ্য আমার নেই। তোমার কী হল, আর্থার? অত ফ্যাকাশে হয়ে গেলে কেন?

দৌড়ে গিয়ে লর্ড আর্থার বাক্সটা তুলে নিলেন। তার ভেতরে বিষভরা সেই ক্যাপসুল। সেটাকে তিনি আগুনের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে হতাশভাবে চিৎকার করে সোফার ওপরে বসে পড়লেন।

.

০৫.

বিয়েটা দ্বিতীয়বার স্থগিত হওয়ার ফলে মিঃ মার্টন খুবই দুঃখিত হলেন। লেডি জুলিয়া মেয়ের বিয়েকে উপলক্ষ করে নিজের জন্যে পোশাক তৈরি করতে দিয়েছিলেন। বিয়েটা

সাময়িকভাবে বন্ধ হল দেখে এ-বিয়ে ভেঙে দেওয়ার জন্যে মেয়েরে তিনি অনেক বোঝালেন। সাইবিল মাকে ভালোবাসতেন সত্যি কথা; কিন্তু আর্থারের কাছেই তিনি তাঁর জীবন-যৌবন সমর্পণ করেছিলেন। সুতরাং মায়ের প্রস্তাবে তিনি রাজি হলেন না। আর লর্ড আর্থার! দিল। কয়েক এই অভাবনীয় কাণ্ডে তাঁর স্নায়ুগুলি একেবারে বিকল হয়ে গেল। তারপরেই কিন্তু তাঁর অদ্ভুত কমনসেনস অথবা বাস্তব জ্ঞনটি ফিরে এল। এবং কী করতে হবে সেদিক থেকে কোনোরকম সন্দেহ রইল না তাঁল, বিষ ব্যর্থ হওয়ায় এখন তাঁকে ডিনামাইট অথবা অন্য কোনো বিস্ফোরক বস্তুর সাহায্য নিতে হবে।

এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে তিনি আবার তাঁর বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন আর। পরিচিত-পরিচিতদের তালিকা নিয়ে বসলেন। অনেক চিন্তা-গবেষণার পরে ঠিক করলেন যে তাঁর কাকা চিচেস্টারের ডিনকেই তিনি উড়িয়ে দেবেন এই ডিনটি ছিলেন সত্যিকারের। পণ্ডিত আর সংস্কৃতিবান পুরুষ। ঘড়ি জিনিসটাকে বড়ো ভালোবাসতেন তিনি। ঘড়ি সংগ্রহ করার একটা শখ ছিল তাঁর। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত কত রকমেরই না টাইম-পিস তাঁর ছিল! আর্থার ভাবলেন ওই শখই বিস্ফোরক দ্রব্য ব্যবহার করার অভূতপূর্ব সুযোগ তাঁকে এনে দিয়েছে। কিন্তু বিপদ হল এই জাতীয় বিস্ফোরক কোথায় পাওয়া যায় তা তিনি জানেন না। একবার ভাবলেন স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। কিন্তু সে বাসনা তাঁকে পরিত্যাগ করতে হল; কারণ তিনি জানতেন যে বিস্ফোরণ ঘটার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত বিস্ফোরক দ্রব্যের গতিবিধি সম্বন্ধে তারা কিছুই জানতে পারে না; ঘটার পরেও যা ডলতে পারে তাও এমন কিছু নয়।

হঠাৎ বন্ধু রুবালোফের কথা তাঁর মনে পড়ে গেল। বিপ্লবী মনোভাবাপন্ন এই যবুকটির সঙ্গে লেডি উইনডারমিয়ারের বাড়িতে শীতকালে তাঁর আলাপ হয়েছিল। গুজব, কাউন্ট রুবালোফ সম্প্রতি তোর মিস্ত্রি হিসাবে বাস করছিলেন সেই সময়কার কাগজপত্র পরীক্ষা উল্যেই তিনি নাকি এখানে রয়েছেন, কিন্তু অনেকেরই বিশ্বাস রুবালোফ নিহিলিস্টদের একটি এডেন্ট। রাশিযার রাষ্ট্রদূতাবাস যে তাঁর লন্ডনে অবস্থিতিটাকে ভালো চোখে দেখবে না এবিষয়ে আর সন্দেহ কী! লর্ড আর্থার-এর মনে হল এবিষয়ে রবালো-ই তাঁকে সাহায্য করতে পারবেন; এই ভেবে তিনি একদিন সকালে তাঁর বাসা ব্লুমসবারিতে হাজির হলেন। তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করতে।

লর্ড আর্থার তাঁর সেখানে যাওয়ার উদ্দেশ্যটা বিবৃত করলেন। তাই শুনে কাউন্ট রুবালোফ। বললেন–তাহলে আপনি রাজনীতিতেই নিজেকে ডুবিয়ে দিলেন? কিন্তু হাঁকডাক করে কোনো কিছু করার পক্ষপাতী। লর্ড আর্থার কোনোদিনই ছিলেন না। তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে সামাজিক কোনো প্রশ্ন নিয়ে সম্প্রতি তিনি বিব্রত নন। তিনি বিস্ফোরক দ্রব্য চান নিছক সাংসারিক একটি সমস্যার সমাধান করতে আর এই সমস্যা সমাধানে উপকার একমাত্র তার নিজেরই হবে, আর কারও ন্য।

কয়েকটি মুহূর্ত কাউন্ট রুবালোফ তাঁর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন; কিন্তু তাঁকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখে ছোটো একটা কাগভে ঠিকানা লিখে তলায় সই করলেন, তারপরে, টেবিলের এক পাশ থেকে সেটি তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিলেন, বললেন প্রিয় বন্ধু, এই ঠিকানাটা জোগাড় করার জন্যে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড অনেক অর্থ খরচ করবে।

লর্ড আর্থার হেসে বললেন—এ-ঠিকানা কিছুতেই তারা পাবে না।

এই বলে পরম হৃদ্যতার সঙ্গে যুবক রাশিয়ানটির করমর্দন করে তিনি প্রায় দৌড়ে নীচে নেমে এলেন; তারপরে কাগজটি পরীা করে কোচোয়ানকে সোহো স্কোয়ারের দিকে গাড়ি চালাতে। বুললেন।

সোহো স্কোয়ারের এসে কোচোয়ানকে বিদায় দিয়ে গ্রীক স্ট্রিটের ওপর দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে তিনি একটি জায়গায় এসে হাজির হলেন। ডাযগাটির নাম বেইলির কোর্ট। এইখানে একটা খিলানের ভেতর দিয়ে যেখানে তিনি এসে পৌঁছলেন সেখানে একটা ফ্রেঞ্চ লনড্রি ছিল। এই লনড্রির পাশ ধরে ঘরের পর ঘরের উঠোনে অসংখ্য পোশাক তারের ওপরে ঝোলানো ছিল। দেখলেই মনে হবে ওটা একটা ধোপাদের পাড়া। তিনি সোজা হেঁটে গিয়ে ওই লাইনের। একেবারে শেষ প্রান্তে উপস্থিত হলেন; তারপরে ছোটো সবুজ রঙের একটা ঘরের দরজায়। টোকা দিলেন। টোকা দেওয়ার পরেই আশপাশের জানালা থেকে কৌতূহলী দৃষ্টি তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল। তারও কিছুক্ষণ পরে দরজা খুলে গেল, একটি রুক্ষ চেহারার বিদেশি বিকৃত ইংরেজ ভাষায় তাঁকে জিজ্ঞাসা করল—কাকে চাই? লর্ড আর্থার কাউন্ট রুবালোফের চিরকুটটা তার হাতে দিলেন। চিরকুটটার ওপরে চোখ বুলিয়েই লোকটি তার মাথাটা নীচু করে তাঁকে ভেতরে ডেকে নিয়ে গেল। একতলার একটি বিশ্রী ঘরে আর্থার গিয়ে বসলেন। অনতিবিলম্বে হার উইনকেলকফ নামে, ওই নামে লন্ডনে তিনি পরিচিত, একটি লোক ঘরে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর ঘাড়টা মদে ভেজা একটা রুমাল দিয়ে জড়ানো; বাঁ হাতে একটা ফ্রক।

লর্ড আর্থার তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে বললেন—কাউন্ট রুবালো আপনাকে দেওয়ার জন্যে আমাকে একটি পরিচয়পত্র দিয়েছেন। বিশেষ একটা ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কিঞ্চিৎ আলোচনা করতে আমি এখানে এসেছি। আমার নাম স্মিথ-রবার্ট স্মিথ। একটা বিস্ফোরক ঘড়ির জন্যে আমি আপনার কাছে এসেছি।

সেই ভদ্রবেশী জার্মানটি হেসে বললেন—আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমি খুশি হয়েছি। অত ভয় পাবেন না। সকলের সঙ্গে পরিচিত হওয়াটাই আমার কর্তব্য। একদিন সন্ধ্যায় লেডি উইনডারমিয়ারের বাড়িতে আপনাকে আমি দেখেছি। আশা করি হার লেডিশিপ বহাল তবিয়তেই রয়েছেন। আমার সঙ্গে একটু ব্রেকফাস্ট খাবেন কি? আমাদের খাবার বড়ো চমৎকার; আর আমার বন্ধুরা যা করে বলেন, আমার এখানে যে উৎকৃষ্ট ধরনের রাইন মদ পাওয়া যায় সেরকম বস্তু জার্মান এমব্যাসিতেও দুষ্প্রাপ্য।

ধরা পড়ে গিয়েছে বুঝতে পারার আগেই আর্থারকে নিয়ে তিনি পেছনের ঘরে বসালেন। তারপরেই উৎকৃষ্ট খাবার আর বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনাতে আর্থার জমে গেলেন।

হার উইনকেলকফ বললেন—আজকাল রপ্তানির দিক থেকে বিস্ফেরক ঘড়িগুলি বিশেষ কাজের নয়। কাস্টমস-এর হাত থেকে কোনোরকমে ছাড়ান যদি বা পেল তো পড়ল ট্রেনের। খপ্পরে। ট্রেন সারভিস আজকাল এমনি অখদ্যে হয়ে উঠেছে যে গন্তব্যস্থলে পৌঁছবার আগেই ওগুলি ফেটে যায়। যদি অবশ্য বাড়িতে ব্যবহার করার জন্যে ওরকম কোনো ঘড়ির দরকার। আপনার হয় তাহলে আপনাকে আমি একটা সুন্দর জিনিস দিতে পারি এবং আমি নিশ্চিত যে তার ফল সেযে আপনি সন্তুষ্ট হবেন। কার জন্যে এ-

জিনিসটা আপনার দরকার তা কি আমি জানতে পারি? যদি পুলিশ অথবা স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সঙ্গে যুক্ত কার-ও জন্যে দরকার হয় তাহলে আমি দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে এবিষয়ে আপনাকে আমি কোনোরকম সাহায্য করতে পারব না। ইংরাজ গোয়েন্দারাই আমাদের সত্যিকারের বড়ো বন্ধ। আমি সব সময়ে লক্ষ করেছি তাদের মূর্খতার ওপরে আস্থা রেখে আমরা যা ইচ্ছে তাই করতে পারি। তাদের বিনাশ করার জন্যে আপনাকে আমি কোনো সাহায্য করতে পারব না।

লর্ড আর্থার বললেন–আপনি নিশ্চিন্ত হোন-এর সঙ্গে পলিশের কোনো সম্পর্ক নেই। সত্যি। কথা বলতে কি চিচেস্টারের ডিন-এর জন্যেই ঘড়িটা আমার দরকার।

তাই বুঝি! ধর্মের প্রতি আপনার এত আনুগত্য রয়েছে তা তো আমি জানতাম না! আজকাল যুব সম্প্রদায়ের ভেতরে এ-জিনিসটা সাধারণত দেখা যায় না।

একটু লজ্জা পেয়ে লর্ড আর্থার বললেন–আপনি একটু বাড়িয়ে বলছেন, হার উইনকেলকফ। সত্যি কথা বলতে কি, ধর্ম সম্বন্ধে আমার জ্ঞান খুবই কম।

এটা তাহলে একেবারে ব্যক্তিগত ব্যাপার?

একেবারে।

হার উইনকেলকফ তাঁর কাঁধটিকে কুঁচকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন; তারপরে ফিরে এলেন ছোটো পেনির মাপের একটা ডিনামাইট কেক আর সুন্দর একটা ফরাসি ঘড়ি নিয়ে।

বস্তু দুটি দেখেই লর্ড আর্থারের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি বেশ আনন্দের সঙ্গেই বললেন–এই রকম একটা জিনিসই আমার চাই। এখন বলুন কেমন করে এটা ফাটবে।

নিজের আবিষ্কারের দিকে গর্বের সঙ্গে তাকিয়ে হারউইনকেলকফ বললেন–ওইখানেই আমার রহস্য। কখন আপনি বিস্ফোরণ ঘটাতে চান বলুন। আমি জিনিসটাকে একেবারে কাঁটায়-কাঁটায় ঠিক করে দেব।

ধরুন মঙ্গলবার, আজই যদি দিতে পারেন

অসম্ভব। মস্কোতে বন্ধুদের জন্যে আমার হাতে কিছু জরুরি কাজ রয়েছে। কাল পাঠাতে পারি।

লর্ড আর্থার বিনীতভাবে বললেন–তাহলেই চলবে-কাল রাত্রি অথবা মঙ্গলবার সকালে পেলেও বিশেষ কোনো অসুবিধে হবে না। শুক্রবার দুপুরের দিকে এই বিস্ফোরণ ঘটানো চাই। ডিন শুক্রবার দুপুরে বাড়িতেই থাকেন।

শুক্রবার, দুপুর-হারউইনকেলকফ কাগজে সময়টা টুকে নিলেন।

উঠে পড়ে আর্থার ডিজ্ঞাসা করলেন–কত দিতে হবে আমাকে?

লর্ড আর্থার, জিনিসটা এত সামান্য যে বেশি কিছু নিতে আমি চাই নো ডিনামাইটের দাম সাড়ে সাত শিলিং: ঘড়িটার দাম সাড়ে তিন পাউন্ড আর গাড়িভাড়া হচ্ছে পাঁচ শিলিং। কাউন্ট রুবালোফের কোনো বন্ধুর উপকার করতে পারলেই আমি কৃতার্থ।

আপনার পারিশ্রমিক?

ও কিছু নয়, কিছুনয়। অর্থের জন্যে আমি কাজ করি নে; করি, দক্ষতার জন্যে।

দাম মিটিয়ে দিয়ে লর্ড আর্থার সেখান থেকে বেরিয়ে এলেন।

পরের দুটি দিন বিরাট একটা উত্তেজনার ভেতর দিয়ে কেটে গেল তাঁর। শুক্রবার বেলা বারোটার সময় সংবাদ আহরণ করার জন্যে তিনি বাকিংহামে হাজির হলেন। সারাটা বিকাল ভাবলেশহীন হল-পোর্টার' সংবাদের পর সংবাদ ছড়িয়ে গেল। নানা অঞ্চলের ঘোড়-দৌড-এর খবর, বিবাহ-বিচ্ছেদের খবরল, আবহাওয়ার খবর, হাউস-অফ-কমনসে সারা রাত ধরে যে সব তর্ক-বিতর্ক হয়েছে, সেই সব বিরক্তিকর সংবাদ, ফাটকা বাজারে যে আতংকের সৃষ্টি হয়েছে সেই সব টুকরো টুকরো কাহিনি। চারটে সময় নানান কাগজের সান্ধ্য গুলি একটার পর একটা আসতে লাগল। পল মল' এল, 'সেন্ট জেমস' এল, গ্লোব এল, এল 'ইকো'। কোনো কাগজেই চিচেস্টারের কোনো সংবাদ নেই। লর্ড

আর্থার ভাবলেন–প্রচেষ্টাটি নিশ্চয় তাঁর ব্যর্থ হয়েছে। এটা তাঁর কাছে বিরাট একটি আঘাত হয়ে দেখা দিল। বেশ ঘাবড়িয়ে গেলেন তিনি। পরের দিন তিনি হার উইনকেলকফের সঙ্গে দেখা। করলেন। বিস্ফোরণ ঘটেনি, সংবাদ পেয়ে তিনি বিস্তারিতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করে বিনা মূল্যে তাঁকে আর একটা ওই জাতীয় ঘড়ি দিতে চাইলেন; অথবা, কেনা দামে চাইলেন কয়েকটি নাইট্রোগ্লিসিরিল বোমা বিক্রি করতে। কিন্তু বিস্ফোরক দ্রব্যের ওপরে আর তাঁর আস্থা নেই। হার উইকেল অবশ্য বললেন এই ভেজালের যুগে ডিনামাইটের বারুদেও ভেজাল ঢুকেছে। এদিক থেকে তিনি নিরুপায়। জার্মান ভদ্রলোকটি অবশ্য মনে করেন যন্ত্রপাতি কিছুটা বিগড়ে গেলেও এক সময় না এক সময় ওটি ফাটবেই। এইরকম একটা আশা প্রকাশ করে তিনি একটি উদাহরণ দিলেন। একবার ওদেসার সামরিক গভর্নরের কাছে একটি ব্যারোমিটার পাঠানো হয়। কথা ছিল দশ দিনের মধ্যে সেটি ফাটবে। কিন্তু আগামী তিন মাসের মধ্যেও সেটি ফাটেনি। তারপরে যখন ফাটল তারই ছ'সপ্তাহ আগে গভর্নর শহরের বাইরে বেরিয়ে গিয়েছেন। সেই বিস্ফোরণ মারা গেল তাঁর একটি পরিচারিকা। বেচারার দেহটা একেবারে দলা পাকিয়ে গেল। এই থেকেই বোঝা যায় এই সব বিস্ফোরক দ্রব্যের সময়জ্ঞান না থাকলেও বড়োই শক্তিশালী। এই কাহিনি শুনে লর্ড আর্থার কিছুটা সান্ত্বনা যে পেলেন না তা নয়; কিন্তু দু'দিন পরে সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় ডাচেস যখন তাঁকে একখানি চিঠি দেখালেন তখনই তিনি একেবারে নিরাশ হয়ে গেলেন। চিঠিটা সেইমাত্র ডিনারি থেকে তিনি পেয়েছিলেন।

ডাচেস বললেন–ড্রেন বড়ো সুন্দর চিঠি লেখে। এটা তোমার শেষকালে পড়া উচিত। মুডি আমাকে যে সব উপন্যাস পাঠায় এটি তাদেরই মতো সুখপাঠ্য।

চিঠিটা মায়ের হাত থেকে নিয়ে লর্ড আর্থার পড়তে লাগলেন।

দি ডিনারি, চিচেস্টার,
২৭শে মে

প্রিয় কাকিমা,
ডোরকাস সোসাইটির জন্যে তুমি যে ফ্ল্যানেল পাঠিয়ে তার জন্যে ধন্যবাদ, আর সেই সঙ্গে ডোরাকাটা সুতোর কাপড়ের জন্যে আমি তোমার সঙ্গে একমত যে সুন্দর সুন্দর পোশাক। পরার ইচ্ছে হওয়াটা ওদের উচিত নয়। কিন্তু আজকাল সবাই এত রাডিকেল আর অধার্মিক হয়ে পড়েছে যে অভিজাত সম্প্রদায়ের মতো পোশাক-পরিচ্ছদ পরাটা যে তাদের পক্ষে উচিত নয় সেকথা তাদের কিছুতেই বোঝানো যাবে না। কী দুদিনই যে আসছে তা আমি বুঝতে পারাছি নো ধর্মসভায় বাবা বারবারই বলেছেন আমরা অবিশ্বাসের যুগে বাস করছি।

গত বৃহস্পতিবার বাবার কোনো একজন অজ্ঞাত গুণমুগ্ধ ব্যক্তি বাবাকে একটি ঘড়ি পাঠিয়েছেন। ঘড়িটা পেয়ে আমাদের যে কী আনন্দ হয়েছিল তোমাক কী বলব! একটা কাঠের বাক্সের ভেতরে প্যাক করা ছিল ঘড়িটা প্রেরক ঘড়িটা পাঠানোর খরচ নিজেই দিয়ে দিয়েছিলেন। যথেচ্ছাচারিতাই কি স্বাধীনতা'–এর ওপরে বাবা একটি ধর্মসভাযএকবার একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দিয়েছিলেন। বাবার ধারণা ঘড়িপ্রেরকটি বাবার সেই বাণী শুলেছিলেন। ঘড়ির ওপরে ছিল একটি মহিলার প্রতিকৃতি। তার মাথায় ছিল

একটা টুপি। বাবা বলেন ওটি হচ্ছে স্বাধীনতার প্রতীক। জিনিসটা দেখতে আমার কাছে বেশ ভালো লাগেনি, কিন্তু বাবা বলেন-ওটা হচ্ছে ঐতিহাসিক। বাবার কথায় আমারও তাই মনে হয়েছিল। পার্কার বাক্সটাকে খুললে বাবা লাইব্রেরির কুলুঙ্গিতে ঘড়িটা রেখে দিলেন। শুক্রবার দিন সকালে আমরা সবাই বসে রয়েছি। বারোটা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা ফুসফুস শব্দ হল প্রতিমূর্তিটার পায়ের তলা থেকে কিছুটা ধোঁয়া বেরোল; আর স্বাধীনতার দেবী পড়ে গেল। নীচে পড়ে গিয়ে নাকটা ভাঙল তারা মারিয়া তো ভয়ে অস্থির কিন্তু ব্যাপার দেখে ভেমস আর আমি তো হেসে কুটিকুটি এমন কি বাবাও মুখ টিপে হেসে ফেললেন। পরীক্ষা করার। পরে আমরা বুঝতে পারলাম আসলে ওটা একটা অ্যালার্ম দেওয়া ঘড়ি। ও ভেতরে কিছু বারুদ আর ছোটো হাতুড়িটার নীচে একটা টুপি বসিযে যদি ঘড়ির কাঁটাটাকে ঠিক জায়গায় ঘুরিয়ে দাও তাহলে ঠিক সেই সময় সেটা ফেটে যাবে। ওই রকম শব্দ করে বলেই বাবা ওটাকে লাইব্রেরি ঘরে রাখতে চাইলেন না। তাই রেডি তাকে স্কুল ঘরে রেখে এল। সেখানেও কেবল ফুসফুস, ফরফর করে শব্দ করছে। তোমার কি মনে হয় বিয়ের উপহার হিসাবে ওই রকম একটা ঘড়ি দিলে আর্থার খুশি হবো লন্ডনে আজকাল এই সব জিনিসের চলনই বেশি! বাবা বলেনএরাই মানুষের মতল করবে। কারণ এ থেকেই বোঝা যায় যে স্বাধীনতার পরমায়ু বেশি দিনের নয় ও মরে যেতে বাধ্য। তা ছাড়া স্বাধীনতা শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে ফরাসি বিপ্লব থেকে। কী ভয়ঙ্কর

–জেন পারসি।

চিঠিটা পড়ে আর্থার এতই গম্ভীর আর ধূমথমে হয়ে গেলেন যে ডাচেস তো হেসেই খুন। প্রিয় আর্থার, আর কোনোদিনই কোনো যুবতীর চিঠি তোমাকে আমি পড়তে দেব না।

কিন্তু ঘড়িটার সম্বন্ধে কী বলব বল তো? আমার নিজেরই ওইরকম একটা ঘড়ি পেতে ইচ্ছে করছে।

একটা বিষণ্ণ হাসি হেসে আর্থার বললেন–ওসব কিছু নয়। এই বলে মাকে চুমু খেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

ওপরে উঠেই একটা সোফার ওফরে তিনি ঢলে পড়লেন। তাঁর চোখ দুটি জলে ভরে উঠল। এই হত্যা করার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা তিনি করেছেন; কিন্তু দু-দুবারই তিনি ব্যর্থ হয়েছেন; আর সেই ব্যর্থতার জন্যে তিনি নিজে এতটুকু দায়ী নন। কর্তব্য করার চেষ্টা তিনি করেছেন, কিন্তু মনে হচ্ছে ভাগ্য তাঁর সঙ্গে বারবার প্রতারণা করেছে। কী করবেন তিনি? এই বিয়ে ভেঙে দেবেন? আইবিলের যে কষ্ট হবে সেটা ঠিক; কিন্তু তাতে তাঁর মতো উন্নত চরিত্রের অবনতি ঘটবে না এতটুকু। আর তাঁর কথা? তিনিও কষ্ট পাবেন সত্যি কথা। কিন্তু তাতে কী আসে যায়? সব সময়েই তো যুদ্ধ হচ্ছে। তাতে মানুষ মারা যেতে পারে। এমন কোনো কারণ ঘটতে পারে যার জন্যে মানুষকে জীবন দান করতে হয়। জীবনে তাঁর কোনো আনন্দ নেই বলেই মৃত্যুতেও তাঁর কোনো ভয় নেই। ভাগ্যই তাঁর ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করুক। তাকে সাহায্য করার জন্যে তিনি একটুও চেষ্টা করব না।

রাত্রি সাড়ে সাতটার সময় পোশাক পরে তিনি ক্লাবে গেলেন। একদল যুবকের সঙ্গে আর্বিটান সেখানে বসেছিলেন। তাঁদের সঙ্গেই তাঁর ডিনার খাওয়ার কথা ছিল। তাঁদের সেই হালকা। আলোচনা তাঁর ভালো লাগল না। কফি আসার সঙ্গে-সঙ্গে একটা জরুরি কাজের অছিলায় তিনি ক্লাব ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। বেরিয়ে আসার সময় ক্লাবের বেয়ারা

তাঁর হাতে একখানা চিঠি দিল। চিঠি এসেছিল হার উইনকেলকফের কাছ থেকে। তাঁর কাছে একটা বিস্ফোরক ছাতা রয়েছে। সেই ছাতা খেলার সঙ্গে-সঙ্গে বিস্ফোরণ ঘটে যাবে। এটাই হচ্ছে সর্বশেষ আবিষ্কার–সম্প্রতি জেনেভা থেকে আমদানি হয়েছে। সেই ছাতাটা দেখার জন্যে আর্থারকে তিনি পরের দিন সকালে তাঁর বাসায় আসতে অনুরোধ করেছিলেন। চিঠিটাকে তিনি টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললেন। আর কোনো পরীক্ষা করবেন না বলে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তারপরে টেমস নদীর বাঁধের ওপরে তিনি ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। ঘণ্টার পর ঘন্টা বসে রইলেন নদীর ধারে। ছোটো-ছোটো মেঘের ভেতর দিয়ে চাঁদ উঁকি দিতে লাগল; বড়ো বড়ো নৌকোগুলি নদীর তীব্র স্রোতের ওপরে পাক খেয়ে-খেয়ে ঘুরতে লাগল। পোলের ওপর দিয়ে চিৎকার করতে করতে ট্রেন চলার সময় রেলের সঙ্কেত সবুজ থেকে লাল হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরেই ওয়েস্টমিনিস্টারের দীর্ঘ গম্বুজ থেকে রাত বারোটার ঘণ্টা বাড়লো সেই উচ্চনিনাদী শব্দের তালে-তালে রাত্রিটা কাঁপতে লাগল যেন। তারপরে রেল স্টেশনের আলো গেল নিবে। জ্বালা রইল রুবির মতো একটি মাত্র আলো। শহর ধীরে ধীরে স্তব্ধ হয়ে আসতে লাগল।

রাত্রি প্রায় দুটোর সময় তিনি উঠলেন। হাঁটতে লাগলেন ব্ল্যাকফ্রায়ার্স এর দিকে। কত অপার্থিব, কত স্বপ্নময়ই না সব দেখাচ্ছে মনে হচ্ছে নদীর উলটো দিকে বাড়িগুলি সব অন্ধকার দিয়ে তৈরি হয়েছে। দেখলে মনে হবে রুপো আর ছায়া দিয়েই বিশ্বটা তৈরি হয়েছে। সেই কুয়াশাচ্ছন্ন বাতাসের মধ্যে সেন্ট পলের উঁচু গম্বুজটাকে একটা বুদবুদের মতো মনে হল।

ক্লিয়োপেট্রার নিডল-এ এসে পৌঁছতেই তিনি দেখতে পেলেন একটা লোক কার্নিশের ওপরে ঝুঁকে পড়ে কী যেন দেখছে। কাছাকাছি আসতেই লোকটি ওপর দিকে তাকাল। সেই সময় গ্যাসের আলোটা তার মুখের ওপরে গিয়ে পড়ল।

লোকটি আর কেউ নন, মিঃ পডগারস, সেই গণৎকার। সেই থ্যাবড়া, থলথলে মুখ, সোনা দিয়ে বাঁধালো চশমা, রুগ্ন হাসি, আর কামার্ত মুখের চেহারা দেখে অন্য লোক বলে ভুল হওয়ার উপায় নেই কারও।

লর্ড আর্থার দাঁড়িয়ে পড়লেন। মগড়ের মধ্যে একটা চমৎকার চিন্তা খেলে গেল তাঁরা নিঃশব্দে তিনি তাঁর পেছনে গিয়ে দাঁড়ালেন। তারপরে ঝটিতি তাঁর পা দুটো ধরে সোডা তিনি তাঁকে টেমস নদীর জলে ফেলে দিলেন। একটা গালাগালির শব্দ শোনা গেল; তারপরেই শোনা গেল ঝপাং করে একটা জিনিস জলে পড়ার শব্দ। তারপরেই সব চুপচাপ। অস্থিরচিত্তে লর্ড আর্থার সেই দিকে চেয়ে রইলেন। কিন্তু গণৎকারের আর কিছুই দেখা গেল না। শুধু তাঁর উঁচু টুপিটা চন্দরকরোজ্জ্বল নদীর জলে নাচতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে তাও গেল তালিয়ে। মিঃ পডগারস-এর কোনো চিহ্ন আর দেখা গেল না। একবার মনে হল তাঁর বিকৃত দেহটা পোলের সিড়িঁটা আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করছে, কিন্তু তারপরেই মন হল ওটা ছায়া ছাড়া আর কিছু নয়। আকাশে চাঁদ দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই ছায়াটাও মিলিয়ে গেল। ভাগ্যের বিধান কী ছিল এবার তিনি তা যেন বুঝত পারলেন। একটা বিরাট স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি। তারপরেই সাইবিলের নামটা তাঁর ঠোঁটের ডগায় এসে উপস্থিত হল।

পরের কটা দিন আশা আর ভয়ের আবর্তে তিনি পাক খেতে লাগলেন। মাঝে-মাঝে তাঁর মনে হত এই বুঝি মিঃ পডগারস তাঁর ঘরে এসে হাজির হন। কিন্তু অন্য সময় তাঁর মনে। হত-না; ভাগ্য কি তাঁর ওপরে এত নির্দয় হতে পারে? দু'দুবার তিনি গণৎকারের বাড়ির সামলে গেলেন; কিন্তু কিছুতেই বেল বাজাতে পারলেন না। তিনি নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ভয়ে সেকথা কাউকে জিজ্ঞাসা করতে পারছিলেন না।

অবশেষে সংবাদ এল। চা খাওয়ার পর ক্লাবের ধুমপান করার ঘরে তিনি বলেছিলেন এমন সময় বেহারা কয়েকটি কাগজের সান্ধ্য সংস্করণ নিয়ে হাজির হল। সেন্ট জেমস কাগজটা। তুলে নিয়ে তিনি চোখ বুলিয়ে যাচ্ছিলেন এমন সময় একটা বেশ বড়ো অক্ষরে ছাপা বিশেষ একটি সংবাদ তাঁর চোখে পড়ল।

গণৎকারের আত্মহত্যা

উত্তেজনায় কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে গেলেন তিনি। তাড়াতাড়ি পড়তে লাগলেন। সংবাদিট হচ্ছে —

গতকাল সকালে সাতটার সময় মিঃ সেপটিমাস আর, পডগারসবিখ্যাত হস্তপরীহক-এর। মৃতদেহ গ্রীনউইচ উপকূলে পাওয়া গিয়েছে, শ্যিপ হোটেলের ঠিক সামনেই হতভাগ্য ভদ্রলোককে কয়েকদিন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। গণৎকারদের সমাজে তাঁর জন্যে বেশ উদ্বেগ প্রকাশ করা হচ্ছিল। মনে হচ্ছে সামরিক মস্তিষ্ক বিকারের ঝোঁকে তিনি আত্মহত্যা করেছেন। হয়তো, অতিরিক্ত পরিশ্রমই এর জন্যে দায়ী। করোনাররাও এই মন্তব্য প্রকাশ

করেছেন। মিঃ পডগারস সম্প্রতি 'মানুষের হাত'–এই বিষয়ে একটি বিশদ পুস্তক রচনার কাজ শেষ করেছেন। সেটি শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। হলে, একটা আলোড়নের সৃষ্টি হবে চারপাশে। মৃত ব্যক্তির বয়স ছিল পঁয়ষট্টি বছর। তাঁর কোনো আত্মীয়-স্বজন নেই বলেই আমাদের মনে হয়।

কাগজটা হাতে নিয়ে লর্ড আর্থার ক্লাব থেকে ছুটে বেরিয়ে এলেন। তারপরেই সোডা পার্ক লেন। জানালা থেকে সাইবিল তাঁকে দেখলেন। দেখেই তাঁর মনে হল নিশ্চয় কোনো শুভ সংবাদ রয়েছে। তাড়াতাড়ি নেমে এলেন তিনি। আর্থারের সঙ্গে দেখা হতেই তিনি। বুঝলেন–হ্যাঁ, সংবাদটা শুভই।

লর্ড আর্থার বললেন–প্রিয় সাইবিল, কালকেই আমরা বিয়ে করব।

চোখের জলে হাসতে হাসতে সাইবিল বললেন–বোকা ছেলে! এখনো কেক তৈরি করার জন্যে বায়না দেওয়া হয়নি যে।

.

০৬.

তিন সপ্তাহ পরে বিয়ে হল তাঁদের। এই উপলক্ষে সেন্ট পিটার গির্জায় চটপটে আধুনিক যুবক-যুবতীর বেশ ভালোই সমাবেশ হয়েছিল। চিচেস্টারের ডিন গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশের

মধ্যে ধর্মীয় অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করলেন। এরকম সুন্দর পাত্র-পাত্রী ও অঞ্চলে আর কখনো যে। দেখা যায়নি সে বিষয়ে সবাই একমত। সাইবিলের জন্যে লর্ড আর্থার যে কষ্ট করেছেন সেকথা একবারও তাঁর মনে হল না। আর নারী তার শ্রেষ্ঠ জিনিস পুরুষকে যা দিতে পারে-সেবা, যত্ন আর ভালোবাসা-সাইবিল যে-সবই আর্থারকে দিয়েছিলেন। তাঁদের ভীবনে বাস্তবের সংঘাতে রোমান্স চূর্ণ হয়নি। চিরকালই তাঁদের যৌবন অটুট ছিল।

কয়েক বছর পরের কথা। তখন তাঁদের সুন্দর দুটি সন্তান জন্মেছে। লেডি উইনডারমিয়ার একদিন তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন অ্যালটন প্রযোরিতো জায়গাটা বড়ো সুন্দর। ডিউক যৌতুক হিসাবে এই জায়গাটা তাঁর পুত্রকে দান করেছিলেন। একদিন বিকালে বাগানের একটা লাইম গাছের তলায় লেডি উইনডারমিয়ার লেডি আর্থারের সঙ্গে বসে গল্প করছিলেন। ফুটফুটে বাচ্চা ছেলে-মেয়ে দুটি গোলাপ বাগানের ভেতরে খেলা করছিল। এমন সময় হঠাৎ সাইবিলের হাতটা ধরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন-তুমি সুখী হচ্ছে, সাইবিল?

নিশ্চয়, নিশ্চয়। আপনি সুখী হননি?

সুখী হওয়ার মতো আমার সময় নেই, সাইবিলা আমার সঙ্গে যে লোকটি সকলের শেষে পরিচিত হয় তাকেই আমার ভালো লাগে। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে মানুষের সঙ্গে ভালোভাবে পরিচিত হওয়ার পরেই আর তাকে আমার ভালো লাগে না।

সিংহেরা আর আপনাকে আনন্দ দেয় না?

উঁহু! সবাই ওই একটা ঋতুর খদ্দের। তাছাড়া, তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করলেই তারা সঙ্গে সঙ্গে খারাপ ব্যাবহার করতে শুরু করবে। সেই বিশ্রী পডারসকে মনে রয়েছে তোমার? একটা প্রতারক-ভয়ঙ্কর রকমের প্রতারক। অবশ্য তাও আমি কিছু মনে করিনি। অনেকবার তাকে আমি টাকা ধারও দিয়েছি; কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে আমার সঙ্গে প্রেম করতে শুরু করল। এইটাই অসহ্য। তারই জন্যে চিরোম্যানসি শাস্ত্রটাকে আমি ঘৃণা করি। এখন আমি। টেলিপ্যাথি পড়ছি। ওটা সুন্দর জিনিস।

লেডি উইনডারমিয়ার, চিরোম্যানসির বিরুদ্ধে আপনি কিছু বলবেন না। আর্থার ওর বিরুদ্ধে। কাউকে কিছু বলতে দেবে না। এক কথা ও বিষয়ে সে খুবই সিরিয়াস।

সে যে এটা বিশ্বাস করে এটা নিশ্চয় তুমি আমাকে বলতে চাও না?

ওকেই জিজ্ঞাসা করুন। ওই তো এসে গিয়েছে।

একগোছা বোনে গোলাপ ফুল নিয়ে আর্থার দুটি নৃত্যরত শিশুদের সঙ্গে হাজির হলেন। লেডি উইনডারমিয়ার জিজ্ঞাসা করলেন-আর্থার, তুমি নিশ্চয় ‘চিরোম্যানসি’ বিশ্বাস করো না?

নিশ্চয় করি-হাসলেন আর্থার।

কেন কর?

কারণ, আমার আনন্দ ওরই ওপরে নির্ভর করে। ওরই জন্যে আমি সাইবিলকে পেয়েছি।

লেডি উইনডারমিয়ার বললেন–এরকম অর্থহীন কথা জীবনে আমি শুনিনি।

লাখপতি মডেল

The Model Millionaire

অর্থশালী না হলে নিছক সুপুরষ হয়ে লাভ নেই। রোমান্সে একমাত্র অধিকার রয়েছে ধনীদের; বেকারদের এটা পেশা হতে পারে না। দরিদ্রদের থাকা চাই বাস্তব বুদ্ধি; তাদের হতে হবে সাংসারিক মনোহর হওয়ার চেয়ে স্থায়ী রোজগারী হওয়া অনেক ভালো। আধুনিক জীবনের এই মহান সত্যগুলি হিউজি আর্সকিনের মাথায় ঢুকত না। বেচারা হিউজিছ! আমাদের স্বীকার করতেই হবে বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে ছেলেটা কিছু নয়। মানুষকে চমকে দিতে পারে জীবনে। এমন একটা উঁচু দরের অথবা নীচু দরের কথাও সে কখনো বলেনি। কিন্তু তাহলেও একথা আমাদের বলতে হবে যে চুল, তার কোঁকড়ানো তীহ চেহারা, আর ধূসর চোখ নিয়ে তাকে দেখতে সত্যিই বড়ো চমৎকার। পুরুষ অথবা নারী সকলেই তাকে বেশ প্রশংসা করত, গুণ ছিল তার অনেক দোষ ছিল তার একটি–সে রোজগার করতে জানত না। উত্তরাধিকারসূত্রে তার বাবা তাকে দিয়ে গিয়েছিলেন একটা তরোয়াল, আর পেনিনসুলার যুদ্ধের ওপরে লেখা পনেরো খণ্ডের ইতিহাস। হিউজি তরোয়ালটা ঝুলিয়ে রেখেছিল তার আয়নার গায়ে, আর বইগুলি ঢুকিয়ে রেখেছিল একটা কুলুঙ্গির ভেতরে। বৃদ্ধা এক খুড়িমা তার জন্যে বছরে যে দু'হাজার পাউন্ডের ব্যবস্থা করেছিলেন তারই ওপরে নির্ভর করে সে জীবিকা নির্বাহ করত। তবে রোজগারের চেষ্টা সে যে একেবারে করেনি তা নয়, অনেক করেছে– ছ'মাস ধরে সে স্টক এক্সচেঞ্জ-এ ঘুরেছে কিন্তু ষাঁড় আর ভালুকদের দলে সে একটা প্রজাপতি ছাড়া আর কী? বেশ কিছুদিন ধরে সে চায়ের ব্যবসা করেছে কিছু হয়নি। তারপরে চেষ্টা

করেছে ড্রাই শেরি বিক্রি করার। তাতেও ফায়দা হয়নি কিছু। তারপরে সে সব কিছু করা ছেড়ে দিয়েছে। বর্তমানে একটি পরিপূর্ণ বেকার সুন্দর যুবক ছাড়া সে আর কিছু নয়।

বিপদের ওপরে বিপদ। সে আবার প্রেমে পড়েছে মেয়েটির নাম লরা মার্টন, অবসরপ্রাপ্ত একটি কর্নেলের মেয়ে। ভারতে চাকরি করার ফলে ভদ্রলোক তাঁর মেজাজ আর হজমশক্তি দুটিই হারিয়েছেন। আর তাদের ফিরে পাননি। লরা সত্যিই তাকে বড়ো ভালোবাসত; আর সে-ও তার জুতোর ফিতেতে চুমু খাওয়ার জন্যে সব সময় প্রস্তুত হয়ে থাকত। লন্ডন শহরে তারাই ছিল সবচেয়ে সুন্দর নর আর নারী; কিন্তু কপর্দকহীন এবং কপর্দকহীনা। হিউজিকে কর্নেল খুবই ভালোবাসতেন: কিন্তু এই বিয়ের ব্যাপারে ছিল তাঁর ঘোরতর আপত্তি।

"প্রিয় বৎস, তোমার নিজের দশটি পাউণ্ড জমলে আমার কাছে এসো। তখন ভেবেচিন্তে দেখা যাবে"।–এই কথাই তিনি বলতেন।

একদিন সকালে হল্যান্ড পার্কের দিকে, এইখানেই মার্টনরা থাকত, যাওয়ার পথে অ্যালেন ট্রেভরের সঙ্গে দেখা করার জন্যে সে নেমে পড়ল। ট্রেভর ছিল তার প্রাণের বন্ধু আর একজন নামকরা চিত্রকর। অবশ্য আজকাল অনেকেই ছবি আকে; কিন্তু সে ছিল একজন আর্টিস্ট;

আর্টিস্টরা সচরাচর বড়োই বিরল। ব্যক্তিগতভাবে ট্রেভরকে অত্যন্ত রুক্ষ প্রকৃতির বলে মনে। হবে; ভুরু ডোড়াটা থাকত তার সব সময় কুঞ্চিত দাড়ি ছিল লাল–আর অযত্নবর্ধিত। সে যাই হোক, একবার তুলি আর বুরুশ হাতে নিলে ব্যস, একেবারে দুহঙ্ক চিত্রকর সে। তা ছাড়া বাজারে

ছবির-ও বেশ কদর ছিল তার। একথা অনস্বীকার্য সে সুন্দর চেহারার জন্যে প্রথম প্রথম সে হিউভির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। সে বলত–একমাত্র মূর্খ আর সুন্দর মানুষদেরই আর্টিস্টদের চেনা উচিত। ফুলবাবু আর মনোহরণকারীরাই পৃথিবী শাসন করে; অন্তত, করা উচিত। তারপরে হিউডের সঙ্গে ভালোভাবে পরিচয় হওয়ার পর থেকেই তার উচ্ছল স্বভাবের জন্যে তাকে তার ভালো লাগত।

হিউজি ভেতরে ঢুকেই দেখল ট্রেভর একটি অপরূপ প্রমাণ মাপের ভিক্ষুকের ছবির ওপরে শেষ তুলি বোলাচ্ছে স্টুডিয়োর এক কোণে একটি উঁচু বেদীর ওপরে স্বয়ং ভিক্ক মডেল হয়ে

দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার মুখের চামড়া চুপসে গিয়েছে, বার্ধক্যের ছাপ পড়েছে তার সর্বাঙ্গে, তার সারা দেহের ওপরে করুণ আর্তির একটা মূর্জনা ছড়িয়ে পড়েছে। তার কাঁধের ওপরে চাপা রয়েছে একটা ডো ময়লা চাদর। তার মোটা কুর্তা তালি আর তাপ্পিতে ভরে উঠেছে। একটা হাত দিয়ে সে ছড়ির ওপরে ভর করে রয়েছে, আর একটা হাতে ডো টুপিটা বাড়িয়ে দিয়েছে ভিক্ষের আশায়।

বন্ধুর সঙ্গে করমর্দন করে হিউজি বলল–কী অদ্ভুত মডেল!

খুব জোরে চিৎকার করে উঠল ট্রেভর–অদ্ভুত মডেল? আমারও তাই ভাবা উচিত। এইরকম ভিক্ষুকের দেখা রোজ পাওয়া যায় না। এইটিই আমার নতুন আবিষ্কার! হায় ভগবান, রেমব্রনত একে পেলে কী অদ্ভুত ছবিই না আঁকতেন?

হিউজি বলল: হতভাগ্য মানব! কী করুণই না দেখাচ্ছে ওকে। কিন্তু মনে হচ্ছে তোমার মতো চিত্রকরের কাছে ওর মুখটাই ওর সৌভাগ্য বয়ে আনবে।

ট্রেভর বলল: নিশ্চয়! কোনো ভিক্ষুক সুখী হোক তা তুমি নিশ্চয় চাও না! চাও কি?

আরাম করে বসে হিউজি জিজ্ঞাসা করল–এইরকম মডেল হওয়ার জন্যে ওরা কত করে পায়?

ঘয় এক শিলিং।

এই ছবিটার জন্যে তুমি কত পাবে?

তা দু'হাজার

পাউন্ড?

গিনি। চিত্রকর, কবি, আর ডাক্তাররা সব সময় গিনি পায়।

হাসতে-হাসতে হিউভি বলল–আমার মনে হয় তার একটা ভাগ মডেলদেরও পাওয়া উচিত। তাদেরও তোমাদের মতো কঠোর পরিশ্রম করতে হয়।

বোকা কোথাকার! সারাদিন ইলেজের সামনে দাঁড়িয়ে রঙ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করাটা যে কী কষ্টকর সেটা তোমার ভেবে দেখা উচিত। আমার মনে হয় হিউজি, আর্ট মাঝে মাঝে মাটি কোপানোর মতো পরিশ্রম পরিণত হয়। কিন্তু এখন আর বকবক করো না। চুপচাপ সিগারেট খাও। বর্তমানে খুব ব্যস্ত রয়েছি আমি।

কিছুক্ষণ পরে চাকর এসে সংবাদ দিল একজন ছবি বাঁধাইকারী তার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

বেরিয়ে যেতে-যেতে ট্রেভর বলল–হিউজি, তুমি পালিয়ে যেও না-আমি এখুনি আসছি।

ট্রেভর বেরিয়ে যেতেই বৃদ্ধ ভিক্ষুকটি একটু বিশ্রাম নেওয়ার জন্যে তার পেছনে রাখা একটা বোঞ্চের ওপরে একটু বসল। তাকে এত দুঃখী আর অবসন্ন মনে হল যে তার ওপরে কেমন যেন মায়া হল হিউজির। সঙ্গে সঙ্গে সে তার পকেটে হাত দিয়ে দেখল মাত্র একটি সভারেল আর কিছু তামার পেনস রয়েছে তার পকেটে। নিজের মনে-মনেই

সে বলল–বৃদ্ধ দরিদ্র; আমার চেয়ে ওর প্রয়োজনটাই বেশি–যদিও এর অর্থ হচ্ছে হেঁটেই আমাকে বাড়িতে ফিরতে হবে।

এই ভেবে তার দিকে এগিয়ে গিয়ে ভিক্ষুকের হাতে সভারেনটা খুঁজে দিল সে।

বৃদ্ধটি চমকে উঠল; একটা ছোট্ট হাসি খেলে গেল তার শুকনো ঠোঁটের ওপরে।

সে বলল–ধন্যবাদ স্যার, ধন্যবাদ!

তারপরে ফিরে এল ট্রেভরা সভারেনটা বিলিয়ে দেওয়ার জন্যে একটু লজ্জিত হয়ে বিদায় নিল হিউজি লরার কাছে সারাদিন কাটাল; এই অমিতব্যয়িতার জন্যে লরার কাছ থেকে মিষ্টি ধমক খেল একটা; এবং তারপরে, বাড়ি ফিরে গেল হেঁটে।

সেইদিনেই সন্ধের সময় প্রায় এগারোটা নাগাদ সে বেড়াতে-বেড়াতে প্যালেট ক্লাবে হাজির হল। দেখল, ধূমপানের ঘরে ট্রেভর বসে মদ খাচ্ছে।

একটা সিগারেট ধরিযে হিউজি বলল–ছবিটা বাঁধানো হয়ে গিয়েছে তো হে?

ট্রেভর বলল–হয়েছে। হ্যাঁ শোন, তোমারই তো লাভ হয়েছে বেশি। সেই বৃদ্ধ মডেলটির খুব ভালো লেগেছে তোমাকে। তাকে তোমার বিষযে সব কথাই আমাকে বলতে হয়েছে। তোমার আয় কত, ভবিষ্যৎ কী-ইত্যাদি ইত্যাদি...

চেঁচিয়ে উঠল হিউজি-বল কী হে? বাড়ি গিয়ে আমি হয়তো দেখব আমার জন্যে সে অপেক্ষা করে বসে আছে। অবশ্য তুমি ঠাট্টা করছ। হতভাগ্য বৃদ্ধ! ইচ্ছে যায় তার জন্যে আমি কিছু করি। আমার ধারণা, এই রকম দারিদ্র যে-কোনো মানুষের পক্ষেই বিপজ্জনক। বাড়িতে। আমার অনেক পুরনো পোশাক রয়েছে। তোমার কি মনে হয় সেগুলোর কিছু তার পছন্দ হবে? ওর পোশাক ছিঁড়ে একেবারে কুটিকুটি হয়ে গিয়েছে।

ট্রেভর বলল–কিন্তু ওই পোশাকেই ওকে বড়ো চমৎকার দেখায়। ফ্রককোট পরলে কোনো। কিছুর মোহেই আমি ওর ছবি আকতে যেতাম না। তুমি যাকে ডো পোশাক বল তাকেই আমি বলি রোমান্স। তোমার কাছে যেটাকে দারিদ্র্য বলে মনে হয় আমার কাছে সেইটাই অপরূপ সুন্দর। যাই হোক, তোমার এই প্রস্তাব তাকে জানাব।

হিউজি বেশ গম্ভীরভাবেই বলল–চিত্রকরেরা বড়োই নিষ্ঠুর।

ট্রেভর বলল–আর্টিস্টের হৃদয় হচ্ছে তাদের মাথা। আর তাছাড়া, আমাদের ব্যবসাটাই হচ্ছে পৃথিবীটি যে রকম ঠিক সেই রকম ভাবেই তাকে দেখা। তাকে সংস্কার করা আমাদের কাজ ন্য। প্রত্যেক মানুষকেই তার নিজের নিজের ব্যবসা দেখতে হবে। এখন বল, লরা কেমন। আছে। বৃদ্ধ মডেলটি তার সম্বন্ধে অত্যন্ত উৎসুক হয়ে উঠেছে।

তার কাছে লরার সম্বন্ধে তুমি আলোচনা করে একথা নিশ্চয়ই তুমি বলছ না?

নিশ্চয় বলছি। দুর্দান্ত কর্নেল, সুন্দরী লরা, আর দশ হাজার পাউন্ড–এই সমস্ত কথা সে জানে।

রেগে লাল হয়ে উঠল হিউজি–আমার সব ঘরোয়া কথা তাকে তুমি বলেছ?

ট্রেভর হেসে বলল–প্রিয় বৎস, ওই বৃদ্ধ ভিক্ষুকটি হচ্ছেন বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ ধনী। ব্যাঙ্কের কাছ থেকে কোনো ধার না করেই কালই তিনি গোটা লন্ডন শহরটা কিনে ফেলতে পারেন। প্রতিটি রাজধানীতে তাঁর একটি করে বাড়ি রয়েছে, সোনার প্লেটে তিনি খান; এবং ইচ্ছা হলে রাশিয়াকে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত করতে পারেন।

বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল হিউজি-কী বলছ তুমি?

ট্রেভর বলল–আমি বলতে চাই আজ সকালে আমার স্টুডিওতে যে ভিক্ষুকটিকে তুমি। দেখছিলে তিনি হচ্ছেন ব্যারন হাউসবার্ড। তিনি আমার খুব বড়ো বন্ধ, আমার সব ছবিই তিনি কেনেন; তার ওপরে একটা ভাগ কমিশন হিসাবে আমাকে তিনি দেন। মাসখানেক আগে ভিকের বেশে তাঁর একটা ছবি আঁকার কথা তিনি আমাকে বলেছিলেন। লাখপতির একটা খেয়াল বলতে পার। তাঁর ওই ছিন্ন পোশাকে তাঁকে বেশ চমৎকারই দেখাচ্ছিল, অথবা, বলতে পার আমারই দেওয়া ছিন্ন পোশাক। ওগুলো আমি সেপন থেকে সংগ্রহ করেছিলাম।

চিৎকার করে উঠল হিউজি–ব্যারন হাউসবার্ড! হায় ভগবান! তাঁকেই আমি একটা সভারেন দিয়েছি?

এই বলেই হতাশায় সে চোরের উপরে ঢলে পড়ল।

চিৎকার করেই হো-হো হেসে উঠল ট্রেভরবল কী হে! তাঁকে দিয়ে সভারেন! ওটিকে তুমি আর দেখতে পাবে না। তাঁর কাডই অন্য মানুষের টাকা নিয়ে কারবার করা।

একটু বিমর্ষ হয়ে হিউজি বলল–একথা আমাকে তোমার আগেই বলা উচিত ছিল অ্যালেন। তাহলে এরকম বোকা বনতে হত না আমাকে।

ট্রেভর বলল–প্রথমত আমি জানতাম না এইভাবে বেপরোয়া তুমি অর্থনষ্ট করা একটি সুন্দরী মডেলকে তুমি চুমু খাও-এর অর্থআমি বুঝতে পারি; কিন্তু তাই বলে একটা কুৎসিত ভিক্ষুককে তুমি একটা সভারেন দান করবে! ছি ছি! তাছাড়া, আজকে কেউ আমার সঙ্গে দেখা করুক তা আমি চাই নো তুমি আসার পরে হাউসবার্ড তাঁর নাম তোমার কাছে প্রকাশ করতে চান কিনা তাও আমি জানতাম না।

হিউজি বলল–আমাকে তিনি কী মনে করলেন বল তো?

কিছুই মনে করেননি। তুমি চলে যাওয়ার পরে তাঁকে বেশ স্ফুর্তি করতে দেখলাম। তিনি তোমার সম্বন্ধে এত কথা জানতে চাইলেন কেন তা আমি বুঝতে পারলাম না; কিন্তু

এখন আমি সব বুঝতে পারছি। তিনি তোমার ওই সভারেলটি ব্যবসায় খাঁটিয়ে প্রতি দু'মাস অন্তর তোমাকে তার সুদ দিয়ে যাবেন; আবার ডিনারের পরে এই নিয়ে বেশ মুখরোচক গল্প বলতে বসবেন।

হিউজি গড়গড় করে বলল–হা হতোস্মি! এখন সবচেয়ে বড়ো কাজ হচ্ছে বাড়ি গিয়ে ঘুমিয়ে পড়া। কিন্তু ভাই, একথা তুমি যেন আর কাউকে বলো না। তাহলে আমি লজ্জায় একেবারে মারা যাব।

বোকা কোথাকার! পরোপকার করার সহ যে তোমার কত বড়ো এই থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। পালিযো না। আর একটা সিগারেট ধরাও। সিগারেট খেতে-খেতে লরার সম্বন্ধে যত ইচ্ছা বলে যাও।

কিন্তু হিউজিকে ধরে রাখা গেল না। ট্রেভর হো-হো করে হাসতে লাগল। তাকে সেই অবস্থায় হোটেলে ফেলে রেখে সে দুঃখিত মনে বাড়ি গেল।

পরের দিন সকালে সে ব্রেকফাস্টের টেবিলে বসেছিল এমন সময় চাকর একটা কার্ড নিয়ে। হাজির হল। কার্ডের ওপরে চোখ বুলিয়ে সে বুঝতে পারল ব্যারন হাউসবার্ডের কাছ থেকে একটি ভদ্রলোক তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

সোনার চশমা পরা শ্বেত মস্তকের একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক তার ঘরে এসে জিজ্ঞাসা করলেন–আমি কি মুসিয়ে আর্কসিলের সঙ্গে কথা বলছি?

হিউজি তার মাথা নোয়াল।

আমি ব্যারন হাউসবার্ডের কাছ থেকে এসেছি। ব্যারন...

হিউজিম আমতা আমতা করে বলল–আপনি দয়া করে ব্যারনকে বলবেন যে আমি অত্যন্ত দুঃখিত...

বৃদ্ধ ভদ্রলোক একটু হেসে বললেন–ব্যারন আমাকে এই চিঠিটি দিয়ে আপনার কাছে। পাঠিয়েছেন–এই বলে বন্ধ করা খামখানা তার দিকে এগিয়ে দিলেন।

খামের বাইরে লেখা ছিল–"একটি বৃদ্ধ ভিক্ষুকের কাছ থেকে হিউজি আকর্মিন আর লরা। মার্টনের বিবাহের যৌতুক"। ভেতরে ছিল দশ হাজার পাউন্ড-এর একটি চেক।

তাদের বিয়েতে অ্যালেন ট্রেভর-এরই জয়জয়কার; আর সেইখানে বক্তৃতা ব্যারন হাউসবার্জ। ট্রেভর অ্যালেন বলল–লাখপতি মডেল পাওয়া কষ্টকর। কিন্তু মডেল লাখপতি খুঁজে পাওয়া আরও কষ্টকর।

সুখী রাজকুমার

The Happy Prince

শহরের মাথা ছাড়িয়ে উঁচু বেদীর ওপরে সুখী রাজকুমারের প্রতিমূর্তি দাঁড় করানো ছিল। মূর্তিটার সারা গায়ে পাতলা সোনার পাত দিয়ে মোড়া। তার চোখ দুটি ছিল নীলকান্ত মণিরা তার তরোয়ালের বাঁটের ওপরে জ্বলজ্বল করছিল একটা বেশ বুড়ো লাল রঙ-এর রুবি।

সবাই এই মূর্তিটি দেখে খুব প্রশংসা করত। চারুশিল্পের সমঝদার হিসাবে নাম কিনতে চাইতেন এমন একজন শহরের কাউনসিলার বললেন–মূর্তিটা ঠিক বায়ু-নিশানের মতোই সুন্দর। পাছে লোকে তাঁকে অবাস্তব বলে মনে করে, আর অবাস্তব প্রকৃতির নুষ তিনি। সত্যিই ছিলেন না, এই ভয়ে তিনি যোগ করলেন–তবে ততটা প্রয়োজনীয় নয়।

একটা বাচ্চা ছেলে চাঁদ ধরার জন্যে কাঁদছিল। তাকে তার বিজ্ঞ মা বললেন–তুমি সুখী রাজকুমারের মতো হতে পার না কেন? কোনো কিছু পাওয়ার জন্যে কান্নাকাটি তিনি করতেন না।

জীবনে হতাশ হয়েছে এইরকম কোনো মানুষ এই অদুত সন্দর মর্তিটির দিকে তাকিয়ে বলত–জগতে যে একজন মানুষও সুখী হতে পেরেছে এটা জেনে আমি আনন্দিত।

চকচকে পরিষ্কার পোশাক পরে গির্জা থেকে বেরিয়ে এসে ছেলেরা বলত–দেখতে একেবারে দেবদূতের মতো।

অঙ্কের শিক্ষক জিজ্ঞাসা করতেন–তোমরা কী করে জানলে? দেবদূত তো তোমরা কোনোদিন দেখনি?

ছেলেরা বলত–স্বপ্নে দেখেছি–

এই কথা শুনে গম্ভীর হয়ে শিক্ষক মশাই ভ্রু কুঞ্চিত করতেন; কারণ, ছেলেদের স্বপ্ন দেখাটা তিনি বেশ পছন্দ করতেন না।

একদিন রাত্রিতে একটা ছোটো দোয়েল পাখি শহরের ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল। প্রায় ছ'সপ্তাহ আগে তার বন্ধুরা ইজিপ্টে উড়ে গিয়েছে। কিন্তু সে পেছনে পড়েছিল। তার কারণ, সে একটি সুন্দর শরগাছের সঙ্গে প্রেমে পড়েছিল। বেশ বড়ো একটা বেগনে প্রজাপতির পেছনে ধাওয়া করার উদ্দেশ্যে সে একদিন যখন নদীর জলের ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল এমন সময় একটি প্রথম বসন্তে তার সঙ্গে শরগাছটির দেখা হয়। শরগাছের সরু কোমর দেখে সে এতই মুগ্ধ হয়ে পড়েছিল যে তার সঙ্গে আলাপ করার জন্যে সে থেমে গেল।

দোয়েলটি সোজাসুজি কথা বলতে ভালোবাসত। তাই সে জিজ্ঞাসা করল–তোমাকে কি আমি ভালোবাসব? শরগাছটি মাথা নীচু করল তারা তখন সে নদীর ওপরে রূপালি ঢেউ

তুলে তার চারপাশে ঘুরে ঘুরে উড়তে লাগল। এইভাবে সে তার ভালোবাসা জানাল; আর এটা চলল সারা গ্রীষ্মকাল ধরে।

অন্য সব দোয়েল পাখিরা ঠাট্টা করল তাকে–এই ভালোবাসা দেখে হাসি পাচ্ছে আমাদের। মেয়েটার কোনো দাম নেই। আত্মীয়-স্বজনেও ওর অনেক। আর নদীটা যে শরগাছে বোঝাই ছিল সেকথা তো মিথ্যে ন্য। তারপরে, শরৎকাল আসার সঙ্গে সঙ্গে তারা সবাই উড়ে গেল।

বন্ধুরা সবাই চলে গেলে তার বড়ো একা-একা লাগল। তার প্রেমিকাকে তার আর যেন ভালো লাগল না। সে বললও কোনো কথা বলতে পারে না। তা ছাড়া ও বড়ো ঢঙি। বাতাস একবার বইতে শুরু করলেই ব্যস। ও তার সঙ্গে অমনি ঢঙ করতে শুরু করে দেবে। আর কথাটা সত্যিই। যখনই বাতাস বইত তখনই ও সুন্দর ভাবে কোমর দুলিয়ে তাকে অভিবাদন জানাত। সে বলে গেল–স্বীকার করছি ও ঘরোয়া। কিন্তু নানা দেশ বেড়িয়ে আমার ভালো লাগে; আর আমার স্ত্রীরও সেই রকম বেড়াতে ভালো লাগা উচিত।

সে একবার শেষবারের মতো জিজ্ঞাসা করলচতুমি কি আমার সঙ্গে আসবে? কিন্তু শরটি মাথা নেড়ে বলল–না। ঘরে থাকার মোহ তার এত বেশি।

সে কান্নার সুরে বলল–এতদিন তুমি আমার সঙ্গে ছলনা করেছ। আমি পিরামিডের দিকে উড়ে চললাম। বিদায়! এবং সে উড়ে গেল।

সারা দিন ধরেই সে উড়েছে। রাত্রিতে সে শহরে এসে হাজির হল। সে বলল–কোথায় আমি থাকব? আশা করি এই শহরে থাকার মতো জায়গা নিশ্চয় কোথাও রয়েছে।

তারপরেই লম্বা বেদীর ওপরে সে সেই মূর্তিটা দেখতে পেল। সে বলল–আমি এইখানেই থাকব। বেশ সুন্দর জায়গা পরিষ্কার বাতাসও রয়েছে প্রচুর। এই বলে সে সুখী রাজকুমারের দুটি পায়ের মাঝখানে এসে বসে পড়ল।

চারপাশে তাকিয়ে দেখেই সে বলল–আমার শোওয়ার ঘরটা তো দেখছি সোনার। এই বলেই সে ঘুমানোর ব্যবস্থা করল। কিন্তু সবেমাত্র সে পালকের ভেতরে মাথাটা তার ঢুকিয়ে দিয়েছে এমন সময় বড়ো এক ফোঁটা জল তার গায়ে এসে পড়ল। সে প্রায় চিৎকার করে উঠল–অবাক কাণ্ড! আকাশে এক ফোঁটা মেঘ নেই। নক্ষত্রগুলি বেশ পরিচ্ছন্ন আর উজ্জ্বল। তবু বৃষ্টি হচ্ছে? উত্তর ইউরোপের আবহাওঘাটা সত্যিই বড়ো ভয়ঙ্কর। শরগাছ বৃষ্টি বড়ো ভালোবাসত। সেটা। তার স্বার্থপরতা।

আর এক বিন্দু জল পড়ল।

সে বলল–বৃষ্টিই যদি ঠেকাতে না পারল তাহলে স্ট্যাচু থাকার দরকারটা কী? আমাকে একটা চিমনি খুঁজে বার করতে হবে। এই বলেই সে উড়ে যাওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু উড়ে যাওয়ার জন্যে পাখা দুটো মেলে ধরার আগে তৃতীয় বিন্দুটি পড়ল। সে ওপর দিকে

তাকাল–দেখল-হায়রে, কী দেখল সে?

দেখল, সুখী রাজপুত্রের চোখ দুটি জলে ভর্তি হয়ে গিয়েছে তার সোনালি গাল দুটি বেয়ে সেই জল গড়িয়ে পড়ছে। চাঁদের আলোতে তার মুখটা এতই সুন্দর দেখাচ্ছিল যে সেই ক্ষুদে দোয়েলটির মন করুণায় ভরে গেল। জিজ্ঞাসা করল–তুমি কে?

আমি হচ্ছি সুখী রাজকুমার।

তাহলে তুমি কাঁদছ কেন? এত কাঁদছ যে চোখের জলে আমাকে একেবারে ভিজিয়ে দিয়েছ।

সেই মূর্তিটি বলল–আমি যখন মানুষ ছিলাম, যখন আমার মানুষের হৃদয় ছিল তখন। চোখের জলে কাকে বলে তা আমি জানতাম না। কারণ আমি তখন স্যানসসোসির। রাজপ্রাসাদে বাস করতাম–কোনো দুঃখই সেখানে ঢুকতে পারত না। দিনের বেলায় সঙ্গিদের সঙ্গে আমি বাগানে খেলা করতাম-সন্ধেবেলায় ‘গ্রেট হল’-এ আমি নৃত্য পরিচালনা করতাম। বাগানের চারপাশে ছিল উঁচু পাঁচিল-কিন্তু তার ওপাশে কী রয়েছে তা কোনোদিনই আমি জানতে চাইতাম না। আমার চারপাশে এমন সুন্দর সুন্দর ডিনিস ছড়িয়ে থাকত যে সে সব কিছু জানার প্রয়োজনই আমার হত না। আমার সভাসদেরা আমাকে সুখী রাজকুমার বলে ডাকতেন আর আনন্দটা যদি সুখ হয় আমি তাহলে সত্যিই সুখী ছিলাম। এইভাবেই আমি বেঁচে ছিলাম, আর এইভাবেই আমি একদিন মারা গেলাম। আমি মারা যাওয়ার পরে তারা। আমাকে এত উঁচু বেদীর ওপরে বসাল যে আমার

শহরের সমস্ত কদর্যতা আর দুঃখ আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি। আর যদিও আমার হৃদযটা ওরা সীসে দিয়ে তৈরি করেছে তবু আমি না কেঁদে পারছি লে।

দোয়েল পাখি নিজের মনে-মলেই বলল–কী! ওর সমস্তটা কি সোনা নয়?

সে এতটা নম্র ছিল যে এই ব্যক্তিগত মন্তব্যটা সে চেঁচিয়ে বলতে পারল না।

আস্তে-আস্তে সুরেলা কণ্ঠে মূর্তিটি বলল–অনেক দূরে–অনেক দূরে রাস্তার ওপারে একটা কুঁড়ে রয়েছে। ওই ঘরের একটা জানালা খোলা। তারই ভেতর দিয়ে একটি মহিলাকে আমি। টেবিলের পাশে বসে থাকতে দেখছি। তার মুখটা রুগ্ন, ক্লিষ্ট। তার হাত দুটি লাল খসখসে, দুচে বেঁধা–কারণ মেয়েটি পেশায় দর্জী রানির সব চেয়ে সুন্দরী একটি সহচরী পরবর্তী 'কোর্ট বল'-এ নাচবে। তারই জন্যে সার্টিনের গাউনের ওপরে সে 'প্যাশান ফ্লাওয়ার' আঁকছে তার ঘরের এক কোণে তার শিশুটি অসুস্থ অবস্থায় শুয়ে রয়েছে। তার জ্বর হয়েছে। সে কমলালেবু খেতে চাইছে। নদীর ভাল ছাড়া তাকে আর কিছু খেতে দেওয়ার সামর্থ্য তার মাযের নেই। তাই সে কাঁদছে। দোয়েল দোয়েল, আমার ছোট্ট দোয়েল, আমার তরোয়ালের বাঁটের ওপরে যে রুবিটা রয়েছে সেটা কি তুমি তাকে একটু দিয়ে আসবে না? আমার পা দুটো এই মাঁচার সঙ্গে বাঁধা রয়েছে। আমি যে নড়াচড়া করতে পারি নে।

চ বলল–ইজিপ্টে বন্ধুরা আমার প্রতীক্ষা করছে। আমার বন্ধুরা নীল নদের ওপরে পাক খেয়ে-খেয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। বড়ো বড়ো কুমুদ ফুলের সঙ্গে গল্প করছে তারা। শীঘ্রই

তারা সম্রাটের কবরখানার মধ্যে ঘুমোতে যাবে। চিত্রবিচিত্র কফিনে সম্রাটও সেইখানে ঘুমোচ্ছেন। নানারকম সুগন্ধী মশলা দিয়ে মাখা বেগনে কাপড়ে ঢাকা রয়েছে তাঁর দেহ। তাঁর গলায় রয়েছে বিবর্ণ জীর্ণ ঘোড়ার একটা শেকল। তাঁর হাত দুটি শুকিয়ে যাওয়া পাতার মতো। রাজপুত্র বলল–দোয়েল, দোয়েল, আমার ছোট্ট দোয়েল, তুমি কি একটা রাত্রি আমার কাছে থাকবে না–হবে না আমার দূত? বাচ্চাটার বড্ড তেষ্টা পেয়েছে। বড্ড কষ্ট পাচ্ছে ওর মা।

দোয়েল বলল–ওই সব বাচ্চাদের আমার খুব একটা ভালো লাগে না। গত গ্রীষ্মে আমি যখন নদীতে বাস করছিলাম তখল কলওয়ালার দুটো বদমাইশ ছেলে সব সময় আমার দিকে ঢিল চুড়তো। সেই সব ঢিল আমার গায়ে অবশ্য লাগেনি। আমরা অনেক দূরে ঘুরে বেড়াই। তা ছাড়া, আমি যে বংশের পাখি তারা ডানার ডোরের জন্যে বিখ্যাত। কিন্তু তবু এটা একটা অসম্মান তো!

কিন্তু সুখী রাজকুমারকে এত বিষণ্ণ দেখাল যে খুদে দোয়েলের কেমন কষ্ট হল। সে বলল–জায়গাটা বড়ো ঠান্ডা। তবু আজ রাত্রিতে আমি তোমার কাছে থাকব–কাজ করে দেব তোমার।

রাজকুমার বলল–ধন্যবাদ।

সুতরাং দোয়েল পাখিটি রাজকুমারের তরোয়ালের বাঁট থেকে সেই বড়ো রুবিটা খুলে নিয়ে ঠোঁটে করে অনেক বাড়ির ছাদের ওপর দিয়ে উড়ে গেল।

গির্জার উঁচু গম্বুজের পাশ দিয়ে সে উড়ে গেল। সেইখানে দেবদূতদের শ্বেত পাথরে আঁকা মূর্তিগুলি খোদাই করা রয়েছে। সে প্রাসাদের পাশ দিয়ে উড়ে গেল; শুনতে পেল নাচের শব্দ। একটি সুন্দরী মেয়ে তার প্রেমিকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে বারান্দার ওপরে বেরিয়ে এল। প্রেমিকটি তার প্রেমিকাকে বলল–তারাগুলি কী অদ্ভুত সুন্দর! প্রেমের ক্ষমতা কী অদ্ভুত!

মেয়েটি বলল–আশা করি স্টেটবল-এর আমার নতুন পোশাকটা তৈরি হয়ে যাবে। আমি তার ওপরে প্যাশান ফ্লাওয়ার এঁকে দিতে বলেছি। কিন্তু মেয়ে-দর্জিগুলো বড়োই অলস।

সে নদীর ওপর দিয়ে উড়ে গেল; দেখল জাহাজের মাস্তুলের ওপরে লণ্ঠন ঝুলছে। উড়ে গেল। জু'দের বসতির ওপর দিয়ে; দেখল, তারা দরকষাকষি করে তামার দাঁড়িতে করে টাকা ওজন করছে। অবশেষে সে দরিদ্র কুটিরে হাজির হয়ে উঁকি দিয়ে দেখল। বাচ্চাটা জ্বরের ঘোরে বিছানার ওপরে গড়াচ্ছে। মা তার ঘুমিয়ে পড়েছে-বড়োই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল সে। লাফাতে লাফাতে ঘরের মধ্যে ঢুকে টেবিলের ওপরে যেখানে মেয়েটির সেলাই পড়েছিল তারই পাশে সেই বিরাট রুবিটি রেখে দিল। তারপরে সে ধীরে-ধীরে বিছানার চারপাশে উড়তে লাগল। ছেলেটির কপালে তার ডানা দিয়ে হাওয়া করল। ছেলেটি বলল–আমার গা-টা ঠান্ডা হয়ে গেল। আমার নিশ্চয় ভত্বর ছেড়ে গিয়েছে। এই বলে মিষ্টি ঘুমের আমেজে সে ঢলে পড়ল।

দোয়েলটি ফিরে এল নিজের জায়গায়, সে যা করেছে সে-সব কথা সুখী রাজকুমারকে বলল। তারপরে মন্তব্য করল–কী অদ্ভুত! যদিও এত ঠান্ডা, তবুও আমার বেশ গরম লাগছে।

রাজকুমার বলল–তার কারণ, তুমি একটা ভালো কাজ করেছ।

এবং সেই ছোট্ট দোয়েলটি চিন্তা করতে-করতে ঘুমিয়ে পড়ল। চিন্তা করতে-করতে সব সময়েই সে ঘুমিয়ে পড়ত।

সকাল হলে সে নদীতে গিয়ে স্নান করে এল। পক্ষীতত্ত্ববিশারদ একটি অধ্যাপক সেই সময় পুলের ওপর দিয়ে যাচ্ছিলেন। দোয়েলকে দেখে বিস্মিত হয়ে তিনি বললেন–কী অদ্ভুত ঘটনা! শীতকালে দোয়েল! স্থানীয় একটি সংবাদপত্রে এই নিয়ে তিনি দীর্ঘ একটি চিঠি লিখলেন। প্রত্যেকেই এটি পড়ল, আলোচনা করল; কিন্তু চিঠিতে এত শব্দ ছিল যে তারা তার। বিন্দুবিসর্গও হৃদয়ঙ্গম করতে পারল না।

দোয়েল বলল–আজ রাত্রিতে আমি ইজিপ্ট যাচ্ছি। এই যাওয়ার আনন্দে তাকে বেশ উত্তেজিত দেখা গেল। যত মঠ-মন্দির আর দেখার জায়গা ছিল সব সে দেখে বেড়াল। গির্জার চড়ার ওপরে অনেকক্ষণ ধরে সে বসে রইলা যেখানেই সে গেল সেখানেই চড়াই পাখিরা তাকে দেখে কিচিরমিচির করে নিজেদের ভেতরে বলাবলি করতে লাগল-কী সম্ভ্রান্ত এই বিদেশি পাখি! এইভাবে ঘুরে বেড়িয়ে সে যথেষ্ট আনন্দ পেলা।

আকাশে চাঁদ উঠলে সে সুখী রাজকুমারের কাছে উড়ে গিয়ে বলল–ইজিপ্টে কাউকে কিছু। বলার রয়েছে তোমার? আমি এবার যাচ্ছি।

রাজকুমার বলল–দোয়েল, দোয়েল, ছোট্ট দোয়েল–আর একটা রাত্রি কি তুমি আমার কাছে থাকবে না?

দোয়েল বলল–ইজিপ্টে বন্ধুরা আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। আগামীকাল তারা দ্বিতীয় জলপ্রপাত দেখতে যাবে। সেখানে শরগাছের ঝোঁপের মধ্যে নদী-ঘোড়া লুকিয়ে থাকে; আর। গ্রানাইট পাথরের তৈরি বিরাট একটা ঘরের ওপরে মেমনন দেবতা বসে রয়েছেন। সারা রাত্রি ধরে তিনি তারামণ্ডলের দিকে তাকিয়ে থাকেন; ভোরের তারা চকচক করে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে তিনি আনন্দে একবার চিৎকার করেই শান্ত হয়ে যান। দুপুর বেলা পীতাভ সিংহেরা নদীর ধারে আসে জল খেতো তাদের চোখগুলি সবুজ পান্নার মতো চকচকে; তাদের গর্ডন। উঁচুলপ্রপাতের গর্জনের চেয়েও ডোরাল।

রাজকুমার বলল–দোয়েল, দোয়েল, ছোট্ট দোয়েল-শহর ছাড়িয়ে অনেক দূরে চিলেকোঠার মধ্যে আমি একটি যুবককে দেখতে পাচ্ছি। কাগজে বোঝাই টেবিলের ওপরে মাথাটি রেখে সে বসে রয়েছে। তার পাশে একটা গামলার ভেতরে রয়েছে কযেকটা শুকলো ভায়লেট ফুল। তার মাথার চুলগুলি কটা আর কোঁকড়ানো। তার ঠোঁট দুটো ডালিমের মতো লাল-বড়ো আর স্বপ্নপু চোখ। থিয়েটারের জন্যে সে একটা নাটক লিখছে; কিন্তু তার এত শীত করছে যে তার হাত সরছে না। তার কামরায় কোনো আগুন নেই। খিদেতে সে বড়ো কাতর হয়েছে।

দোয়েলের হৃদয়টা ছিল সত্যিই বড়ো কোমল। তাই সে বলল–বেশ। আর একটা রাত্রি আমি তোমার জন্যে থেকে যাব। তার কাছে কি আর একটা রুবি আমি পৌঁছে দেব?

রাজকুমার বলল–হায়রে, আমার তো আর কোনো রুবি নেই। আছে কেবল এই চোখ দুটি। এই চোখ দুটি আমার দুষ্প্রাপ্য নীলকান্ত মণির। এই মণি দুটি হাজার বছর আগে ভারতবর্ষ থেকে কিনে আনা হয়েছিল। তারই একটা মণি খুলে নিয়ে তাকে দিয়ে এস। সোনার দোকালে সে সেটা বিক্রি করে জ্বালানি কাঠ কিনবে-তারপরে নাটকটা শেষ করবে সে।

দোয়েল বলল–প্রিয় রাজকুমার, ও কাজ আমি করতে পারব না। এই বলে সে কাঁদতে লাগল।

রাজকুমার বলল–দোয়েল, ছোট্ট দোয়েল-আমার নির্দেশ তুমি পালন করা

সুতরাং দোয়েল রাজকুমারের চোখ থেকে একটা মণি খসিয়ে নিয়ে ছাত্রটির চিলেকোঠায় পৌঁছে দিয়ে এল। ছাদের মুখে একটা গত ছিল। তাই ঘরে ঢোকাটা খুব সহজ ছিল তার কাছে। সেই গর্তের ভেতর দিযে সে তীরবেগে ভেতরে ঢুকে গেল। যুবকটি তার দুটো হাতের মধ্যে মাথাটা চিপে বসেছিল। সেইজন্যে পাখির ডানার শব্দ তার কানে গেল না। মুখ তুলে সে দেখল শুকনো ভাবলেট ফুলের পাশে একটা সুন্দর নীলকান্ত মণি বসানো রয়েছে। নীলকান্ত মণি দেখে ছেলেটি চিৎকার করে উঠল-আমার গুণপনা মানুষ উপলব্ধি

করতে শুরু করেছে। এটা নিশ্চয় আমার গুণমুগ্ধ কোনো ভক্ত পাঠিয়ে দিয়েছে। এখন আমার নাটকটি আমি শেষ করে ফেলি।

ছেলেটি বেশ খুশি হয়েছে বোঝা গেল। পরের দিন দোয়েলটি বন্দরের দিকে উড়ে গেল। একটা বিরাট জাহাজের মাস্তুলের মাথায়। গিয়ে বসল; দেখল, নাবিকরা সব চিৎকার করতে-করতে জাহাজের খোল থেকে দড়ি বেধে বড়ো-বড়ো পেটি নামাচ্ছে দোয়েল চিৎকার করে বলল–আমি ইজিপ্টে যাচ্ছি। কিন্তু তার কথায় কান দিল না কেউ। তারপরে আকাশে যখন চাঁদ উঠল সে আবার সুখী রাজকুমারের কাছে গিয়ে বলল–আমি তোমার কাছ থেকে বিদায় নিতে এসেছি।

রাজকুমার বলল–দোয়েল, দোয়েল, আমার ছোট্ট দোয়েল; তুমি কি আর একটা রাত আমার কাছে থাকবে না?

দোয়েল বলল–এখন শীতকাল; শীগগিরই ঠান্ডা কনকনে বরফ জমবে এখানে। ইজিপ্টে সবুজ পাম গাছের ওপরে সর্য গরম হয়ে উঠেছে। মাটির ওপরে কুমিররা সব শযে অলসভাবে তাকিয়ে রয়েছে পরসপরের দিকে। বলবেক-এর মন্দিরে আমার বন্ধুরা বাসা তৈরি করছে। সাদা আর গোলাপী ঘুঘু পাখিরা তাদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে গুঞ্জন করছে। প্রিয় রাজকুমার, তোমাকে ছেড়ে আমাকে যেতেই হবে; কিন্তু আমি তোমাকে ভুলব না; এবং আগামী বসন্তে যে মণিটি তুমি বিলিয়ে দিয়েছ তার বদলে দুটি সুন্দর মণি তোমাকে এনে দেব। লাল গোলাপের চেয়েও সেই রুবিটা হবে লাল; আর নীলকান্ত মণিটি হবে বিরাট সমুদ্রের চেয়েও অনেক বেশি নীলা।

সুখী রাজকুমার বলল–নীচে ওই পার্কের মধ্যে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাড়িতে সে কিছু টাকা না নিয়ে গেলে তার বাবা তাকে মারবে। সেইজন্যেই সে কাঁদছে। তার জুতো বা মোজা লেই। তার মাথা খোলা। তুমি আমার আর একটা চোখ খুবলে মণিটা নিয়ে ওকে দিয়ে এস। তাহলে তার বাবা আর তাকে মারবে না।

দোয়েল বলল তোমার সঙ্গে আর এক রাত্রি থাকতে আমি রাজি হয়েছি কিন্তু তোমার চোখ খুবলোতে রাজি নই। তুমি তাহলে একেবারে অন্ধ হয়ে যাবে।

রাজকুমার বলল–দোয়েল, দোয়েল, ছোট্ট দোয়েল; আমি যা বলছি তা-ই তুমি কর।

সুতরাং রাজকুমারের আর একটা চোখ সে খুবলে নিল; তারপর সেই চোখটা নিযে সে। তীরবেগে বেরিয়ে গেল। মেয়েটির সামনে নীচু হয়ে তার হাতের চেটোয় ফেলে দিল সেটি।

কী সুন্দর গ্লাসের টুকরো!–সেই বাচ্চা মেযেটা আনন্দে চিৎকার করেই বাড়ির দিকে ছুটে গেল।

তারপর দোয়েল পাখিটা রাজকুমারের কাছে উড়ে এসে বলল–তুমি এখন অন্ধ হয়ে গিয়ে। সেই জন্যে আমি তোমার কাছে সব সময় থাকব।

হতভাগ্য রাজকুমার বলল–না, ছোট্ট দোয়েল; এবার তোমাকে ইজিপ্টে যেতে হবে।

দোয়েল বলল–আমি তোমার কাছে সব সময় থাকব। এই বলে সে রাজকুমারের পায়ের কাছে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরের সারাটা দিনই সে রাজকুমারের পিঠের ওপর বসে রইল; বিদেশ-বিভুই-এ সে যা দেখেছে সেই সব গল্প তাকে বলল। সে তাকে লাল সারস পাখিদের কথা বলল–এই সব পাখিরা নীল নদের তীরে লম্বা লম্বা সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে আর গোল্ড ফিশ ধরে। শোনাল পৃথিবীর মতো পুরাতন ফিনিক্সের কাহিনি। হাতে রুদ্রাক্ষের মালা নিয়ে উটের পিছু পিছু হাঁটছে এমন সব বণিকদের কথা বলল, বলল আবলুস কাঠের মতো কালো কুচকুচে চন্দ্রপাহাড়ের রাজার কথা, পামগাছের কোটরে যে সব সাপেরা ঘুমোয় তাদের কথা–এই সাপেদের মধুমাখানো পিঠে দিয়ে কুড়িটি পুরোহিত ভোজন করায। লম্বা-লম্বা পাতার ভেলায় চড়ে যে সব পিগমিরা বড়ো লেকটার ওপরে ঘুরে বেড়ায় আর সব সময় প্রজাপতিদের সঙ্গে যুদ্ধ করে, শোনাল তাদের কথা

রাজকুমার বলল–প্রিয় ছোট্ট দোয়েল, তুমি আমাকে অনেক অদ্ভুত কাহিনি শোনালে; কিন্তু সবচেয়ে অদ্ভুত ঘটনা হচ্ছে মানুষের দুঃখ দুঃখের মতো রহস্য আর কিছু নেই। আমার এই শহরের ওপর দিয়ে একবার উড়ে এসে আমাকে বল কী তুমি দেখলে।

সুতরাং উড়ে গেল দোয়েল সেই বিরাট শহরের ওপর দিযে; দেখল ধনীরা তাদের সুন্দর-সুন্দর বাড়িতে আনন্দ করছে; আর তাদেরই ফটকের ধারে বসে রয়েছে ভিক্ষুকরা। সে

অন্ধকার গলির মধ্যে উড়ে গিয়ে দেখল ক্ষুধাতুর শিশুগুলি বিবর্ণ মুখে হতাশ চোখে কালো রাস্তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। পুলের নীচে নিজেদের গরম করার জন্যে দুটি ছেলে জড়াজড়ি করে শুয়ে রয়েছে। তারা বলল–বড় খিদে পেয়েছে। পাহারাদাররা ধমক দিল–এখান থেকে ওঠ ওঠা বৃষ্টির ভেতরে বেরিয়ে পড়ল তারা।

তারপর সে ফিরে এসে যা দেখেছে সব রাজকুমারকে বলল।

রাজকুমার বলল–আমার সারা গায়ে সোনার চাদর মোড়া। একটা একটা পাত খুলে নিয়ে তুমি আমার দরিদ্রদের বিলিয়ে দাও। জীবন্ত মানুষরা সব সময় মনে করে সোনার ঝালর গায়ে দিয়ে আমি খুব সুখী।

একটা একটা সোনার পাত খুলতে লাগল দোয়েল। বিশ্রী চেহারা হল রাজকুমারের। একটা একটা সোনার পাত সে দরিদ্রদের দিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে তাদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। রাস্তার ওপরে খেলতে শুরু করল তারা; আনন্দে চিৎকার করে বলল–আমাদের খাওয়ার সংস্থান রয়েছে।

তারপরে বরফ নামল, নামল ঘন কুয়াশা। মলে হল সব রাস্তাটাই রুপোর তাল হয়ে গিয়েছে। গলা বুপোর মতোই তারা চকচকে করে লাগল। সবাই ফারকোট গায়ে দিয়ে বেরোতে লাগল রাস্তাঘা।

বেচারা দোয়েলও দিন-দিন ঠান্ডায় কুঁকড়ে যেতে লাগল। কিন্তু রাজকুমারকে সে এতই ভালোবেসে ফেলেছিল যে কিছুতেই সে তাকে ছেড়ে যেতে পারল না। রুটিওয়ালার অসাক্ষাতে তার দরজা থেকে দু'এক টুকরো রুটি সে ঠোঁটে করে তুলে নিয়ে আসত; আর ডানা নেড়ে-নেড়ে গরম রাখার চেষ্টা করত নিজেকে।

কিন্তু শেষকালে সে বুঝতে পেরেছিল–তার মৃত্যুর দিন ঘনিয়ে আসছে। কোনরকমে আর একবার সে রাজকুমারের পিঠের ওপরে উঠে এল; বলল–প্রিয় রাজকুমার, বিদায়। তোমার হাতে একটু চুমু খেতে দেবে?

রাজকুমার বলল–আমার ছোট্ট দোয়েল তুমি যে শেষ পর্যন্ত ইজিপ্টের দিকে রওনা হতে পেরেছ তাতে আমি খুশি হয়েছি। অনেকটা বেশি সময় তোমাকে এখানে থাকতে হয়েছে।

তুমি আমার এই ঠোঁটে চুমু খাও–কারণ আমি তোমাকে ভালোবাসি। দোয়েল বলল–আমি ইজিপ্টে যাচ্ছি নেযাচ্ছি মরণের ঘরে। মৃত্যুই তো ঘুমের ভাই। তাই না?

এবং সুখী রাজকুমারের ঠোঁটে একটা চুমু খেয়ে সে মারা গেল, তারপর পড়ে গেল মূর্তিটির পায়ের কাছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে মূর্তিটার ভেতরে একটা অদ্ভুত ভাঙনের শব্দ হল–মনে হল কিছু যেন একটা ভেঙেছে। আসল কথাটা হচ্ছে মূর্তির সীসের মাথাটা দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেল। কুয়াশাটা সত্যিই ভীষণ জমাট বেঁধে গিয়েছে।

পরের দিন প্রত্যুষে টাউন কাউন্সিলরদের নিয়ে মেয়র পার্কে বেড়াচ্ছিলেন। সেই উঁচু বেদীটার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি একবার মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে দেখলেন–হ্যায় কপাল! সুখী রাজকুমারের চেহারা এ কী হয়েছে!

কাউনসিলাররাও সব সময়েই মেয়রের সঙ্গে একমত। তারাও একবাক্যে চিৎকার করে উঠল-আরে, ছি-ছি!

মেয়র বললেন–তরোয়াল থেকে রুবিটা পড়ে গিয়েছে, চোখ দুটো নেই। সোনার পাতও দেখছি নে। মনে হচ্ছে রাজকুমার একেবারে ভিক্ষুক হয়ে গিয়েছেন।

হ্যাঁ, ঠিক একেবারে ভিক্ষুক-সায় দিল পারিষদবর্গ।

মেযর বলে গেলেন–আর এঁর পায়ের তলায় সত্যি সত্যিই একটা মরা পাখি। আমাদের এখনই একটা বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা উচিত যে এখানে আর কোনো পাখিকেই মরতে দেওয়া হবে না।

কর্পোরেশনের কেরানি কথাগুলি টুকে নিল। তারপরে তারা মূর্তিটাকে ভেঙে ফেলল। বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টের প্রফেসর বললেন–রাজকুমার তার মূল্য হারিয়েছে, কারণ তার আর কোনো সৌন্দর্য নেই।

তখন তারা তাকে আগুনে গলিয়ে ফেলল। ধাতুটাকে নিয়ে কী করা হবে সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হওযার জন্যে মেযর একটা সভা ডাকলেন। তিনি বললেন–আমাকে অবশ্য আর একটা মূর্তি গড়তে হবে-আর সেটা হবে আমার।

সভাসদেরা বলল–আমার, আমার।

এই নিয়ে নিজেদের মধ্যে তারা ঝগড়া করতে শুরু করল। শেষ খবর আমি যতটুকু পেয়েছি তা থেকে জানা যায় তারা এখন-ও ওই নিযে ঝগড়া করছে।

ধাতু গলানোর কারখানায় একজন কারিগর বলল–কী আশ্চর্য! এই ভাঙা সীসের হৃদপিণ্ডটা কিছুতেই আগুনের চুল্লিতে গলছে না।

সেই জন্যে তারা সেটাকে একটা ম্যলা ফেলার জাযগায় ফেলে দিল। সেই মরা পাখিটার দেহও পড়েছিল সেইখানে।

ঈশ্বর তাঁর দেবদূতদের বললেন–শহরের সবচেয়ে দুটি মূল্যবান জিনিস আমাকে এনে দাও। তাঁর দেবদূতেরা তাঁকে এনে দিল সেই সীসের হৃৎপিণ্ড আর মরা পাখিটার দেহ।

ঈশ্বর বললেন–তোমরা ঠিক জিনিসই এনেছ; কারণ, আমার প্যারাজাইসের বাগানে এই ছোট্ট পাখিটা অনন্তকাল ধরে গান করবে; আর আমার সোনার শহরে এই সুখী রাজকুমার আমার বন্দনা গাইবে চিরদিন।

স্পেনীয় রাজকুমারীর জন্মতিথি

The Birth day of the Infanta

রাজকুমারীর জন্মদিন। রাজকুমারীর বয়স মাত্র বারো। রাজপ্রাসাদের বাগানগুলিতে জোরাল সূর্যের আলো পড়েছে। সত্যিকারের রাজকুমারী এবং স্পেনের ইনফ্যানটা হওয়া সত্ত্বেও দরিদ্র ঘরের ছেলেমেয়েদের মতোই বছরে তারও কেবল একদিনই জন্মতিথি পালিত হত। যাতে এই দিনটি বেশ সুন্দর ভাবে উদযাপিত হয়, সেই জন্যেই সারা দেশই আনন্দে মুখর হয় উঠতো। আর দিনটি সত্যিই বড়ো সুন্দর হয়ে উঠেছিল। লম্বা লম্বা সুন্দর টিউলিপ ফুলগুলি ডাঁটা ওপরে মাথা উঁচু করে ঘাসের বনে ওপাশ থেকে গোলাপের দিকে তাকিয়ে বলল–আমরাই বা কমতি কিসের? বেগুনে রঙের প্রজাপতি পাখায় স্বর্ণরেণু মিশিয়ে এ-ফুল থেকে ও-ফুলের ওপরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দেওয়ালের ফাটল থেকে টিকটিকিরা উঁকি দিয়ে রোদ পোহাচ্ছে। ডালিম ফলগুলি গরমে ফেটে পড়ায় তাদের রক্তাক্ত হৃদয়গুলি বাইরে বেরিয়ে পড়েছে। চারপাশে আনন্দ আর উত্তেজনার ঢল নেমেছে। বাতাস সুগন্ধের প্রাচুর্যে উঠেছে ভারী হয়ে।

সঙ্গীদের নিয়ে বাচ্চা রাজকুমারী অলিন্দের ওপরে লুকোচুরি খেলছে। সাধারণত নিজের পদমর্যাদার উপযুক্ত ছেলেমেয়েদের সঙ্গেই তাকে খেলা করতে দেওয়া হয়। ফলে তাকে একলাই খেলা করতে হয়। কিন্তু এই জন্মদিনটিই যা ব্যতিক্রম। রাজা নির্দেশ দিয়েছেন আজকের দিনে যার সঙ্গে খেলা করতে তার ভালো লাগে রাজাকুমারী তাকেই নিমন্ত্রণ করতে পারবে। স্পেনদেশীয় রোগাটে শিশুদের গতির মধ্যে বেশ একটা লাবণ্য রয়েছে।

কিন্তু সবচেয়ে লাবণ্যময়ী হচ্ছে রাজকুমারী নিজে। একটু বোঝার মতো হলেও পোশাক-পরিচ্ছদ, সাজ-সজ্জা তার বেশ মনোমুগ্ধকরই ছিল। ধূসর বর্ণের সাটিনের পোশাক তার গায়ে: রুপো দিয়ে মোড়া বেশ শক্ত গোছের অন্তর্বাস সে পরেছে। সরু ফিতে দিয়ে তৈরি গোলাপ ফুলের নকশা কাটা ছোটো দুটি শ্লিপার তার পায়ে। হেঁটে বেড়ানোর সময় বাইরে থেকে সে দুটিকে বেশ ভালো করেই দেখা যাচ্ছে। তার বিবর্ণ মুখের ওপরে চুলের মধ্যে জ্যোতির্মণ্ডলের মতো সুন্দর সাদা গোলাপ শোভা পাচ্ছে।

রাজপ্রাসাদের একটি বাতায়ন কক্ষে বিষণ্ণ রাজা বসে রয়েছেন। এদের সবাইকে তিনি দেখছিলেন, তাঁর পেছনে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর ভাই অ্যারাগনের ডন পেড্রো; এই ভাইটিকে তিনি ঘৃণা করতেন। তাঁর কনফেশর গ্রানাদার গ্র্যান্ড ইনকুইজিটর বসেছিলেন তাঁর পাশে। অন্যান্য দিনের চেয়ে রাজা আজ বেশি বিষণ্ণ। তাঁর শিশু কন্যাটি তার শিশুসুলভ গাম্ভীর্যে সমবেত পারিষদবর্গকে মাথা নীচু করে অভিবাদন জানাচ্ছিল। সেই মেয়েকে দেখতে-দেখতে তিনি তখন তার মা যুবতী রানির কথা চিন্তা করছিলেন। তাঁর মনে হল মাত্র কিছুদিন হল ফ্রান্সের আনন্দোজ্জ্বল দেশ থেকে তিনি এখানকার রানি হয়ে এসেছিলেন। মেয়েটির জন্মের ছ'মাস পরেই তাঁর মৃত্যু হয়। এই রানিকে তিনি এতই ভালোবাসতেন যে মৃত্যুর পরে রাজা তাঁর মৃতদেহকে কবরস্থ করতে দেননি। একজন মুরদেশের চিকিৎসক তাঁর দেহটিকে ওষুধপত্র দিয়ে অবিকৃত অবস্থায় রেখে দিয়েছিল। যাদুবিদ্যার প্রয়োগের জন্যে তার প্রাণদণ্ড হয়েছিলা। কিন্তু এই কাজের জন্যে রাজা তার মৃত্যুদণ্ড মকুব করে দিয়েছিলেন। বারো বছর আগে একটি বাত্যামুখর মার্চ মাসে পাদরিরা তাঁর দেহটিকে নিয়ে প্রাসাদের একটি কালো মার্বেল গির্জায় স্থাপন করেছিলেন। কালো পোশাক পরে একটি লণ্ঠন হাতে নিয়ে রাজা প্রতি মাসে একবার করে সেখানে

গিয়ে সেই দেহটির পাশে হাঁটু মুড়ে বসে আমার রানি, আমার রানি, বলে তাকে ডাকতেন। স্পেনে মানুষের প্রতিটি কাজ করার পেছনে একটা শালীন রীতি রয়েছে–এমন কি রাজার শোকেরও একটা সীমা সেখানে নির্ধারিত রয়েছে–সেই রীতি ভঙ্গ করে মৃতদেহের মণিমুক্তার গয়নাপরা বিবর্ণ হাতটা নিজের হাতে ধরে চিৎকার করে কাঁদতেন; ঠান্ডা রঙকরা গালে চুমু খেতেন উন্মাদের মতো।

মাত্র পনেরো বছর বয়সে ফঁতেনব্লু দুর্গে রানিকে তিনি প্রথম দেখেছিলেন। রানির বয়স তখন আরো কম। সেদিনকার রানির মূর্তিটি আবার তাঁর চোখের ওপরে ভেসে উঠল। সেইদিন ফরাসি সম্রাটের সামনে তাঁদের বিয়ের ব্যবস্থা পাকা হয়। ফিরে আসার সময় নিয়ে এসেছিলেন পীতবর্ণ চুলের ছোটো একটি আংটি, সেই সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন গাড়ি থেকে নামার পরে বালিকা বধূ তাঁর হাতে যে চুম্বন করেছিলেন সেই স্মৃতি দেশের সীমান্তবর্তী ছোটো একটি নগর বার্গোতে খুব তাড়াতাড়ি তাঁদের বিয়ে হয়েছিল; তারপরে বিরাট শোভাযাত্রা করে ফিরে এসেছিলেন মাদ্রিদে। লা অ্যাটোচা গির্জায় ধর্মীয় প্রার্থনা সভা বসেছিল; এবং তারপরেই প্রায় শ'তিনেক কাফেরকে, তাদের মধ্যে ইংরাজদের সংখ্যাও অনেক ছিল, সৈন্যবাহিনির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল পুড়িয়ে মারার জন্যে।

সত্যি কথা বলতে কি রাজা তাঁকে উন্মাদের মতো ভালোবাসতেন। নতুন বিশ্বের ওপরে আধিপত্য বিস্তার করার উদ্দেশ্যে ইংলন্ডের সঙ্গে তখন তাঁর দেশের যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। তাঁর সেই উন্মাদ প্রেমের জন্যে তাঁর দেশের সুষ্ঠু যুদ্ধ পরিচালনাও ব্যাহত হয়েছিল। এক মুহূর্তের জন্যেও তিনি তাঁকে চোখের আড়াল করতেন না। এরই ফলে অনেকের ধারণা জরুরি রাজকার্যেও তিনি অবহেলা করতেন। ভোগবাসনা মানুষকে যে ভয়ঙ্কর রকমের

অন্ধ করে দেয় তারই জন্যে তিনি দেখতে পাননি যে রানিকে তুষ্ট করার জন্যে তিনি যে বিরাট আয়োজন করেছিলেন তারই ফলে রানি একটি অদ্ভুত অসুখের কবলস্থ হয়ে পড়েছিলেন। রানির মৃত্যুর পরে কিছুটা সময় তাঁর চিন্তাশক্তি লোপ পেয়েছিল। একবার মনে হয়েছিল সিংহাসন পরিত্যাগ করে তিনি গ্রানাদার গির্জায় গিয়ে বাকি জীবনটা পারলৌকিক চিন্তায় কাটিয়ে দেবেন; কিন্তু শিশু কন্যাটিকে তিনি তাঁর নির্দয় ভাই-এর হাতে রেখে যেতে ভয় পেলেন। কারণ, স্পেনে তাঁর ভাই-এর মতো নিষ্ঠুর আর কেউ ছিল না এবং অনেকের ধারণা রানি যখন তাঁর দুর্গ অ্যারাগনে গিয়েছিলেন তখন এই লোকটিই তাঁকে একজোড়া বিষাক্ত দস্তানা উপহার দিয়ে তাঁর মৃত্যু ঘটিয়েছিলেন। এর পরে রাজা রাজ্যের মধ্যে পরের তিনটি বছর শোক পালন করার নির্দেশনামা জারি করেছিলেন। তার পরেও আর একটি বিয়ে করার জন্যে কোনো মন্ত্রীই তাঁকে রাজি করাতে সক্ষম হননি। একবার সম্রাট তাঁর ভাইঝি বোহেমিয়ার সুন্দরী আর্ক ডাচেসের সঙ্গে তাঁর বিয়ের প্রস্তাব করেছিলেন, কিন্তু বোহেমিয়ার রাষ্ট্রদূতদের ডেকে তিনি বলে দিলেন–তোমাদের সম্রাটকে জানিয়ে দিয়ো যে স্পেনের রাজা দুঃখকেই তাঁর পত্নী হিসাবে বরণ করেছেন; এবং যদিও সৌন্দর্যের তুলনায় দুঃখ অনেক বেশি বন্ধ্যা রমণী তথাপি সৌন্দর্যের চেয়ে দুঃখকেই তিনি বেশি ভালোবাসেন। তাঁর এবম্বিধ উত্তরের জন্যে অচিরাৎ তাঁকে নেদারল্যান্ড-এর প্রদেশগুলি খেসারৎ দিতে হয়েছিল; বোহেমিয়ার সম্রাটের উসকানিতে রিফর্মড চার্চের কিছু গোঁড়া নেতা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। তাঁর ছোটো মেয়েটিকে প্রাসাদের অলিন্দে খেলা করতে দেখে আগুনে উচ্ছ্বাস ভরা আর রানির হঠাৎ মৃত্যুতে যে মহাশোকের তরঙ্গ তাঁকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল, বিবাহিত জীবনের সুখ-দুঃখ ভরা সেই মেয়েটির মধ্যে ফুটে বেরিয়েছে-সেই হাসি, হাসার সময় সেইভাবে ঠোঁট বাঁকানো, সেইভাবে ঘাড় নাড়ানো,–সব সব, কিন্তু শিশুদের চিৎকার তাঁর

কান দুটো ব্যথিত করতে লাগল; মেঘমুক্ত নির্মল সূর্যের আলো তাঁর বেদনাকে ব্যঙ্গ করতে লাগল—এবং একটা অদ্ভুত বিশ্রী গন্ধ—শব সংরক্ষণ করার জন্যে চিকিৎসকেরা সাধারণত যে ধরনের গন্ধদ্রব্য ব্যবহার করে থাকে—সেই অস্বস্তিকর একটা গন্ধ-সত্যি? না, মতিভ্রম তাঁর?-পরিচ্ছন্ন প্রভাত-হাওয়াকে বিষাক্ত করে তুলল। হাত দুটোর মধ্যে মুখটাকে তিনি ঢেকে দিলেন। তারপরে রাজকুমারী আবার যখন মুখ তুলল তখন পর্দা পড়ে গিয়েছে—রাজা সেখান থেকে চলে গিয়েছেন।

রাজকুমারী একটু মনোক্ষুণ্ণ হল। বিরক্তিতে কাঁধটা কোঁচকাল! আজ তার জন্মদিন। এদিনটা তিনি এখানে থাকতে পারতেন। নিরর্থক সরকারি কাজগুলির দাম তাঁর কাছে এতই বেশি? অথবা যে অন্ধকারাচ্ছন্ন বিমর্ষ ঘরটিতে সব সময়েই বাতি জ্বলছে, আর যে ঘরে তাকে যেতে দেওয়া হয় না সেইখানেই তিনি গিয়েছেন। কী বোকা, কী বোকা! এই উজ্জ্বল আলো ছেড়ে, এই আনন্দ ছেড়ে কেউ আবার সেই অন্ধকার ঘরে যায়! তা ছাড়া শিঙা বাজছে। এখনই ষাঁড়ের লড়াই শুরু হবে। এদিক থেকে তার কাকা আর গ্র্যান্ড ইনকুইজিটর অনেক বেশি বিজ্ঞ। তাঁরা অলিন্দের ওপরে এসে তাকে উৎসাহিত করেছেন। সুতরাং সুন্দর মাথায় ঝাঁকানি দিতে দিতে ডন পেড্রোর হাত ধরে সে লম্বা তাঁবুর দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। বাগানের শেষ প্রান্তে লাল সিল্ক দিয়ে তৈরি এই তাঁবু। ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরাও তাদের পিছু পিছু এগিয়ে গেল। যার নাম সবচেয়ে লম্বা সেই চলল তাদের আগে। নামের দৈর্ঘ্যের মাপে নিজেদের শ্রেণিকে সাজিয়ে নিল তারা।

অভিজাত সম্প্রদায়ের একদল ছেলে তার সঙ্গে দেখা করল। তাদের ভেতরে ছিল তিয়েরা-নেভার যুবক কাউন্ট। বয়স তার চোদ্দর কাছাকাছি। অভিজাত সম্প্রদায়ের লাবণ্য আর পূর্ণ মর্যাদার সঙ্গে এগিয়ে এসে সে রাজকুমারীকে অভ্যর্থনা জানাল; তারপরে মাঠে যেখানে হাতির দাঁতের উঁচু চেয়ার বসানো রয়েছে সেইখানে তাকে নিয়ে গেল।

ষাঁড়ের লড়াই যা হল তা সত্যিই অপরূপ! রাজকুমারীর মনে হল পার্মার ডিউক তার বাবার সঙ্গে যখন দেখা করতে এসেছিলেন তখন যে সত্যিকার ষাঁড়ের লড়াই সে দেখেছিল এ লড়াই তার চেয়েও সুন্দর। কয়েকটি বালক বেশ ভালোভাবে সাজানো খেলার ঘোড়ার চারপাশে লম্বা বর্শা নিয়ে ঘোড়ার মতো পা তুলে-তুলে লাফাতে লাগল। আর কয়েকজন পায়ে হেঁটে তাদের লাল আলখাল্লা ষাঁড়ের সামনে দোলাতে শুরু করল। আর সেই ষাঁড় যখন তেড়ে এল তখন তারা বেড়ার এপাশে লাফিয়ে পালিয়ে এল। আর ষাঁড়টাকে দেখতে মনে হচ্ছিল যেন সত্যিকারের একটা ষাঁড়। আসলে সেটা কিন্তু চাঁচ, দরমা, আর কঞ্চি দিয়ে তৈরি ছিল; তার ওপরে চাপা দেওয়া ছিল লম্বা একটা চামড়া। মাঝে-মাঝে পেছনের পায়ে ভর দিয়ে সে যুদ্ধক্ষেত্রে ছুটে বেড়ানোর তাল কষছিল। এভাবে ছোটার কথা সত্যিকার কোনো জীবন্ত ষাঁড় স্বপ্নেও ভাবতে পারত না। আর যুদ্ধও সে কম করল না। ছেলেরা সব গাছের ডালে লাল শালু ওড়াতে-ওড়াতে ব্র্যাভো ব্র্যাভো বলে চেঁচাতে লাগল। মনে হল তারা যেন সত্যিকার বয়স্ক মানুষ। বহুক্ষণ ধরে যুদ্ধ চলল। এরই মধ্যে অনেকগুলি খেলার ঘোড়া শিংয়ের গুঁতো খেয়ে ধরাশায়ী হয়েছে। শেষকালে বিষম রণের পরে তিয়েরা-নেভার কাউন্ট সেই ষাঁড়টাকে হাঁটু মুড়ে বসাল, তারপরে রাজকুমারীর কাছ থেকে চরম আঘাত হানার নির্দেশ পেয়ে সে তার কাঠের তরোয়ালটা ষাঁড়ের ঘাড়ে এমন জোরে ঢুকিয়ে দিল যে ষাঁড়ের মাথাটা আলাদা হয়ে গেল;

আর তার ভেতর থেকে হাসতে-হাসতে বেরিয়ে এল মাদ্রিদের ফরাসি রাষ্ট্রদূতের পুত্র মঁসিয়ে দ্য লোরেঁ।

যুদ্ধক্ষেত্র পরিস্কার করার পালা এবার। জমকালো হলদে আর কালো পোশাক পরা দুজন মুরদেশীয় চাকর সেই খেলার মৃত ঘোড়াগুলির দেহ বেশ গম্ভীরভাবে বয়ে নিয়ে গেল বাইরে। তারপরে একটু বিরতি। এরই মধ্যে ফরাসি যাদুকর দড়ির ওপরে হেঁটে বেড়ালো; ইতালির মুখোশ অভিনীত হল। তারা এত সুন্দর আর স্বাভাবিকভাবে অভিনয় করল যে, পালার শেষ রাজকুমারীর চোখ দুটো জলে ভর্তি হয়ে গেল। এমন কি কয়েকটা ছেলেও দুঃখে আর্তনাদ করে উঠলো; তাদের কান্না থামানোর জন্যে শেষ পর্যন্ত তাদের মেঠাই খেতে দিতে হল। আর গ্র্যান্ড ইনকুইডিটর-ও এত অভিভূত হয়ে পড়লেন যে শেষ পর্যন্ত ডন পেড্রোকে তিনি বলতে বাধ্য হলেন—এই সব অভিনেতারা যদিও কাঠ আর রঙিন মোম দিয়ে তৈরি হয়েছে, আর যন্ত্রের সাহায্যে এদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নড়াচড়া করছে তবু এরা যে এত স্বাভাবিকভাবে এদের সুখ-দুঃখ প্রকাশ করছে এ দেখে সত্যিই তিনি মর্মাহত হয়েছেন।

তারপর এল আফ্রিকান যাদুকর। সঙ্গে নিয়ে এল একটা চ্যাপ্টা ঝুড়ি। লাল কাপড় দিয়ে সেটা ঢাকা। বাক্সটাকে জমির মাঝখানে রেখে পাগড়ির ভেতর থেকে অদ্ভুত একটা শরের পাইপ বার করে বাজাতে শুরু করল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই কাপড়টা সরতে শুরু করল, বাঁশির সুরটা জোরাল হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে দুটো সবুজ আর সোনালি রঙের সাপ তাদের গোঁজের মতো মাথাগুলি বার করে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল; তারপরে বাঁশির তালে-তালে জলের মধ্যে লতার মতো এদিকে-ওদিকে দুলতে লাগল। তাদের সেই

চিত্রিত ফণা আর লকলকে জিব দেখে শিশুরা বেশ ভয় পেযে গেল। কিন্তু তারপরেই যাদুকর যখন বালির ভেতর থেকে ফুটফুটে একটা কমলালেবুর গাছ তৈরি করে তাতে ফুল ফোঁটাল আর ফল ধরাল তখন তারা বেশ খুশি হয়ে উঠল। তারপরে যাদুকর মার্কুই দ্য লা টোরে-র বাচ্চা মেয়ের পাখাটা নিয়ে তা থেকে একটা নীল পাখি তৈরি করে ফেলল। সেই পাখিটা তাঁবুর চারপাশে ঘুরে-ঘুরে গান গাইতে লাগল। তাই দেখে শিশুদের আনন্দ আর ধরে না। নুয়েস্ত্রা সেনোরা দল পিলারের গির্জা থেকে কতগুলি নাচিয়ে বালক এসেছিল। তাদের দ্বৈত নাচ বড়োই সুন্দর হয়েছিল। এই নাচ প্রতি বছর মে মাসে ভার্জিনের বেদীর কাছে দেখানো হয়, কিন্তু রাজকুমারী আগে কোনো দিনই সে-নাচ দেখেনি। একজন উন্মাদ পাদরি, অনেকের মতে ইংলন্ডের রানি এলিজাবেথের কাছ থেকে ঘুষ খেয়ে, একবার অ্যাসটুরিয়াস-এর যুবরাজকে খাম জোড়ার সঙ্গে বিষাক্ত গঁদ দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। সেই থেকে স্পেনের রাজবংশের কেউ স্যারাগোসার বিরাট গির্জায় ঢোকেনি। এই নাচের নাম ছিল ‘আওয়ার লেডিস ড্যান্স’। রাজকুমারী লোকমুখে ওই নামটাই কেবল শুনেছিল। এই নাচ সত্যিই বড়ো সুন্দর দেখতে। এই নাচ দেখে রাজকুমারী এতই মুগ্ধ হয়ে পড়েছিল যে প্রতিদানে আওয়ার লেডি অফ পিলারের কাছে বেশ বড়ো একটা মোমের বাতি পাঠাতে কৃতসংকল্প হয়েছিল।

এগিয়ে এল একদল সুন্দর চেহারার ইজিপশিয়ান–যাযাবরদের তখন সবাই ইজিপশিয়ান বলেই চিহ্নিত করত। গোল হয়ে পায়ের উপরে পা তুলে দিয়ে বসে তারা তাদের তারের যন্ত্র তুলে নিল। খাদের সুর উঠল; আর সেই সুরের তালে-তালে দেহগুলিও তাদের দুলতে লাগল। ডন পেড্রোকে দেখেই তারা ভেংচি কাটল; আবার কেউ কেউ ভীষণ ভয় পেয়ে গেল; কারণ কয়েকদিন আগেই এই পেড্রো ডাকিনীবিদ্যার অজুহাতে ওদের

দুজনকে খোলা বাজারে ফাঁসি দিয়েছিল। কিন্তু ফুটফুটে রাজকুমারী তার পাখার ওপরে ঝুঁকে যখন তার নীল চোখ দুটি দিয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে রইল তখন তারা বেশ খুশিই হল; কারণ তারা বুঝেছিল নিষ্পাপ সুন্দর মুখ কারও ওপরে কোনোদিন নির্দয় হতে পারে না। তারপরেই হঠাৎ তারা এমনভাবে চিৎকার করে উঠল যে শিশুরা তো ঘাবড়ে গেল, এমনকি ডন পেড্রো পর্যন্ত চমকে উঠে তার কোমরের ছোরাটাকে শক্ত করে ধরলো। সেই গায়করা তখন উন্মত্তের মতো মাঠের মধ্যে নাচানাচি আর জোরাল সুরের তালে-তালে তাদের মাতৃভাষায় বিকৃত সুরে প্রেমের গান গাইতে লাগল। তারপরেই তারা সবাই মাটির ওপরে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল; মনে হল তারা সব মরে গিয়েছে। মৃদু বাজনার তালে-তালে তাদের দেহের মৃদু স্পন্দনগুলি কেবল দেখা গেল। তারপরে তারা সবাই দল বেঁধে বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরেই কটা রঙের লোমশ একটা ভালুককে চেন দিয়ে বেঁধে তারা টানতে-টানতে নিয়ে এল। তার কাঁধের উপরে কয়েকটা 'বারবারি' বাঁদর, পরিপূর্ণ গাম্ভীর্যের সঙ্গে ভালুকটা মাথার ওপরে ভর দিয়ে দাঁড়াল; আর বাঁদরগুলি তাদের মনিব দুটি জিপসি ছেলের সঙ্গে নানারকম খেলা দেখাতে লাগল। ছোটো ছোটো তরোয়াল নিয়ে তারা খেলা করল, বন্দুক ছুঁড়ল, আর রাজার সত্যিকার সৈন্যবাহিনীর মতো রীতিমতো কুচকাওয়াজ করল। এক কথায় জিপসিদের খেলা সত্যই বড়ো মনোরম হয়েছিল।

কিন্তু প্রভাতকালীন সমস্ত খেলার মধ্যে বাচ্চা বামনের নাচটাই বোধ হয় সেরা হয়েছিল। বামনটা যখন তার বাঁকানো পা দুটোর ওপরে ভর দিয়ে আর তার বিরাট বিকৃত মাথাটাকে এপাশে-ওপাশে দোলাতে-দোলাতে খেলার মাঠে নামল তখন বাচ্চারা হেসে লুটোপুটি খেতে লাগল; আর খুদে রাজকুমারীও এত হাসতে শুরু করল যে শেষ পর্যন্ত

ক্যামেরারাকে বলতে বাধ্য হতে হল যে সমগ্রোত্রীদের কাছে রাজকুমারীর কান্নার নজির স্পেনের ইতিহাসে থাকলেও, যারা নিচুস্তরের মানুষ তাদের কাছে সত্যিকার রাজকুমারীর হাসির নজির আজ পর্যন্ত নেই। কিন্তু বামনের খেলার সত্যিকার কোনো জবাব নেই। এমন কি যে সপ্যানিশ রাজদরবারে সব সময়েই পরিশীলিত বীভৎসতার জন্যে প্রসিদ্ধ ছিল সেখানেও এই জাতীয় অদ্ভুত খুদে দৈত্যকে আর কোনোদিন দেখা যায়নি। আর সবচেয়ে বড়ো কথা হচ্ছে এইটাই তার প্রথম খেলা। মাত্র একদিন আগে একে আবিষ্কার করা হয়েছিল। তখন সে বনের মধ্যে বিপুল বেগে ছুটে বেড়াচ্ছিল। স্পেনের দুজন নোবল শিকারের জমকালো পোশাক পরে সেই বনে গিয়েছিল শিকার করতে। রাজকুমারীকে অবাক করে দেওয়ার জন্যে তারাই তাকে ধরে এনেছিল। তার দরিদ্র বাবাও এইকম অপদার্থ কুৎসিত ছেলেকে বিদায় করে বেঁচেছিল। বোধহয় সবচেয়ে মজার কথা হচ্ছে তার এই অদ্ভুত বিকলাঙ্গের কথা সে নিজেও জানত না। সত্যি কথা বলতে কি এই খেলা দেখিয়ে সে নিজেও বেশ আনন্দ পেয়েছিল। শিশুরা যখন হাসছিল, সেও তখন তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আসছিল। প্রতিটি খেলার শেষে সে তাদের দিকে মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানাচ্ছিল। মনে হয়েছিল সে যেন ওদেরই একজন; প্রকৃতি যে অপরকে হাসানোর জন্যে খামখেয়ালির বশে তাকে বিকৃতাঙ্গ করে সৃষ্টি করেছিল সেকথা সে ভাবতেও পারেনি। আর রাজকুমারী তো একেবারে মোহিত হয়ে গিয়েছিল। সেও রাজকুমারীর দিক থেকে তার চোখ দুটো সরাতে পারেনি। তার মনে হয়েছিল কেবল রাজকুমারীর জন্যেই সে নাচবে। রাজকুমারীও শেষকালে কিছুটা রসিকতা আর কিছুটা ক্যামেরারাকে বিরক্ত করার জন্যে তার চুল থেকে একটা গোলাপ খুলে মিষ্টি হেসে তার দিকে ছুঁড়ে দিল। বামনও সব জিনিসটা বেশ আনন্দের সঙ্গেই গ্রহণ করল। গোলাপ ফুলটাকে বিকৃত ঠোঁটের উপরে চেপে একটা হাত সে নিজের বুকের ওপরে রাখল।

আনন্দে তার মুখের ওপরে বিকৃত হাসি ফুটে উঠল। চোখ দুটো চকচক করতে লাগল তার।

বামন খেলা শেষ করে ছুটে বেরিয়ে গেল মাঠ থেকে। রাজকুমারী মুষড়ে পড়ে তার কাকাকে বলল–এখনই আবার ওকে খেলা দেখাতে বলুন। কিন্তু ক্যামেরারা তাকে বুঝিয়ে বলল যে, অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে। এখন রাজকুমারীর প্রাসাদে ফেরা উচিত। সেখানে তার জন্মদিন মহা সমারোহে উদযাপন করার জন্যে বিরাট ভোজের আয়োজন হয়েছে, তার নিজের হাতে সই করা সত্যিকার জন্মদিনের কেক তৈরি করা হয়েছে। এই সব শুনে রাজকুমারী পরিপূর্ণ মর্যাদার সঙ্গে উঠে প্রাসাদের দিকে এগিয়ে গেল; কিন্তু যাওয়ার আগে নির্দেশ দিয়ে গেল যে মধ্যাহ্ন ভোজনের বিরতির পরে আবার সেই বামনকে খেলা দেখাতে হবে। যাওয়ার আগে টিমেরা-নেভার কাউন্টকেও তার অপূর্ব অভ্যর্থনার জন্যে সে ধন্যবাদ জানাল। তার পিছুপিছু ছেলেমেয়েরাও ফিরে গেল–ঠিক যেভাবে তারা পরপর এসেছিল ঠিক সেইভাবেই ফিরল তারা।

খুদে বামন যখন শুনল রাজকুমারীর বিশেষ ইচ্ছাতেই আবার তাকে তার কাছে নাচতে হবে তখন সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল। দৌড়ে বাগানের মধ্যে বেরিয়ে গেল সে। সেইখানে সেই সাদা গোলাপটা নিয়ে হাস্যকর একটা আনন্দে চুমু খেতে লাগল। তার আনন্দ বাইরে প্রকাশ করতে লাগল একটা বিকৃত অঙ্গভঙ্গির ভেতর দিয়ে।

দৈত্যের মতো তাকে বাগানে ঘুরে বেড়াতে দেখে ফুলেরা ভীষণ বিরক্ত হল।

টিউলিপ ফুলেরা বলল–লোকটা এতই কুৎসিত যে আমরা যেখানে থাকি সেখানে ওকে খেলা করতে দেওয়া উচিত নয়।

লাল টকটকে লিলিরা তো চটে লাল, তারা বেশ উষ্মার সঙ্গে বলল–আফিঙের জল খেয়ে লোকটার হাজার বছর ঘুমানো উচিত।

কান্নার সুরে ক্যাকটাস বলল–লোকটা একেবারে মূর্তিমান আতঙ্ক–যাকে বলে একেবারে অষ্টবক্র। আর ওর মাথাটা কী বিরাট দেখেছ? ও দে পায়ের ওপরে অত বড়ো মাথাট কী বেখাপ্পাই না দেখাচ্ছে! ওকে দেখেই আমার সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে। ও যদি আমার কাছে আসে তাহলে ও গায়ে আমার কাঁটা দিয়ে এমন ফুটিয়ে দেব না!

সাদা গোলাপ-গাছটা বলল–সত্যি বলতে কি ও আমার সেরা ফুলটা নিয়ে নিয়েছে। আজ সকালে রাজকুমারীকে আমি ওটা নিজেই দিয়েছিলাম তাঁর জন্মদিনের উপহার হিসাবে ও তাঁর কাছ থেকে ফুলটা চুরি করে নিয়েছে। এই বলেই সে চিৎকার করে উঠল–চোর!চোর!

চরিত্রের দিক থেকে লাল জিরেনিয়াম ফুলগুলি সাধারণত বেশ নম্র। ফুলের জগতে তার অনেক দরিদ্র আত্মীয়-স্বজন রয়েছে। তারাও তাকে দেখে বিরক্তিতে কেমন যেন কুঁকড়ে গেল। ভায়লেট চুলেরা বেশ নম্রভাবেই মন্তব্য করল: লোকটা খুবই সাদাসিধে মলে, সাদাসিধে না হয়ে ও পারে না। তবু তারা বেশ বিজ্ঞভাবেই বলল যে ওটাই ওর সত্যিকারের ত্রুটি; এবং রোগটাকে সারানো যায় না বলে মানুষকে প্রশংসা কেন করা

হবে সে বিষয়ে তারা বেশ। যুৎসই একটা যুক্তি খুঁজে পেল না। এমন কি তারা একথা বলতেও দ্বিধা করল না যে ওই খুদে। বামনটা তার কুৎসিত রূপটাকে নিয়ে বড়ো বেশিই বাড়াবাড়ি করছে, তার উচিত ছিল কিছুটা দুঃখ করা; অন্তত কিছুটা বিষণ্ণ হওয়া। তা না করে হতভাগাটা বিপুল আনন্দে লাফালাফি দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে।

ওদের মধ্যে সূর্য-ঘড়িটাই বোধ হয় সবচেয়ে বিশিষ্ট বস্তু। সম্রাট পঞ্চম চার্লস-এর মতো মানুষকেও সে সময় বলে দিতে পেরেছিল। ওই খুদে বামনের চেহারা তাকেও কেমন যেন ঘাবড়ে দিয়েছিল। ফলে ছায়ার আঙুল দিয়ে পুরো দুটি মিনিট সময় নির্ধারণ করতে সে ভুলে গিয়েছিল। রেলিঙের ধারে দুধের মতো সাদা যে ময়ূরটা রোদ পোহাচ্ছিল তাকে লক্ষ করে। তাই সে না বলে পারল না–সবাই ডালে রাজার ছেলে রাজাই; আর কয়লা কুড়ানির ছেলে কয়লা কুড়ানিই। এর ব্যাতিক্রম কিছু রয়েছে এটা চিন্তা করাই হাস্যকর। এই মন্তব্যের সঙ্গে ময়ূরও একমত, তাই সে চিৎকার করে বলল–নিশ্চয়, নিশ্চয়। তার সেই কাংস ক্রেংকার ধ্বনি। শুনে ঠান্ডা ঝরনার জলে যে সমস্ত সোনালি মা-এর দল জলকেলি করছিল তারা হঠাৎ ভ্য পেয়ে চমকে উঠে জলের ওপরে মাথা তুলে বিরাট বিরাট পাথরের মূর্তিগুলিকে জিজ্ঞাসা করল–পৃথিবীকে কী ঘটছে বল তো? এত হইচই কেন?

যাই হোক, পাখিরা কিন্তু তাকে বেশ পছন্দ করত। বনের ঝরা পাতার পেছনে-পেছনে বনপরীরদের মতো ছুটতে তারা তাকে দেখেছে অথবা প্রাচীন ওক গাছের কোটরে যুঁড়ি দিয়ে শুয়ে কাঠবিড়ালির সঙ্গে ভাগ করে সে বাদাম খাচ্ছে এ-দৃশ্যও অনেকবার তাদের চোখে পড়েছে। ও যে একটু কুৎসিত তার জন্যে তাদের কোনো অভিযোগ নেই। এমন

কি অমন যে নাইটিংগেল পাখি যার মিষ্টি গান শোনার জন্যে মাঝে-মাঝে কমলালেবুর ঝোপের মধ্যে চাঁদও ঝুঁকে পড়ে, সেই বা কী এমন আহামরি দেখতে! তা ছাড়া, মনটাও ওর বড়ো উদার। কড়া শীতের দিনগুলিতে যখন বনের মধ্যে বেরি ফল দুপ্রাপ্য হয়ে ওঠে, মাটি লোহার মতো শক্ত বরফে ভরে যায়, এমন কি খাবারের সন্ধানে বুলো ভালুকগুলো পর্যন্ত শহরের দরজায়। এসে উপস্থিত হয়–সেই সময়েও ও একবারও তাদের কথা ভোলেনি; নিজের সামান্য খাবার তাদের ভাগ করে দিয়েছে।

সেই জন্যে তারা তার চারপাশে ঘুরে-ঘুরে উড়তে লাগল; ওড়ার সময় তাদের পাখা দিয়ে তার গলাটা সপর্শ করে গেল। এই দেখে বামন খুব খুশি। সে তাদের সেই সাদা গোলাপটা দেখিয়ে বলতে লাগল–দেখ, দেখ। এটা আমাকে রাজকুমারী উপহার দিয়েছে। কারণ, রাজকুমারী তাকে ভালোবাসে।

তার কথার বিন্দুবিসর্গ তারা বুঝতে পারল না, কিন্তু তাতে কিছু আসে-যায় না। তারা ঘাড়গুলিকে একদিকে ঘুরিয়ে বিজ্ঞের মতো বসে রইল। কোনো কিছু বোঝার ওইটাই একমাত্র প্রশস্ততম আর সহজতম পথ

এমন কি টিকটিকিগুলিও তাকে বেশ পছন্দ করত। কারণ ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে সে যখন ঘাসের ওপরে গড়াগড়ি দিত তখন তারা তার গায়ের ওপরে লাফালাফি করত। তারা বলাবলি করত–অবশ্য টিকটিকির মতো সুন্দর প্রাণী সবাই হতে পারে না–সেকথা চিন্তা করাও বাতুলতা। আর যদিও বলতে বেশ অদ্ভুত-ই লাগছে তবু একথা সত্যি যে লোকে ওকে যতটা কুৎসিত মনে করে ও ততটা কুৎসিত নয়। শুধু চোখ দুটো তোমার বন্ধ

করে রাখ ওর দিকে তাকিয়ো না। তাহলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। চরিত্রের দিক থেকে টিকটিকিরা। প্রথম শ্রেণির দার্শনিক। যখন করার কিছু না থাকে, অথবা বৃষ্টির দিনে যখন বাইরে বেরোনো। যায় না তখন তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে চুপচাপ বসে থেকে চিন্তা করে যায়।

ওদের চালচলন আর ব্যবহারে ফুলেরা বড়োই বিষুব্ধ হয়ে উঠল। নিজেদের মধ্যে তারা বলাবলি করতে লাগল-রাতদিন এই রকম ফল-ফস করে, হইচই করে উড়ে বেড়ানোর ফলটা কী বিষময় দেখ। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা আমাদের মতো চিরকাল একই জায়গায় বসে থাকে। লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে অথবা ফড়িং-এর পেছনে ঘাসের ভেতর দিয়ে দৌড়ে বেড়াতে কেউ কি আমাদের কখনো দেখেছে? হাওয়া পরিবর্তনের প্রয়োডন বুঝলে আমরা বাগানের মালিকে সংবাদ পাঠাই। সে অন্য বিছানায় আমাদের বয়ে নিয়ে যায়। আমরা যে সম্ভ্রান্ত শ্রেণির এটা থেকেই তা প্রমাণিত হয় এবং তাই হওয়া উচিত। কিন্তু পাখপহক্ষী আর টিকটিকি-গিরগিটিদের বিশ্রাম করার যে প্রয়োজনীয়তা রয়েছে সে বিষয়ে কোন জ্ঞান নেই। আর সত্যি কথা বলতে কি পাখিদের স্থায়ী কোনো ঘরবাড়িও নেই। তারা জিপসিদের মতোই ভবঘুরে। তাদের ঠিক সেই ভাবেই দেখা উচিত।

এই বলেই উদ্ধত ভঙ্গিতে নাক উঁচিয়ে দিল তারা। কিছুক্ষণ পরে বামন যখন ঘাস থেকে উঠে প্রাসাদের অলিন্দের দিকে এগিয়ে গেল তখন তারা খুব খুশি হয়ে উঠল। তারা। বলল–যাবজ্জীবন ঘরের মধ্যে ওকে বন্দী করে রাখা উচিত। পিঠের ওপরে কুঁজ আর বাঁকা। পাগুলির দিকে ওর একবার তাকিয়ে দেখ-রামশ্চন্দ্র, রামশ্চন্ত্র।

কিন্তু বামনটি এত সব কথার কিছুই জানতে পারল না। পাখি আর টিকটিকিদের সে খুবই ভালোবাসত। তার কাছে ফুলগুলি ছিল বিশ্বের অপরূপ সুন্দর–অবশ্য এক রাজকুমারী ছাড়া। সে তাকে সেই সুন্দর লাল গোলাপটি দিয়েছে এবং সে তাকে ভালোবাসে। এটাই তো সবচেয়ে বড়ো কথা রাজকুমারীর কাছে ফিরে গেলে কতই না খুশি হত সে। ডান হাতের ওপরে তাকে বসিয়ে রাজকুমারী তার দিকে চেয়ে হাসত। সে তাহলে রাজকুমারীকে তার খেলার সঙ্গী করে নিতে পারত, অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত খেলা শেখাতে পারত তাকে। কারণ এর

আগে যদিও সে কোনোদিন প্রাসাদে আসেলি তাহলেও সে অনেক বিস্ময়কর কাজ করতে জানে। ফড়িংরা যাতে গান করতে পারে সেই জন্যে শরগাছ দিয়ে সে বেশ ছোটো ছোটো খাঁচা তৈরি করতে পারে। তৈরি করতে পারে তললা বাঁশের বাঁশি। সে প্রতিটি পাখিরই ডাক জানে; আর নানা জায়গা থেকে নানা পাখির স্বর নকল করে তাদের ডাকতে পারে। ঋতুর পরিবর্তনে অরণ্যভূমিতে যে সব বিভিন্ন নাচ শুরু হয় তার সব কাটাই তার মুখস্থা বুনো পায়রা কোথায় বাসা বাঁধে তাও তার অজানা নয়। একবার একটা ব্যাধ দুটো পায়রাকে জাল পেতে ধরে নিয়ে গেল। তাদের বাচ্চাগুলোর কী দুর্দশা! সে তাদের নিয়ে এসে একটা বাসা তৈরি করে দিল। তারা বেশ পোষ মেনে গিয়েছিল। প্রতিদিন সকালে তারা তার হাত থেকে খাবার। খেয়ে যেত। রাজকুমারীরও ভালো লাগবে তাদের। ভালো লাগবে কাঁটার মতো লম্বা। ঠোঁটওয়ালা ডে পাখিদের, বন্য শুয়োর আর বিত্ত মন্থরগতি কচ্ছপদের যারা বনের মধ্যে ঘাড় দুলিয়ে-দুলিয়ে হাঁটে আর কচি-কচি পাতা ঠুকরে-ঠুকরে খায়। নিশ্চয়, বনের মধ্যে গিয়ে তার সঙ্গে খেলতে তাকে হবেই। সে তাকে তার ছোট্ট বিছানার একপাশে শুতে দেবে। যাতে কোনো বন্য

ডানোয়ার তার বিছানার কাছে আসতে না পারে সেই জন্যে সারারাত জেগে সে পাহারা দেবে। সকাল হলে সে তাকে ভাগাবে; তারপর সারাদিন দুজনে তারা বনের মধ্যে নেচে নেচে বেড়াবে। মাঝে মাঝে সাদা খচ্চরের উপরে চড়ে পাদরি বই পড়তে পড়তে সেদিকে আসবে, আর আসবে জমকালো পোশাক পরা শিকারির দল। মদ তৈরি করার সময় আঙুর। ফলের ব্যবসাদাররা আসবে, হাত-পা তাদের লাল রঙে মাখা; কাঁধের ওপরে ভিস্তি, সেই ভিস্তি থেকে চুইযে গড়িয়ে পড়বে মদের ফোঁটা। বনবাসীরা বনের মধ্যে চারকোল পোড়াবে; ডাকাতরা গুহা থেকে বেরিয়ে তাদের অব লুটপাট করে নিয়ে যাবে। সত্যি সত্যিই বনের মধ্যে দেখার অনেক জিনিস রয়েছে। সেই সব দেখে যখন সে ক্লান্ত হয়ে পড়বে তখন সে তাকে ভলার ধারে নিয়ে যাবে। যদিও সে লম্বা নয় তবুও যে সে শক্তিমান একথা সে জানে। লাল বেরির হার গড়িয়ে দেবে সে। আজ রাজকুমারী তার পোশাকের ওপরে যে সাদা বেরির। হার পরেছিল তারই মতো সুন্দর দেখাবে লাল বেরি। সে সবও যখন রাজকুমারীর আর ভালো লাগবে না তখন সে তার জন্যে অন্য ব্যবস্থা করবে।

কিন্তু রাজকুমারী বর্তমানে কোথায়? সাদা গোলাপকে জিজ্ঞাসা করল। সে কিন্তু কোনো উত্তর পেল না। সারা প্রাসাদটাই যেন ঘুমোচ্ছে। এমন কি যে সব জানালা খোলা ছিল তাদের। ওপরেও ঝুলছিল বেশ মোটা পর্দা। ভেতরে ঢোকার একটা কিছু রাস্তা বার করার জন্যে সে প্রাসাদের চারপাশে ঘুরে বেড়াতে লাগল। অবশেষে সে দেখতে পাল ছোটো একটা খিড়কির দরজা খোলা রয়েছে। ঢুকতেই সে চমৎকার বেশ বড়ো একটা ঘরের ভেতরে হাজির হল। তার ভয় হল ঘরটা বনের চেয়েও অনেক বেশি সুন্দর। কারণ দেওয়ালে তার নকশা-কাটা; আর মেঝেটাও রঙিন পাথর দিয়ে মাড়া একরকম

জ্যামিতিক পদ্ধতিতে সেগুলি গাঁথা। কিন্তু খুদে রাজকুমারী সেখানে নেই। রয়েছে কেবল উঁচু বেদীর ওপরে কয়েকটি মূর্তি বিষণ্ণ উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টি দিয়ে আর অদ্ভুত রকমের হাসি হেসে তারা তার দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে।

ওই ঘরেরই শেষ প্রান্তে আর একখানা ঘর নকশা করা কালো ভেলভেটের পর্দা ঝুলছে সেখানে। রাজকুমারী কি ওরই পেছনে লুকিয়ে রয়েছে? অন্তত চেষ্টা করে দেখতে দোষটা কী? এই বলে সে নিঃশব্দে এগিয়ে গেল। পর্দাটাকে টেনে সরিয়ে দিল একপাশে। না, ওখানে কেউ নেই। রয়েছে একখানা ঘর। সেটা আগের ঘরের চেয়েও সুন্দর। আগে এই ঘরটা ব্যবহার। করতেন জাঁলিফো। সবাই তাঁকে পাগলা রাজা বলে ডাকতা শিকার করতে তিনি এতই ভালোবাসতেন যে ঘুমোতে-ঘুমোতেও তিনি চিৎকার করে উঠতেন। এখন এটা মন্ত্রণাকক্ষ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

অবাক চোখে আমাদের খুদে বামনটি চারপাশে তাকাতে লাগল। আর এগোতে তার সাহস হল না। কিন্তু সেই সুন্দরী রাজকুমারীর কথা ভেবে তার বুকে বল এল। সে তো কেবল তাকেই চায়। সে যে তাকে কত ভালোবাসে সেই কথাটাই তো সে তাকে জানাতে চায়। সম্ভবত রাজকুমারী তার পাশের ঘরেই রয়েছে।

সেই নরম মোটা কার্পেট পেরিয়ে সে ছুটে গেল সামনে; দরজা খুলল, না! সেখানেও সে নেই। ঘর খালি। সেখানে রয়েছে কেবল একটা সিংহাসন। এখানে আগে রাজা বিদেশি রাষ্ট্রদূতদের অভ্যর্থনা জানাতেন। এখন আর বেশি রাষ্ট্রদূত আসে না। তাই রাজা এখানে পরিচিতদের দর্শন দেন। ইংলন্ডের রানির সঙ্গে স্পেনের যুবরাজের বিয়ের সম্বন্ধ করতে

এই ঘরেই অনেক বছর আগে একদন ইংলন্ড থেকে দূত এসেছিল। নানা ঐশ্বর্য আর রম্য স্মৃতির চিহ্ন দিয়ে এই ঘরটি সাজানো। কিন্তু খুদে বামনটির এসব দিকে বিশেষ লক্ষ বা আকর্ষণ ছিল না। সে চেয়েছিল তাঁবুতে রাজকুমারী যাওয়ার আগে তার সঙ্গে একবার দেখা করতে এবং নাচের। শেষে তার সঙ্গে বনে চলে যাওয়ার কথা বলতে। প্রাসাদে বাতাস বড়ো ভারী; কিন্তু অরণ্যে হওয়া মুক্তা প্রভাতের সোনালি রোদ সারা বনের ওপরে সোনার রঙে রাঙিয়ে দেয়। নিশ্চয়। তার সঙ্গে দেখা হলে সে তাকে নিয়ে যাবেই। এই ভেবেই তার মুখের ওপরে হাসি ফুটে উঠল। পরের ঘরে সে ঢুকে গেল।

এতক্ষণ যতগুলি ঘর সে দেখেছে তাদের মধ্যে এই ঘরটিই সবচেয়ে সুন্দর আর উজ্জ্বল। নানা বর্ণে চিত্রিত দেওয়াল আসবাবপত্রগুলি ভারী-ভারী রুপোর তৈরি। বিরাট-বিরাট দুটো চুল্লির মাঝখালে বিরাট পর্দা ঝুলছে। সেই পর্দার ওপরে টি আর ময়ূরের ছবি। মেঝেটা সমুদ্রের মতো সবুজ ওনিক্স পাথর দিয়ে মোড়া। সেই চকচকে মেঝেটা অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। হঠাৎ সে লক্ষ করল ঘরে সে একা নেই। দরজার সামনে যে ছায়া পড়েছে তারই আড়ালে দাঁড়িয়ে বেঁটে চেহারার একটা লোক তাকে লক্ষ করছে। তার বুকটা দুরুদুরু করে কেঁপে উঠল; তার ঠোঁটের ভেতর থেকে আনন্দের ধ্বনি ফুটে বেরোল। সে রোদের মধ্যে এসে দাঁড়াল। সে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট লক্ষ করল সেই মূর্তিটাও বেরিয়ে এসেছে।

রাজকুমারী! না, না। এ একটা রাক্ষস। এরকম কিম্ভুতকিমাকার দৈত্য জীবনে সে আর কোনোদিন দেখেনি। অন্য সব মানুষের মতো তার দেহ পুষ্ট নয়; তার পিঠের ওপরে বিরাট একটা কুঁজ; তার পাগুলো বাঁকা; মাথার ওপরে বিরাট বিসদৃশ মাথা; আর টিকিতে

একঝাঁক কালো চুল। তাই দেখে আমাদের বামনটি বিষ্ণায় তার ভুরু কোঁচকাল; দৈত্যটাও তার দিকে তাকিয়ে ভুরু কোঁচকাল তার। সে হাসল, তাই দেখে মূর্তিটা হাসল। সে দু'পাশে হাত দুটো ছড়িয়ে দিল। সেই দৈত্যটাও অনুকরণ করল তাকে। সে মুখ ভেঙল, দৈত্যটাও তাকে ঠিক একই ভাবে মুখ ভেঙাল। সে তার দিকে এগিয়ে গেল, দৈত্যটাও এগিয়ে এল তার দিকে।

বামনটি যে কটা পা এগোল, দৈত্যটাও গুণে-গুণে সেই কটা পাই এগোল। সে থামল, দৈত্যটাও থেমে গেল। আনন্দে চিৎকার করে দৌড়ে গিয়ে তাকে ধরার জন্যে সে হাত বাড়াল। দৈত্যটাও তার হাতটা ধরলা একেবারে ঠান্ডা কনকনে হাতা ভয় পেয়ে সে তার হাতটা সরিয়ে নিল, দৈত্যটাও সরিয়ে নিল তার হাত। সে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু শক্ত আর মসৃণ একটা জিনিস তাকে বাধা দিল। দৈত্যের মুখটা একেবারে তার মুখের ওপরে এসে পড়েছে। ভয়ে সে। কাঁপতে লাগল। চোখের ওপর থেকে হাতে করে সে তার চুলগুলি সরিয়ে দিল। দৈত্যটাও তাকে অনুকরণ করল। সে দৈত্যটাকে থাপ্পড় মারল, দৈত্যটাও থাপ্পড় মারল তাকে। সে পিছু হটে এল-দৈত্যটাও পিছিয়ে গেল।

কী ওঠা? এক মুহূর্ত চিন্তা করে সে ঘরের চারপাশে তাকাল। কী অদ্ভুত ব্যাপার! সেই অদৃশ্য পরিচ্ছন্ন জলস্তম্ভের মধ্যে ঘরের প্রতিটি জিনিসই প্রতিবিম্বিত হয়েছে। হ্যাঁ, প্রতিটি জিনিসেরই প্রতিফলন পড়েছে–প্রতিটি জিনিসেরই।

এটা কী তাহলে প্রতিধ্বনি? একবার পাহাড়ি উপত্যকায় সে এই প্রতিধ্বনিকে ডেকেছিল–প্রতিধ্বনি তার প্রতিটি কথারই উত্তর দিয়েছিল। মানুষের স্বরের মতো তার দেহটাকেও কি সে ব্যঙ্গ করতে পারে? এটা কি তাহলে?

সে চমকে উঠল। বুকের ওপর থেকে শ্বেত গোলাপটা তুলে নিয়ে চম খেলা দৈত্যটারও লিডের একটা গোলাপ ছিল। পাপড়িতে-পাপড়িতে একেবারে একা সেও সেই রকম চুমু খেল, আর বীভৎস অঙ্গভঙ্গি সহকারে ফুলটাকে সে নিজের বুকের ওপরে চেপে ধরল।

সত্যটা বোঝার সঙ্গে সঙ্গে নৈরাশ্যের একটা বিরাট আর্তনাদ করে সে মাটির ওপরে লুটিয়ে পড়ে ফোঁপাতে লাগল। তাহলে সে নিজেই এই রকম বীভৎস আর বিকলাঙ্গ? তার পিঠের ওপরেই কুজ রয়েছে দেখতে সেই কিম্ভুতকিমাকার! সে নিজেই তাহলে দৈত্য; আর তবে দেখেই তাহলে ছেলেমেয়েরা ওইরকম হাসছিল। আর সেই রাজকুমারী! সে মনে করেছিল রাজকুমারী তাকে ভালোবাসে কিন্তু সে-ও তো তাহলে তাকে ব্যঙ্গ করেই হাসছিল। তার সেই বিকৃত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখে রসিকতা করছিল! তারা তাকে বলেই রেখে এল না কেন? বলে তো কোনো আয়না নেই। তার বাবা তাকে মেরে না ফেলে তাকে এইভাবে বিক্রি করে দিল। কেন? তার চোখ দুটো গরম জলে ভরে উঠল। শ্বেত গোলাপটিকে সে ছিঁড়ে ফেলল টুকরো টুকরো করে, দৈত্যটাও ঠিক সেই রকম পাপড়িগুলো একটা একটা করে ছিঁড়ে মেঝের ওপরে ছড়িয়ে দিল। পাচ্ছে তার সঙ্গে আবার দেখা হয়ে যায় এই ভয়ে চোখে হাত চাপা দিয়ে আহত, পশুর মতো ছায়ার দিকে গুঁড়ি দিয়ে সে এগিয়ে গেল, তারপরে ফোঁপাতে লাগল।

ঠিক সেই মুহূর্তে মুক্ত গবাক্ষ দিয়ে দলবল নিয়ে রাজকুমারী সেইখানে এসে হাজির হল। তারা দেখল সেই কুৎসিত খুদে বামনটি মেঝেতে শুয়ে খুব জোরে জোরে আর বিস্ময়কর ভাবে মেঝের ওপর ক্রমাগত ঘুষি মেরে চলেছে। এই দেখে তারা সব আনন্দে হো-হো কর হেসে উঠল। তারপরে তার চারপাশে ঘিরে দাঁড়িয়ে তার খেলা দেখতে লাগল।

রাজকুমারী বলল–কী হাসির নাচ দেখ! কিন্তু ওর অভিনয় আরো হাসির। ওকে দেখলে ঠিক মনে হবে ও যেন একটা পাপেট; তবে ঠিক পাপেট-এর মতো স্বাভাবিক নয়।

এই বলে তার সেই পাখাটা হাওয়া খাওয়ার ভঙ্গিতে লাডিযে সে হাততালি দিল।

কিন্তু সেই খুদে বামনটি ওপরের দিকে তার মুখ আর তুলল না। তার ফোঁপানি ধীরে ধীরে মৃদু থেকে মৃদুতর হয়ে এল। তারপরে সে একটা অদ্ভুত রকম মূখব্যাদান করে নিজের দেহটাকে হাত দিয়ে জাপটে ধরল; আবার সে পড়ে গেল তারপরে সব চুপচাপা।

একটু থেমেই চিৎকার করে উঠল রাজকুমারী-বহুত আচ্ছা। কিন্তু এখন তো তোমাকে নাচতে হবে।

শিশুরা চিৎকার করে সমর্থন জানাল তাকে–হ্যাঁ, নিশ্চয়। ওঠ নাচবে চল। কারণ বারবারি বাঁদরের মতোই তুমি চতুর এবং বেশি হাস্যকর।

কিন্তু কোনো উত্তর এল না খুদে বামনটির কাছ থেকে।

রাগে গরগর করেত-করতে রাজকুমারী মাটিতে পা ঠকতে লাগল। এমন সময় চ্যামবারলেনের সঙ্গে মেকসিকো থেকে আসা নতুন সংবাদ পড়তে-পড়তে তার কাকা অলিন্দের উপর পায়চারি করছিল। সেইখানেই সেশনের ‘হোলি অফিস’ সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রাজকুমারী তার কাকাকে ডেকে বলল–আমার এই আমুদে বামনটা রাগ করে ঘুমোচ্ছে। আপনি ওকে তুলে দিয়ে আমার জন্যে নাচতে বলুন।

তারা নিজেদের মধ্যে একটু হাসাহাসি করল। তারপরে ঝুঁকে পড়ে তাঁর কারুশিল্প খচিত দস্তানা দিয়ে ডন পেড্রো তার গালে বিরাট একটা চড় কষিয়ে দিলেন–ওঠ; বেটা ওঠ। স্পেনের আর ইনডিস-এর রাজকুমারী তোর নাচ দেখতে চান। তোকে নাচতে হবে, বীভৎস জানোয়ার।

কিন্তু খুদে বামনটির কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

ডন পেড্রো ক্লান্তভাবে বললেন–চাবুক মাস্টারকে সংবাদ দিতে হবে।’ এই বলে তিনি অলিন্দের দিকে বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু চ্যামবারলেনকে বেশ গম্ভীর দেখা গেল। সে বামনটির পাশে হাঁটু মুড়ে বসল এবং তার বুকের উপরে হাতটা রাখল। কয়েক মুহূর্ত পরে কাঁধটা কুঁচকে সে দাঁড়িয়ে উঠে রাজকুমারীর সামনে মাথাটা একটু নুইয়ে বলল–আমার সুন্দরী রাজকুমারী, আপনার এই আমুদে বামনটি আর কোনোদিনই নাচবে না। রাজাকে হাসানোর মতো সে যে এতটা কুৎসিত হয়ে জন্মেছে এইটাই খুব দুঃখের কথা।

হাসতে-হাসতে রাজকুমারী জিজ্ঞাসা করল–কিন্তু ও আর নাচবে না কেন?

কারণ, তার হৃদয়টা ভেঙে গিয়েছে উত্তর দিল চ্যামবারলেন।

এই শুনে রাজকুমারী ভ্রূকুটি করল; তার সেই গোলাপের পাপড়ির মতো ওষ্ঠ-যুগল ঘৃণায় বিকৃত হয়ে উঠল। সে চিৎকার করে বলল–যার হৃদ্য আছে ভবিষ্যতে সে যেন আমার সঙ্গে খেলতে না আসে।

এই বলেই সে দৌড়ে বাগানের দিকে চলে গেল।

স্বার্থপর দৈত্য

The Selfish Giant

প্রতিদিন বৈকালে স্কুল থেকে ফিরে আসার পথে শিশুরা দৈত্যের বাগানে ঢুকে খেলা করত। বাগানটি বেশ বড়ো আর সুন্দর। নবম ঘাসে একেবারে বোঝাই। ঘাসের বনে এখানে-ওখানে নক্ষত্রের মতো সুন্দর-সুন্দর ফুল থাকত ফুটে। বাগানে ছিল বারোটা পিচ ফলের গাছ। বসন্তের সমাগমে সে-সব গাছে পাটুল বর্ণের আর মুক্তার মতো সাদা ধবধবে ফুল ফুটত শরতে ধরত ফল। গাছের ডালে বসে পাখিরা এমন মিষ্টি গান গাইত যে ছেলেরাও খেলা ভুলে গিয়ে তাদের গান শুনত। নিজেদের ভেতরে চিৎকার করে তারা বলাবলি করত–আমরা এখানে। খেলা করে কত সুখী হয়েছি।

একদিন সেই দৈত্য এসে হাজির। সে বেড়াতে গিয়েছিল তার বন্ধু কর্নিশ দৈত্যের বাড়িতে। সেখানে সাত বছর সে ছিল। কথাবার্তায় সে যে বিশেষ পটু ছিল তা নয়। তবু এই সাত বছরে যতটুকু আলাপ করা দরকার তা সে বন্ধুর সঙ্গে করেছে; তারপরে নিজের দুর্গে ফিরে আসতে

সে বদ্ধপরিকর হয়েছে। ফিরে এসেই সে দেখতে পেল ছেলেরা তার বাগানে খেলছে।

বেশ রাগত কণ্ঠেই সে জিজ্ঞাসা করল–তোমরা এখানে কী করছ হে?

এই কথা শুনেই ছেলেরা দৌড়ে পালিয়ে গেল সেখান থেকে।

দৈত্যটা বলল–আমার নিজের বাগান আমার নিজের সম্পত্তি। যে-কোনো মানুষই তা বুঝতে পারে। এখানে আমি কাউকে খেলা করতে দেব না; খেলব আমি কেবল নিজে।

এই সিদ্ধান্ত নিয়ে বাগানের চারপাশে সে বিরাট একটা দেওয়াল তুলে দিল; তার ওপরে ঝুলিয়ে দিল একটা বিজ্ঞাপন–

বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করলে
দণ্ডণীয় হতে হবে

দৈত্যটি বড়োই স্বার্থপর!

বেচারাদের এখন আর কোথাও খেলার জায়গা নেই। তারা রাস্তার ওপরে খেলতে চেষ্টা করল কিন্তু ধুলো আর শক্ত পাথরকুচিতে রাস্তা একেবারে বোঝাই। রাস্তাটা তাদের ভালো লাগল না।

পড়াশুনা শেষ হয়ে যাওয়ার পরে তারা ওই উঁচু দেওয়ালের চারপাশে ঘুরে বেড়াতে লাগল। নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল–এর মধ্যে কত আনন্দেই না থাকতাম আমরা! তারপর বসন্ত এল। সারা অঞ্চল জুড়ে ছোটো-ছোটো ফুল আর পাখিতে গেল ভরে। কেবল সেই স্বার্থপর দৈত্যের বাগানে তখনো শীতকাল কায়েমি হয়ে রইল।

সেখানে শিশুরা ছিল না বলে পাখিরা সেখানে গান গাইতে চাইল না, গাছেরা ভুলে গেল ফুল ফোঁটাতে। একবার একটি সুন্দর ফুল ঘাসের ভেতর থেকে মাথাটা তুলতেই ঝোলানো বিজ্ঞাপনটা তার চোখে পড়ল; সেই দেখে ছেলেদের জন্যে তার মনটা এতই খারাপ হয়ে গেল যে মাথাটা সে ঘাসের বনে লুকিয়ে সটান ঘুমিয়ে পড়ল। যারা সত্যিকারের খুশি হল তারা হচ্ছে বরফ আর কুয়াশা। তারা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলল–বসন্ত এই বাগানের কথা ভুলে গিয়েছে। সুতরাং সারা বছরই আমরা এখানে কাটিয়ে দেব। বরফের বিরাট সাদা আলখাল্লা দিযে ঘাসগুলিকে ঢেকে দিল। তারা। জমাট হিমকণা গাছগুলিকে রাঙিয়ে দিল সাদা রঙে। তারপরে তাদের সাহচর্য দেওযার জন্যে তারা আহ্বান জানাল উত্তর-বাতাসকে। উত্তর-বাতাস সাড়া দিল সেই ডাকে। পশমের আলখাল্লা জড়িয়ে সে সারাদিন বাগানের মধ্যে গর্ডন করে ঘুরে বেড়াল উডিযে ফেলে দিল চিমনিগুলিকে। সে খুশি হয়ে বলল–ডায়গাটা বড়ো চমৎকার। ঝা না ডাকলে আর চলছে না। সুতরাং ঝা এল। প্রতিদিন তিন ঘন্টা করে দুর্গের ওপরে সে নাচতে লাগল-ভেঙে ফেলল কাঁচের শার্সিগুলি। তারপর অত্যন্ত দ্রুত গতিতে সে বাগানের মধ্যে দুটতে শুরু করল। পোশাক তার ধূসর রঙের নিঃশ্বাস তার বরফের মতো ঠাণ্ডা কনকনে।

জানালার ধারে বসে ঠান্ডা সাদা বাগানের দিকে তাকিয়ে স্বার্থপর দৈত্যটি গড়গড় করে। বলল–বসন্ত আসতে দেরি করছে কেন তা আমি বুঝতে পারছি নে। আশা করি এই আবহাওয়ার পরিবর্তন হবে।

কিন্তু বসন্তও এল না, গ্রীষ্মও এল না। প্রতিটি বাগানে শরৎ তার সোনালি ফল বিছিয়ে দিল দৈত্যের বাগানে দিল না কিছুই। সে বলল—'দৈত্যটা বড়োই স্বার্থপর'। সুতরাং

বাগানটা। অধিকার করে রইল কেবল শীত, উত্তরে বাতাস, ঝঙ্কা আর হিমকণা। আর গাছের ভেতর দিয়ে নেচে-নেচে বেড়াতে লাগল কেবল বরফের দল।

একদিন সকালে বিছানায় শুয়ে শুয়ে দৈত্যটি একটি মিষ্টি গান শুনতে পেল। গানটা তার কানে এতই মিষ্টি লাগল যে তার মনে হল রাজার গাইসেরা গান করতে-করতে রাস্তা দিয়ে। যাচ্ছে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি গান গাইছিল ডানালায় বসে একটি লিনেট পাখি। কিন্তু এতদিন পরে সে পাখির গান শুনতে পেয়ে তার মনে হল পৃথিবীতে এইটিই বোধ হয় সবচেয়ে মিষ্টি গান। এই গানের সঙ্গে-সঙ্গে ঝা থেমে গেল-উত্তরে-বাতাস থামিয়ে দিল গর্ডন করা, খোলা জানালার ভেতর দিয়ে একটা মিষ্টি গন্ধ তার নাকে এসে লাগল। দৈত্যটি বলল–”মনে হচ্ছে, শেষ পর্যন্ত বসন্ত এল। এই বলেই সে লাফ দিয়ে বিছানা থেকে উঠে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখল।

কী দেখল?

দেখল একটি অদ্ভুত দৃশ্য দেওয়ালের গায়ে ছোটো একটা গর্তের ভেতর দিয়ে ছেলেরা সব ঘুড়ি দিয়ে ভেতরে ঢুকে এসেছে। আর তারা সব গাছের ডালে বসে রয়েছে। সে দেখতে পেল প্রতিটি গাছে একটা করে শিশু বসে রয়েছে। তাদের কাছে পেযে গাছগুলি এতই খুশি হয়েছে যে তারা তাদের শরীর ফুল দিয়ে ঢেকে দিযেছে। ছেলেদের মাথায় হাওযা করছে ডাল দিযে। মনের আনন্দে কিচমিচ করতে-করতে পাখিরা উড়ে বেড়াচ্ছে চারপাশে; সবুজ ঘাসের ভেতর থেকে ফুলগুলি মাথা তুলে মনের আনন্দে হাসছে, সত্যিই বড়ো আনন্দের দৃশ্য! কেবল একটা কোণে ৗত রয়েছে। অংশটা হল বাগানের

একেবারে প্রত্যন্তে; আর সেখানে একলা দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি শিশু। সে এত ছোটো যে কিছুতেই সে ডালের নাগাল পাচ্ছে না-ভীষণ কাঁদতে কাঁদতে সে গাছের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেই গাছটা তখন বরফ আর হিমকণায়। বোঝাই হয়ে ছিল। আর গর্জন করে তার মাথার উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল উত্তরে-বাতাস। গাছটা বলেছিল–প্রিয় শিশু, তুমি আমার ডালে উঠে এস; নিজের ডালটাকে যতটা সম্ভব সে নীচে নামিয়ে দিচ্ছিল; কিন্তু শিশুটা যে একেবারে বাচ্চা।

এই দেখে দৈত্যের হৃদয়টা গলে গেল। সে বলল–সত্যিই আমি কী রকম স্বার্থপরের মতো ব্যবহার করেছি। এখন আমি বুঝতে পারছি বসন্ত আসতে এত দেরি করেছে কেন? আমি ওই বাচ্চাটাকে গাছের ডালে চড়িয়ে দেওয়াল দেব ভেঙে তাহলে চিরদিন ছেলেরা এই বাগানে খেলা করতে পারবে। কৃতকর্মের জন্যে সত্যি সে বড়ো অনুতপ্ত হল।

এই কথা বলে খুঁড়ি দিয়ে সে নীচে নেমে এল; খুব আস্তে আস্তে সামনের দরজা খুলল–তারপরে বেরিয়ে এল বাগানে। কিন্তু শিশুরা তাকে দেখে এত ভয় পেল যে একছুটে পালিয়ে গেল সবাই। পালাল না কেবল সেই বাচ্চাটা। তার চোখ দুটো জলে এত বোঝাই হয়ে ছিল যে দৈত্যটা যে আসছে তা সে দেখতে পায়নি। দৈত্যটি চুপি চুপি তার পেছনে গিয়ে তাকে সন্তর্পণে নিজের হাতের ওপরে তুলে নিল; তারপরে তাকে ডালের ওপরে বসিয়ে দিল। সঙ্গে-সঙ্গে গাছে ফুলের সমারোহ ডাল, পাখিরা ছুটে এসে গান জুড়ে দিল, আর বাচ্চাটা। দু'হাতে দৈত্যের গলাটা জড়িয়ে চুমু খেল তাকে। আর অন্যান্য ছেলেরাও যখন দেখতে পেল দৈত্যটা আর এখন দুষ্টু নয় তখন তারা সবাই দৌড়ে

ভেতরে এসে হাজির হল–তাদের পিছু পিছু এল বসন্ত। দৈত্যটি বলল–শিশুরা, এখন থেকে এটা হল তোমাদের বাগান। এই বলে বিরাট একটা কুড়ুল নিয়ে সে দেওয়ালটাকে দিল ভেঙে বেলা বারোটার সময় বাজারে যাওয়ার সময় সবাই দেখল একটি অতি সুন্দর বাগানে ছেলেদের সঙ্গে দৈত্যটি খেলা করছে।

সারা দিন ধরেই তারা খেলা করল; সন্ধেবেলা ছেলেরা দৈত্যের কাছে থেকে বিদায় নিতে এল।

সে জিজ্ঞাসা করল কিন্তু যে বাচ্চাটাকে আমি গাছের ডালে বসিয়ে দিয়েছিলাম তোমাদের সেই শিশু বন্ধুটি কোথায়?

তাকে চুমু খেয়েছিল বলেই শিশুটিকে দৈত্যটি ভালোবাসত।

শিশুরা বলল–জানি নে। সে চলে গিয়েছে।

তোমরা তাকে নিশ্চিত বলবে কাল যেন সে আসে।

কিন্তু ছেলেরা বলল সে কোথায় থাকে তা তারা জানে না; তাকে তারা আগে কোনোদিন দেখেওনি। এই কথা শুনে দৈত্যটি খুব দুঃখিত হল।

প্রতিদিন বৈকালে স্কুল ছুটি হওয়ার পরে ছেলেরা বাগানে এসে দৈত্যটির সঙ্গে খেলত। কিন্তু যে শিশুটিকে দৈত্য অত ভালোবাসত তার দেখা আর পাওয়া গেল না। দৈত্যটি সব ছেলেদেরই খুব পছন্দ করত; তবু সেই খুদে বন্ধুটিকে দেখার জন্যে সে অত্যন্ত অস্থির হয়ে উঠেছিল। সে প্রায়ই বলত–তাকে দেখতে আমার কতই না ইচ্ছে যায়।

বছরের পর বছর গেল কেটো দৈত্যটি বুদ্ধ আর অথর্ব হয়ে উঠল। আর সে খেলতে পারত না। তাই সে বিরাট একটা আরাম কেদারায় শুয়ে ছেলেদের খেলা দেখত; বলত– আমার বাগানে অনেক সুন্দর সুন্দর ফুল রয়েছে কিন্তু শিশুরা হচ্ছে সবচেয়ে সুন্দর।

একদিন শীতের সকালে পোশাক পরতে-পরতে সে বাগানের দিকে তাকিয়ে দেখলা এখন আর সে শীতকে ঘৃণা করে না। কারণ সে জানত এটা শীত নয়, ঘুমন্ত বসন্ত; এবং ফুলেরা এখন বিশ্রাম করছে।

হঠাৎ সে চোখ দুটো ঘষে অবাক হয়ে তাকাল–একবার নয়, বারবার। সত্যিই বড়ো অদ্ভুত দৃশ্য। বাগানের একটি প্রত্যন্ত অংশে একটা গাছ; সুন্দর ফুলে ভরে উঠেছে তার দেহ। ডালগুলি সোনালি, রূপালি ফলগুলি ঝুঁকে পড়েছে ডাল থেকে। আর তারই নীচে যে শিশুটিকে সে ভালোবাসে সেই শিশুটি দাঁড়িয়ে রয়েছে।

আনন্দে আত্মহারা হয়ে দৈত্যটি দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল; ঢুকল বাগানে। ঘাসের ওপর দিয়ে তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগল এল সেই শিশুটির সামনে খুব কাছে আসতেই তার চোখ। দুটো রাগে আরক্ত হয়ে উঠল। সে জিজ্ঞাসা করল–'তোমাকে আঘাত করেছে এত

সাহস কার?' কারণ শিশুটির হাতের চেটোতে দুটো পেরেক ফোঁটানোর দাগ-ছোটো দুটি পায়ের ওপরেও দাগ দুটি পেরেক ফোঁটানোরা। দৈত্যটি চিৎকার করে উঠল–কে তোমাকে মেরেছে? এত সাহস কার? আমায় তার নামটা বুল। আমার সেই বিরাট তরোয়ালটা নিয়ে এখনই তাকে আমি হত্যা করব।

শিশুটি বলল–না, না। এগুলি হচ্ছে প্রেমের ক্ষত।

দৈত্যটা জিজ্ঞাসা করল–কে তুমি?

একটা ভয় এসে তাকে গ্রাস করে ফেলল, সে সেই শিশুটার সামনে হাঁটু মুড়ে বসল।

শিশুটি দৈত্যের দিকে তাকিয়ে হাসল; বলল–তুমি একদিন আমাকে বাগানে খেলতে দিয়েছিলে; আজ তুমি আমার সঙ্গে আমার বাগানে যাবে। সেই বাগানের নাম প্যারাজাইস।

এবং সেদিন বৈকালে ছেলেরা যখন খেলতে এল তখন তারা দেখল গাছের তলায় দৈত্যের মৃতদেহটি পড়ে রয়েছে সাদা ফুলে ঢাকা পড়েছে তার দেহ।